স্বর্ণলতা

আদান-প্রদান

স্বর্ণলতা

তিলোত্তমা মিশ্র

অনুবাদ
মণিকা চক্রবর্তী

ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, ইণ্ডিয়া

ভূমিকা

উনিশ শতকের প্রথমদিকে ধর্মপ্রচারের উদ্দেশ্যে আমেরিকার ব্যাপটিস্ট মিশনারীরা আসামে এসে অসমীয়া ভাষা সাহিত্যের বিকাশের জন্যে গোড়ার দিকে অনেক কাজই করে গিয়েছিলেন। তাঁরা অসমীয়া অভিধান এবং ব্যাকরণ রচনা করে অসমীয়া ভাষার গোড়া শক্ত করা ছাড়াও সৃষ্টিশীল, ধর্মীয় এবং ব্যবহারিক পুঁথিও লিখেছিলেন। তারও পরে 'অরুণোদই' নামে একটি সংবাদপত্রও বেরিয়েছিল। তাঁদের ভাষার ধাঁচ সরল হলেও তারমধ্যে পশ্চিমী সুর ধ্বনিত হয়েছিল। এই ভাষাটিকেই পরে হেমচন্দ্র বরুয়া একটি বিজ্ঞানসম্মত আভিধানিক রূপ দিয়েছিলেন।

মিশনারীদের মধ্যে এ. কে. গার্নি ছিলেন 'কামিনীকান্ত', 'ফুলমণি আরু করুণা' প্রভৃতির কাহিনীকার। এইসব উপন্যাসে কোনো কলাধর্ম ছিল না; প্রচারধর্মী সরল কাহিনীর বর্ণনাই এর বৈশিষ্ট্য ছিল, প্রকৃত উপন্যাসের গুণ এখানে অনুপস্থিত। তারপরে ১৮৮৪ সালে পদ্মাবতী দেবী ফুকনমী 'সুধর্মার উপাখ্যান' লিখেছিলেন। এই বইটিও প্রকৃত উপন্যাসের পদমর্যাদা পেল না। লক্ষ্মীনাথ বেজবরুয়া এবং পদ্মনাথ গোহাঞি বরুয়ার হাতে প্রকৃত অসমীয়া উপন্যাসের জন্ম হয়েছিল। এদের যুগটি ছিল রোমান্টিক যুগ। বেজবরুয়ার 'পদুম-কুঁব্‌রী' (১৯০৫), গোহাঞি বরুয়ার 'ভানুমতী' (১৮৯৯) এবং 'লাহরী'তে (১৮৯২) উপন্যাসের চিহ্ন ভালোভাবে ফুটে উঠেছিল। তথাপি শিথিল কাহিনী এবং উপন্যাসে থাকার মত জীবন-দৃষ্টির অভাবে এই রচনাগুলি ম্লান হয়ে যায়। এরপরের লেখক শরৎচন্দ্র গোস্বামীর 'পানিপথ', দেবচন্দ্র তালুকদারের 'অপূর্ণ', দণ্ডিনাথ কলিতার 'সাধনা'কে উপন্যাস বলে ধরলেও অতিরিক্ত আদর্শাত্মক হওয়ার জন্যে সুখপাঠ্য নয়। রোমান্টিক যুগের শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক হলেন রজনীকান্ত বরদলৈ; তিনি ওয়ালটার স্কট এবং বঙ্কিমচন্দ্রের আদর্শে বেশ ক'টি ঐতিহাসিক উপন্যাস লিখেছিলেন। তার মধ্যে 'মনোমতী', 'রহদৈ লিগিরী', 'রঙ্গিনী', 'নির্মল্যকত', 'দন্দুরাদ্রোহ' ইত্যাদি প্রধান। এগুলিতে অতীত ইতিহাসের গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়ের ধ্বনি-প্রতিধ্বনি এবং বৈষ্ণব পরম্পরার আভাস থাকার ওপরেও নারী চরিত্রের ঝিলমিলও আছে। তাঁর 'মিরিজীয়রী' মিশিং (Mishing) জনজাতির ট্রাজিক কাহিনীর পটভূমিতে লেখা একটি আবেদন সমৃদ্ধ উপন্যাস। বরদলৈ'র পরে আর একজন গ্রহণযোগ্য উল্লেখিত ঔপন্যাসিক হলেন দীননাথ শর্মা।

চল্লিশদশক পর্যন্ত রোমান্টিক ভাবাদর্শের পরিবেশে যে সমস্ত উপন্যাস লেখা হয়েছিল তার মধ্যে আদর্শের দৃষ্টিভঙ্গী যতটা ছিল; বাস্তববোধ একেবারে ছিল না বললেই চলে। ইতিমধ্যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের বিভীষিকা আসামকে স্পর্শ করাতে এই যুদ্ধের বাতাবরণে পূর্বের রোমান্টিক স্বপ্নের শেষ হল এবং যুদ্ধের সমাপ্তিতে বিরিঞ্চিকুমার বরুয়াই 'জীবনর বাটত' নামে যে উপন্যাসটি লিখলেন তাতে বাস্তব জীবনের বিচিত্র রূপ, ভেতর ও বাইরের দ্বন্দ সংঘাত সবকিছুর ওপরে একটি জীবন দৃষ্টি প্রকট হয়ে ওঠে। বরুয়ার আর একটি উপন্যাস 'সেউজীপাতর কাহিনী'তে চা-বাগিচার জীবনের করুণ ছবি স্পষ্ট হয়ে উঠল। দুটি উপন্যাসই আকর্ষণীয় এবং আবেদনপূর্ণ।

তারপরে এল রামধেনু যুগ; রামধেনু আলোচনাকে কেন্দ্র করে বেশ কয়েকজন লেখকের আবির্ভাব হ'ল, আর তার নেতৃত্ব দিলেন 'রামধেনু'র সম্পাদক বীরেন্দ্র কুমার ভট্টাচার্য। এই সময়ে বিশেষ করে রামধেনু যুগ আর তার পরবর্তীকালে বেশ কয়েকজন প্রতিভাধর ঔপন্যাসিক হাতে কলমে তুলে নিয়েছিলেন। প্রফুল্ল দত্ত গোস্বামী, সৈয়দ আব্দুল মালিক (এরা আগের আবাহন যুগের মানুষ হলেও, এদের ঔপন্যাসিক প্রতিভা এই যুগে বিশেষভাবে প্রকাশিত।) যোগেশ দাস, বীরেন্দ্র কুমার ভট্টাচার্য, নবকান্ত বরুয়া, শীলভদ্র, হোমেন বরগোহাঞি, চন্দ্র প্রসাদ শইকীয়া, উমাকান্ত শর্মা, মেদিনী চৌধুরী, মামণি রয়সম গোস্বামী, লক্ষ্মীনন্দন বরা, মহম্মদ পিয়ার, হিতেশ ডেকা, নীলিমা দত্ত, নিরুপমা বর গোহাঞি — এরা সকলে নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে আধুনিক অসমীয়া উপন্যাসের বিকাশসাধন করলেন। রামধেনু যুগে অপেক্ষাকৃতভাবে শান্তিপূর্ণ পরিবেশ, উপন্যাসের মননশীলতা, প্রত্যয়দীপ্ত জীবনদীক্ষা, মানবীয় বস্তুনিষ্ঠ দৃষ্টিকোণ, অবক্ষয় চেতনা, সমাজ-বাস্তবের প্রতি কৌতূহল, রাজনৈতিক সচেতনতা; অভিজ্ঞতা আহরণের আগ্রহ, বিশ্ব-সংস্কৃতির বীজ আহরণ, গ্রাম ও শহরের দলিত ও নিষ্পেষিতদের প্রতি সহানুভূতি, আঙ্গিক সম্বন্ধে সচেতনতা 'রামধেনু' যুগের উপন্যাস সাহিত্য পূর্নভাবে বিকশিত হয়েছিল। তাছাড়া এই সময়ে তাত্ত্বিক দিকে ফ্রয়েড ও মাক্সের চর্চা'ও চলেছিল, এবং টলস্টয়, গোর্কি, ডস্টয়ভস্কি, ভার্জিনিয়া উলফ্, জেমস জয়েস ইত্যাদি বিদেশী ঔপন্যাসিকদের নিয়েও আলোচনা হয়েছিল। সমাজতত্ব যেমন ছিল তেমনি মনস্তত্বেরও অনুপ্রবেশ ঘটেছিল। এই ধরণের চর্চা প্রায় সত্তর দশক পর্যন্ত চলেছিল বলে জানা যায়। অবশ্য রামধেনু যুগের বেশ কয়েকজন ঔপন্যাসিক এখনো কলম ধরে রেখেছেন। কেউ কেউ আবার জীবনভিত্তিক উপন্যাস রচনাতেও আত্মনিয়োগ করেছেন।

আশী এবং নব্বই দশকে আগের গতিশীল উদ্যম নেই, যদিও তরুণদের মধ্যে কয়েকজন প্রতিশ্রুতিসম্পন্ন ঔপন্যাসিকের আবির্ভাব ঘটেছে। তার মধ্যে ফনীন্দ্রনাথ দত্ত চৌধুরী, ভূপেন্দ্র নারায়ণ ভট্টাচার্য, অরূপা পটঙ্গীয়া কলিতা, তিলোত্তমা মিশ্রের নাম উল্লেখযোগ্য।

অসমীয়া উপন্যাস সাহিত্যের ইতিহাস বাছাই করলে দেখা যায় বেজবরুয়া এবং

গোহাঞি বরুয়া উপন্যাসের জন্ম দেবার পরেও রজনীকান্ত বরদলৈ অসমীয়া উপন্যাসকে বিশ্বসাহিত্য ভান্ডারের অর্ন্তভুক্ত করলেন, বিরিঞ্চি কুমার বরুয়া সাবালকত্ব প্রদান করলেন, এবং রামধেনু যুগে বীরেন্দ্রকুমার ভট্টাচার্য তাকে যৌবনে অভিষিক্ত করে আধুনিক মাত্রা দান করলেন। এরপর সত্তরের দশক পর্যন্ত আধুনিকতার দুটি দিক, অবক্ষয় চেতনা এবং সমাজ চেতনা উন্মোচিত হতে থাকল। এই সকল লেখকের মধ্যে ঔপন্যাসিক হওয়ার মত অন্তর্দৃষ্টি এবং গতিশীলতা ছিল।

আমাদের আলোচ্য গ্রন্থ 'স্বর্নলতা'র লেখিকা তিলোত্তমা মিশ্র। তিনি আশীর দশকের শেষে উপন্যাসখানি লিখেছেন এবং ১৯৯১ সালে প্রকাশ করেছেন। 'স্বর্ণলতা' উপন্যাসটি গুণাভিরাম বরুয়ার জীবনীভিত্তিক। যদিও পাশ্চাত্য ধ্যান ধারণার স্পর্শে উনিশ শতকের মধ্যভাগ এবং শেষভাগে আসামে যে সীমিত সামাজিক ও রাজনৈতিক আলোড়ন হয়েছিল, বিশেষ করে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যে, অসূর্যস্পর্শা নারীকে লাঞ্ছনা মুক্ত করার জন্যে যে প্রচেষ্টা চলেছিল তার কলাত্মক চিত্র এই উপন্যাসটিতে আছে। না বললেও চলে, ধর্মীয় এবং সামাজিক সংস্কারের মধ্যে দিয়ে মানুষকে নতুন চিন্তা করতে শেখানো মানুষটি হলেন গুণাভিরাম বরুয়া। গুণাভিরাম এই ধরণের উদ্যমী হওয়ার প্রেরণা পেয়েছিলেন কলকাতাতে ব্রাহ্মধর্মের প্রতিষ্ঠাতা মহর্ষি দেবেন্দ্র নাথ ঠাকুর, কেশবচন্দ্র সেনের থেকে; ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর বিধবা-বিবাহ প্রসঙ্গে যে চেষ্টা করেছিলেন, তাও তাঁর প্রেরণার উৎস ছিল। কলকাতার প্রেসিডেন্সী কলেজে পড়বার সময়ই তাঁর ওপরে এসবের পূর্ণ প্রভাব পড়ে, শুধু তাই নয় তিনি নিজে তো ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করেছিলেনই তাছাড়াও প্রথম পত্নীর মৃত্যুর পরে বিষ্ণুপ্রিয়া নামে একজন ব্রাহ্মণ বিধবাকে বিয়েও করেছিলেন। 'স্বর্ণলতা' এঁদেরই সন্তান। এই স্বর্ণলতাই উপন্যাসের নায়িকা। উপন্যাসটিতে নিপুণ ভাস্করের মত গুণাভিরাম নিজের আদর্শ অনুযায়ী স্বর্ণলতাকে গড়ে তুলেছেন। পরম্পরাগত বন্ধনের থেকে মুক্ত হয়ে স্বর্ণলতা নিজের জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়ার যে যোগ্যতা অর্জন করেছিল তার মূলেও গুণাভিরামের প্রচুর অবদান, তারপরেও, শেষ পর্যন্ত সে নানারকম বিপর্যয়ের মধ্যেও স্বতন্ত্র পদক্ষেপ নিয়ে এক সুন্দর ভবিষ্যতের জন্যে প্রস্তুত হ'তে পেরেছে। এই কারণেই উপন্যাসের নাম 'স্বর্ণলতা' রাখাটা সমীচীন হ'য়েছে। 'স্বর্ণলতা' উনিশ শতকের পটভূমিতে রচিত নারীমুক্তির অন্তরঙ্গ আলেখ্য। উপন্যাসে গুণাভিরামের চরিত্র ব্যাক্তিত্বপূর্ণ, মানবীয় এবং সংস্কৃতিসমৃদ্ধ। ধীর, গম্ভীর সবধরণের সংকীর্ণতার থেকে মুক্ত, আপন প্রত্যয়ে অবিচল, গুণাভিরামকে কেন্দ্র করেই উপন্যাসের ঘটনা-চক্র আবর্তিত হয়েছে বলতে পারি, কারণ তাঁর নগাঁও-র 'বিশ্বকুটীর' নামের বাড়িটি ছিল সেইসময়ের নতুন চিন্তা-চর্চার স্নায়ুকেন্দ্র। ইংরেজ আসার পরে, কলকাতার শিক্ষিত মধ্যবিত্তদের মধ্যে একটা বৌদ্ধিক আলোড়ন চলছিল আর তার ফলশ্রুতি হিসেবে হিন্দু ধর্মের সংকীর্ণতা দূর করার জন্যে ব্রাহ্ম ধর্মের প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল। আসামে সে রকম কোনো আন্দোলন না হওয়ার ফলে, মানুষ অন্ধবিশ্বাসী হয়ে পরম্পরাগত শাস্ত্রীয় আচার বা দেশাচারের পাঁকে ডুবে মানসিক

জড়তাকে আঁকড়ে ধরেছিল। সাধারণ মানুষের তো কথাই নেই, এমনকি শিক্ষিত মানুষেরাও নতুন চিন্তা করতে অসমর্থ ছিল। রোগ হ'লে চিকিৎসা না করে কোনো অপদেবতার পূজা করা, কম বয়সে মেয়ের বিয়ে দেয়া — এই সমস্ত পরম্পরা মেনে চলা রক্ষণশীল সমাজের বিপরীতে গুণাভিরাম ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করে এবং ব্রাহ্মণ বিধবাকেবিয়ে করে নিজেই নতুনত্বের সূচনা করেছিলেন। উপদেশের থেকে যে কাজ করে দেখানো ভালো — এই কথা উপলব্ধি করে তিনি সাহসের সঙ্গে এই কাজ করেছিলেন। শুধুমাত্র তাই নয়, গুণাভিরামের আরও কিছু গুণ ছিল। স্বর্ণকে শিক্ষাদীক্ষা দিয়ে আত্মনির্ভরশীল করে তোলা, গরীব অসমীয়া যুবক লক্ষেশ্বরকে কলকাতাতে পড়ানো, ধর্মেশ্বরের ইংরেজবিরোধী সাহসিকতাকে উৎসাহ দেওয়া, সাহিত্য সংস্কৃতির উন্নতির জন্যে 'আসম-বন্ধু' কাগজ বের করা, দারিদ্র্যের জন্যে খ্রীষ্টান ধর্মে দীক্ষিতদের সহানুভূতির সঙ্গে দেখা, ছোট্টবেলা বিধবা হওয়া ব্রাহ্মণ-কন্যা লক্ষ্মীর পুর্নবিবাহে আশীর্বাদ জানানো, নিমন্ত্রিত হলে গীর্জাতে যাওয়া, পত্নী বিষ্ণুপ্রিয়াকে উপযুক্তভাবে গড়ে সংসার সুখের করা, অসম-কলকাতার বন্ধুমহলে আপন ব্যাক্তিত্বে সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়া ইত্যাদি গুণ তাঁর ছিল। এসবই তাঁর চরিত্রকে উজ্জ্বল করে তুলেছে। তাঁর দুর্বলতাও ছিল। নিজের পত্নী, পুত্র, জামাইকে হারিয়ে মনে মনে তিনি বিচলিত হয়ে পড়েছিলেন এবং মৃত্যুর আগে আগে বিধবা স্বর্ণকে এই কথা বলেছিলেন ঃ

'মাগো, আমার জন্যে এখানে এখন একটাই বাড়ি আছে। সেই আনন্দধামে। সেখানে মা ও বাবা আছেন, করুণাও আছে। এই পৃথিবীতে আমার সমস্ত আশা দুরাশায় পরিণত হয়েছে। মা, অনেক সখ করে সংসার পেতেছিলাম। প্রথমে ব্রজসুন্দরী আমাকে একলা রেখে অকালে চলে গেল। তারপরে তোর মায়ের সঙ্গে এমন একটা সুখের সংসার পাতলাম। তাও ভেঙ্গেচুড়ে গেল। ভেবেছিলাম, সমাজের শাপের প্রতি ভ্রুক্ষেপ না করে আমি একলাই দেশাচারের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে পারব। কিন্তু বিধাতা তা হতেই দিলেন না।'

গুণাভিরামের স্বপ্নভঙ্গের এই বেদনা অস্বাভাবিক নয়, কারণ তাঁর ডাক অসমের মানুষেরা শুনল না। একা একা এই যুগে জেতা কষ্ট। পারিবারিক ক্ষেত্রেও তিনি সুখ পেলেন না। গুণাভিরামের এই বিষন্ন সুরই উপন্যাসের কাহিনীকে আকর্ষণীয় করে তুলেছে।

বিষ্ণুপ্রিয়ার ভূমিকা গুণাভিরামের মত বিস্তৃত নয়। বিধবা হয়েও পুনর্বিবাহ করে সমকালীন রক্ষণশীল সমাজে তিনি যে সাহসের পরিচয় দিয়েছিলেন, উপন্যাসে সেই কাহিনী উহ্য হয়ে থাকলেও, সে ঘটনা এমনিতেই স্পষ্ট হয়ে আছে। বিষ্ণুপ্রিয়া নিষ্ঠার সঙ্গে সংসার চালিয়েছিলেন এবং গুণাভিরামের আদর্শনিষ্ঠার পেছনে তাঁর সহযোগ এবং কর্তব্য-নিষ্ঠা যথেষ্ট গভীর ছিল। লক্ষ্মীর বাল্যবিবাহে নিমন্ত্রিত অতিথি হিসেবে তিনি যে অপমান পেলেন, তাও ধৈর্য্যের সঙ্গে তিনি অতিক্রম করেছিলেন। তিনি সেই রক্ষণশীল সমাজ এবং তার কুসংস্কারগুলির কথা ভাল করে জানতেন। সেই সমাজের স্মৃতি তাঁর মন থেকে একেবারে মুছেও যায় নি। স্বর্ণকে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে তাঁর পরোক্ষ অবদান আছে। তরা ও লক্ষ্মীর প্রতি সহানুভূতিও তাঁর উদার মানসিকতারই পরিচয়।

উপন্যাসের আকর্ষণীয় চরিত্র হচ্ছে স্বর্ণ। শৈশব থেকে তরুণী হওয়া পর্যন্ত তাঁর মনের পরিবর্তনগুলি লেখিকা সুন্দরভাবে তুলে ধরেছেন। শৈশবের সঙ্গী তরা এবং লক্ষ্মীর প্রতি তাঁর একটা আন্তরিক টান ছিল। অভিজাত পরিবারের সন্তান হয়েও স্বর্ণ তরা এবং লক্ষ্মীর হাসি-কান্নার ভাগ নিয়েছে। কলকাতার বেথুন কলেজে পড়ার সময় নিজের স্বভাবের গুণে, গুণাভিরাম বন্ধুদের থেকে আন্তরিক সহযোগিতা পেয়েছিলেন। মা এবং করুণার মৃত্যুর পর সংসারের দায়িত্ব স্বর্ণই নিয়েছিল। নন্দকিশোরের সঙ্গে বিয়ে হওয়ার পরে তাঁর দুটি মেয়ে হ'ল। এর পরের ঘটনা করুণ। স্বামী নন্দকিশোরের হঠাৎ মৃত্যু আর তার কিছুদিন পরে গুণাভিরামের মৃত্যু হওয়াতে সংসারের গুরুদায়িত্ব স্বর্ণর ওপরে পড়ল। কলকাতাতে 'আসম-বন্ধু' র কাজে ধর্মেশ্বরকে স্বর্ণও সাহায্য করেছিল এবং নিজে লিখতে শুরু করেছিল। ধর্মেশ্বর এবং লক্ষ্মীর বিয়েতে স্বর্ণ শুধু যে সুখী হয়েছিল তাই নয়, লক্ষ্মীর এই সাহসী পদক্ষেপকে অভিনন্দন জানিয়েছিল। 'বিশ্বকুটীরে' অনুষ্ঠিত হওয়া ব্রাহ্ম প্রার্থণাতেও স্বর্ণ অংশগ্রহণ করেছিল। ফলে দেখা যায়, গুণাভিরাম সবদিকেই থেকেই স্বর্ণকে উপযুক্ত শিক্ষা দিয়ে সব কুসংস্কার থেকে মুক্ত ও উদারমনা করে তুলেছিলেন। বয়স হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে স্বর্ণ আত্মবিশ্বাসের অধিকারিণী হয়েছিলেন। গুণাভিরামের মৃত্যুর পরে তাঁর ব্রাহ্ম সতীর্থরা স্বর্ণকে জিজ্ঞেস না করে কলকাতার বাড়ির জিনিষপত্র ব্রাহ্ম-মহিলার বোর্ডিং -এ স্থানান্তরিত করাতে, স্বর্ণ মনে মনে দুঃখিত ও জেদী হয়ে উঠেছিল। তিনি, বলেছিলেন ঃ 'আমি তো অসহায় বা দূর্বল নই।' এইসব ছোটখাট ঘটনার মধ্যে দিয়ে স্বর্ণর দৃঢ় এবং সাহসী মনের পরিচয় পাওয়া যায়। কলকাতায় তরাকে কাছে পেয়ে স্বর্ণর বিষণ্ণতা অনেকটা কমেছিল, তরাও হেনরীকে বিয়ে করে সুখের নীড় গড়ে তুলল। প্রতিকূল পরিস্থিতিতে মিশনারীদের মধ্যে যে আত্মপ্রত্যয় নিয়ে সে মানব-সেবা করেছিল, তার কাহিনী স্বর্ণর কাছে ছিল বড় আনন্দদায়ক। স্বর্ণর দায়িত্ব অনেক, বিলেতে জ্ঞানের পড়ার খরচ দেয়া, কমলা আর নিজের ছোট মেয়েদুটিকে দেখাশোনা করা, — দুঃখের মাঝে থেকেও এসব দায়িত্ব তিনি নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করলেন। তাছাড়া তরাব সান্নিধ্যও তাঁকে সব দুশ্চিন্তা থেকে রক্ষা করে। ইতিমধ্যে আরও একটি ঘটনা ঘটল। তিনি দেখা পেলেন ক্ষীরোদের। শেষদৃশ্যে ক্ষীরোদের আবির্ভাবে জীবনকে আবার তিনি নতুন করে দেখতে চাইলেন। নিজের জীবনে মৃত্যুকে বার বার কাছ থেকে দেখতে দেখতে তাঁর মন ভেঙে গিয়েছিল, এই বেদনার অভিজ্ঞতা বার বার তার দিনগুলিকে বিষণ্ণ করে তুলেছিল, — সেই স্বর্ণকে জীবনের বাণী শোনালেন ক্ষীরোদ। শেষ দৃশ্যে ক্ষীরোদ ও স্বর্ণের অন্তরঙ্গ আলাপে নতুন প্রেমের সম্ভাবনা দেখা গেল। তখন একটি শতিকার মৃত্যু ঘটেছে এবং আরও একটি শতিকার জন্ম-বেদনা শুরু হয়েছে। বিধবা স্বর্ণ নতুন প্রেমের আলোয় আগন্তুক শতিকার জন্ম-বেদনার স্বপ্নে বিভোর হয়ে বলেছে ঃ

"ভাবতে কত ভালো লাগে, বাবা আগে সবসময় বলতেন কুড়ি শতকের পৃথিবী একেবারে বদলে যাবে। সব কাজ মানুষ মেশিনের সাহায্যে করবে। হয়ত কলকাতা থেকে

নগাঁও যেতে দুদিন বা তিনদিন লাগবে, আর আমাদের সমাজের সমস্ত কুসংস্কার দূর হয়ে যাবে। আমরা সেই দিনগুলিকে দেখতে পাবো কি?''

এর মধ্যে হয়ত উদ্যোগীকরণ এবং তার প্রভাবে সামাজিক পরিবর্তনের ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে। উনিশ শতকের মৃত্যু শয্যায় এরকম এক আশাবাদী বিশ্বাস এবং ভবিষ্যতে উন্নতি করার কল্পনা স্বর্ণর পক্ষে স্বাভাবিক, কারণ, মৃত্যুর থেকেও জীবনকে সুন্দর করে গড়ে তোলার স্বপ্নে তাঁর মন উদ্বেলিত। 'আমরা এই দিনগুলি দেখতে পাব কি?' এই প্রশ্নটিতে তিনি সন্দেহ প্রকাশ করেন নি। বরং আগন্তুক কুড়িশতকের পটভূমিতে স্বদেশের একটা উজ্জ্বল মূর্তির কল্পনা করে আনন্দ পেয়েছেন। উপন্যাসের শেষে এই দৃশ্যই লেখিকার জীবনদৃষ্টির দিকে অঙ্গুলি দেখিয়েছে।

উপন্যাসে দুটি উল্লেখ্যযোগ্য নারী চরিত্র আছে। সে দুটি হল তরা এবং লক্ষ্মী। স্বর্ণর ছেলেবেলার সঙ্গী তরা আর লক্ষ্মীর জীবন কণ্টকিত হলেও, তারা সাহসের সঙ্গে সব প্রতিকূল পরিস্থিতি জয় করে জীবনে প্রতিষ্ঠা এনেছিল। তরা খ্রীষ্ট ধর্ম গ্রহণ করে মিশনারীদের সাহায্যে নার্স হ'ল, হেনরীকে বিয়ে করে সুখের সংসার পাতল, সবশেষে, মানব-সেবায় জীবন উৎসর্গ করল। ভূমিকম্পে ঘর ভেঙে যাওয়াতে একটি শিশুকে উদ্ধার করতে গিয়ে ছাদ ভেঙে তরা মৃত্যুমুখে পতিত হল। এই চরম ত্যাগের নির্মল স্পর্শে তরার চরিত্র উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। ব্রনসন সাহেবকে তরা দেবতূল্য লোক বলে মনে করেছিল, তিনি অবশ্য সেরকম মানুষই ছিলেন, কিন্তু তাঁর দেশের লোকেরা কৃষ্ণাঙ্গ তথা ভারতীয়দের মনে মনে ঘৃণা করত, সে ব্যাপারে তরার চাক্ষুষ অভিজ্ঞতাও ছিল। 'তরা' চরিত্রের মাধ্যমে শ্বেতাঙ্গ-কৃষ্ণাঙ্গ প্রসঙ্গও উত্থাপিত হয়েছে। তরার জীবনের ট্রাজেডি হ'ল, তাঁর বাবা দরিদ্র ছিলেন। কঠিন অসুখে তিনি মারা গেলেন। তরার মা গোলাপী অপদেবতার দৃষ্টি ভেবে পূজা-অর্চনা যথেষ্ট করলেন যদিও কিছুই লাভ হল না, স্বামী সেন্দুরা মারা গেল। ব্রনসন সাহেব গোলাপীকে পূজা-আচ্চা করলে যে কঠিন রোগ ভালো হয় না সেকথা বুঝিয়ে দেবার পরে গোলাপী খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করল এবং বেঁচে থাকবার অবলম্বন পেল। তরার জন্ম ইতিহাস ছিল বড় করুণ।

লক্ষ্মীর 'বাল্যবিবাহ' হয়েছিল। বাবা পঞ্চানন শর্মা বুড়ো হয়েছিলেন ফলে সমাজের রক্তচক্ষুর ভয়ে অনিচ্ছাসত্ত্বেও লক্ষ্মীকে অল্পবয়সে বিয়ে দিয়েছিলেন। স্বামী মারা যাওয়ায় সে সাহস করে পড়া আরম্ভ করল, এবং শেষে শিক্ষিত, দেশপ্রেমিকযুবক ধর্মেশ্বরকে বিয়ে করল। লক্ষ্মীর এই উত্তরণে গুণাভিরাম এবং স্বর্ণেরও কিছু অবদান আছে। লক্ষ্মীর চরিত্রে কুসংস্কারাচ্ছন্ন সমাজের পীড়ন উপেক্ষা করে আলোক-সন্ধানী নারী-সত্তার ছবি ফুটে উঠেছে।

উল্লেখযোগ্য চরিত্র আর দুটি হ'ল ব্রনসন এবং ধর্মেশ্বর। ব্রনসন মঞ্চে বেশী সময় বেরোন নি। কিন্তু যেটুকু সময় বেরিয়েছেন, তাতে মানব সেবাতে উৎসর্গিত জীবনের আভাসই প্রকাশ পেয়েছে। ধর্মেশ্বরও কাহিনীর মাঝামাঝি দেখা দিয়েছে, — উচ্চশিক্ষিত

এই যুবকটি শেষে ইংরেজ বিরোধী মনোভাব গড়ে তুলল। খাজনা-বৃদ্ধির প্রতিবাদ করার জন্য তিনি জনগণকে সংঘবদ্ধ করলেন। যার জন্যে শেষপর্যন্ত তাঁকে কারাবরণ করতে হল। উনিশ শতকের শেষ ভাগে কংগ্রেসের জন্ম হয়েছিল আর সেইসময় কংগ্রেস আবেদন নিবেদনের পর্যায়ে আন্দোলন সীমিত রেখেছিল। ধর্মেশ্বর কিন্তু সেই সংস্থার বিরোধিতা করে জনগণকে সংগ্রামের জন্যে সংঘবদ্ধ করেছিলেন। ধর্মেশ্বরের এই চরিত্রে একটি নির্দিষ্ট মাত্রা বৈশিষ্ট্য আছে। অন্য যেসব চরিত্র আছে, তা শুধুমাত্র দেখা দিয়েই অর্ন্তহিত হয়েছে। এই সকলের মধ্যে কলকাতার ব্রাহ্মপুরুষ - মহিলারাই প্রধান। রবীন্দ্রনাথকে কিছু অল্প সময়ের জন্যে দেখানো হয়েছে। গুণাভিরামের মৃতদেহ বহন করার জন্যে বেজবরুয়া, হেমগোহাঁইও অল্প সময়ের জন্যে আবির্ভূত হয়েছিলেন। এইসব চরিত্র কাহিনীর কেন্দ্রে নেই, আশপাশে তাঁরা বিচরণ করেছেন।

উপন্যাসটিতে অতীতের উজ্জ্বলতায় বর্তমানের আলোয় ভবিষ্যতের পথ সুগম করার চেষ্টা আছে। উপন্যাসের নারী-চরিত্র, — অসমীয়া নারীকে প্রতিকূল পরিস্থিতি অতিক্রান্ত করে সমাজে নিজেকে সুপ্রতিষ্ঠিত করার প্রেরণা দিয়েছে, বলা যেতে পারে। শ্রীমতি মিশ্রেরও একমাত্র অদৃশ্য লক্ষ্য হিসেবে ঘোষিত বক্তব্য এইখানিই। প্রাঞ্জল ভাষা এবং বর্ণনা কুশলতায় ভরা 'স্বর্ণলতা' একটি সুখপাঠ্য উপন্যাস।

— নলিনীধর ভট্টাচার্য

প্রথম অধ্যায়

এক

কলং নদীর পাড় ধরে চলে যাওয়া চওড়া রাস্তার দুদিকে সোনারু আর শিমূল গাছের সারি। তখন বৈশাখ মাস। গাছে গাছে লাল হলুদ ফুলের অপরূপ শোভা। বাতাসে নাচতে থাকা ফুলের মধ্যে লুকিয়ে সখিয়তী পাখি থেকে থেকে ডেকে উঠছে। মাঝে - মাঝে বৌকথা কও নিজের সঙ্গীকে ডাকতে ডাকতে আকাশে উড়ে চলেছে। সকালের নরমরোদে তার পাখাদুটি মাঝে-মাঝে ঝিলিক দিয়ে উঠছে।

চওড়া রাস্তা থেকে বেরিয়ে যাওয়া রাস্তার অল্প দূরেই নতুন গির্জাটি। তার কাছেই আছে আমেরিকান ব্যাপ্টিসট মিশনের দুটি বাংলো। গির্জার একটি ঘরে সকাল সাতটা থেকে নটা পর্যন্ত মিস্ অরেল কীলার নামে একজন পাদ্রী মেম মেয়েদের পড়ান ও হাতের কাজ শেখান। প্রথমে একঘন্টা অসমীয়া, গণিত আর বাইবেল পড়া। তারপরে সেলাইয়ের কাজ। ছোট-ছোট মেয়েরা কাপড়ে রিফু, তালি দেওয়া আর বোতামের ঘর করতে শেখে, বড়রা শেখে 'জ্যাকেট' সেলাই। স্কুল ছুটির আগে মিস্ কীলার অর্গ্যানটিতে ধর্মসঙ্গীতের সুর বাজান। বড়ো দুটি মেয়ে "জগৎ মাঝারে যত লোক" গানটি অর্গ্যানের সঙ্গে-সঙ্গে গায়, "যীশুখ্রিষ্টেই পরিত্রান" পদটি মাত্র গায় ছোটরা।

ছুটির পরে মিশনের চৌহদ্দির বাইরে বেরিয়ে আসার সঙ্গে - সঙ্গে মেয়েদের দুঘন্টার শৃংখলায় যেন ছেদ পড়ে। হাসি তামাশা করতে করতে মেয়েরা যখন রাস্তায় বেরিয়ে আসে, তখন তারা যেন মুক্ত প্রকৃতির অঙ্গ। স্কুলে মেয়ে কুড়িজন মতো হবে। বেশীর ভাগই নতুন করে খ্রিষ্টান ধর্মে দীক্ষিত নগাঁও এবং কাছাকাছি গরীব ঘরের মেয়ে।

১৮৭৬ সালের সেই বৈশাখ মাসের সকালে নয় - দশ বছরের দুটি মেয়ে স্কুল থেকে বেরিয়ে ফৌজদারী পট্টির দিকের রাস্তাটি ধরে যাচ্ছিল। একজন পরেছিল সবুজরঙের ফুল দেওয়া সুতি কাপড়ের মেখেলা আর তার ওপরে ক্যালিকো কাপড়ে সুতোর ফুল তোলা জ্যাকেট, অন্যজনও একই ধরনের জামা এবং হলদে রঙের সুতির মেখেলা পরা।। জামাগুলো স্কুলে সেলাই করা বলে বোঝা যায়। ক্যালিকো কাপড় বড়দিনে মেমেদের উপহার দেওয়া। মেয়েদুটির একজন মিশনের বয়েজ স্কুলের মাস্টার মশাইয়ের মেয়ে। আরেকজন গোলাপীর মেয়ে। গোলাপী ব্যাপ্টিস্ট মিশনের বাইবেল-পড়া মহিলা। মিস্ কীলারের সঙ্গে বাড়িতে বাড়িতে গিয়ে বাইবেল পড়ে শোনায়।

মেয়েদুটি কিছুদূরে সুন্দর একটি বাংলোর সামনে এসে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে তাদের হাঁটা মন্থর হয়ে এলো। বাংলোটি সাহেবদের বাংলোর মতো। সামনে একটা লম্বা চওড়া বারান্দা। জানালাগুলো সাধারণত অসমীয়াদের বাড়ির জানালা থেকে বড়ো। দরজা জানলায় চকচকে কাঁচ। বাড়ির সামনে সুন্দর ফুলের বাগান। তার মাঝখানে একটা বড়ো বেলগাছ। এই গাছটার জন্যেই মনে হয় বাংলোটির নাম "বিল্বকুটীর"। বেলগাছটার নিচে পরিস্কার পরিচ্ছন্ন জায়গাটায় পাঁচ - ছয় বছরের একটি মেয়ে তার থেকে বয়সে বড়ো আর একটি মেয়ের সঙ্গে রান্নাবাটি খেলছে। বড়ো মেয়েটি বাড়িতে কাজ করে। ছোটটির পোষাক-আষাক, ধরন ধারন সাহেবদের ছেলে মেয়েদের মতো। গলায় এবং হাতে ফ্রিল দেওয়া লম্বাঝুলের ফ্রক। চুলে লাল ফিতে। উজ্জ্বল গৌরবর্ণ। চোখদুটো বড়ো বড়ো। নাক টিকলো। টানাটানা ভুরুদুটি কুচকুচে কালো। তার সুগঠিত চেহারায় ফুটে উঠেছে ভবিষ্যতের রূপ-লাবন্যের সম্ভাবনা।

স্কুলের মেয়েদুটি বিল্বকুটিরের সামনে দাঁড়িয়ে, বাইরের গেটের ফাঁক দিয়ে অনেকক্ষণ ছোট মেয়েটির দিকে তাকিয়ে রইল। নগাঁওর সাধারণ মানুষের কাছে এই বাড়িটি অনেক কারণেই কৌতুহলের। গৃহকর্তা গুণাভিরাম বরুয়া কয়েক বছর আগে 'এক্‌সট্রা অ্যাসিস্ট্যান্ট' হয়ে নগাঁওতে বদলি হয়ে এসেছেন। অসমীয়াদের মধ্যে এরকম উচ্চপদস্থ সরকারী চাকুরে সেই সময় খুব কম ছিল। অবশ্য কুড়িবছর আগে নগাঁওর লোকেরা আনন্দরাম ঢেকিয়াল ফুকনকে 'সাব - আসিস্টান্ট' হিসেবে পেয়েছিল। তখন তিনি মানুষের কল্যাণে অনেক কাজ করেছিলেন। কিন্তু সকলকে কাঁদিয়ে অকালেই তিনি চলে যান। ফুকনের ছোট ছেলে রাধিকারামকে কোলে নিয়ে গুণাভিরাম মুখাগ্নি করিয়েছিলেন, সে - দৃশ্য অনেকেরই চোখে এখনো ভাসে ও সেইজন্যেও নগাঁওর পুরনো বাসিন্দাদের কাছে গুণাভিরাম বরুয়া অপরিচিত নন। কিন্তু তার ভাবনা চিন্তা আর কাজকর্ম সেই সময়ের আসামের মানুষের কাছে ছিল অভাবিত। নগাঁওতে বদলি হয়ে আসার আগেই তিনি ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। সে সময় গোঁড়া হিন্দুদের কাছে ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ আর খ্রীষ্ট ধর্মে দীক্ষিত হওয়ার মধ্যে বিশেষ পার্থক্য ছিল না। ব্রাহ্মধর্মের উদারতা, আড়ম্বরহীনতা ইত্যাদি দিকগুলির সঙ্গে খ্রিষ্টান ধর্মের প্রোটেষ্টান্টদের ধর্মীয় রীতিনীতির বহু মিল। তাই আনন্দরাম ঢেকিয়াল ফুকনের কাকা যজ্ঞরাম খারঘরীয়া ফুকন কলকাতায় রাজা রামমোহন রায়ের সান্নিধ্যে এসে যখন ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করলেন, তখন দাদা হালিরাম ঢেকিয়াল ফুকন সঙ্গে সঙ্গে কলকাতায় গেলেন ভাইকে খ্রিষ্টান হওয়া থেকে বিরত করতে। এই টিয়াকিয়া অধ্যাপকের বংশে ব্রাহ্মধর্ম তখন অপরিচিত ছিল না। কলকাতায় পড়বার সময় গুণাভিরাম তাদের শুভাকাঙ্খী অনেক ব্রাহ্মপরিবারেরই সংস্পর্শে এসেছিলেন।

ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করার চেয়েও দুঃসাহস ও চাঞ্চল্যকর আরও একটি কাজ গুণাভিরাম করেছিলেন। অসমিয়া নৈষ্ঠিক ব্রাহ্মণ সমাজ তাঁর জায়গায় এমনটা অন্য কেউ করলে তাদের সমাজচ্যুত করত। বিধবা বিবাহের সমর্থনে 'রাম-নবমী' নাটকটি লিখেই তিনি

ক্ষান্ত হননি, নগাঁওতে বদলি হয়ে আসার বছর খানেক আগে বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী নামের একজন ব্রাহ্মণ বিধবাকে তিনি বিয়েও করেছিলেন। কিন্তু তাঁর ব্যাক্তিত্ব, পান্ডিত্য ও সরকারী উচ্চপদের জন্য তাঁকে প্রকাশ্যে একঘরে করার সাহস কারও হয়নি। বরং তাঁর ব্যক্তিত্ব আর কাজকর্মের কথাই সকলের মুখে মুখে ফিরত। তাঁর পরিবারের বাকি সবাইও সবার কৌতুহলের বিষয় হয়ে পড়েছিল। সেই জন্যেই গুণাভিরামের ছোট মেয়ে স্বর্ণলতার রান্নাবাটি খেলার দৃশ্যটি আরও হাজারো মেয়ের রান্না করার মতো হলেও দ্রষ্টব্য বস্তু হয়ে উঠেছিল।

মিশন স্কুলের মেয়েদুটি তার দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে ছিল। স্বর্ণলতাও মুখ তুলে তাদের দেখল। তারপরে খেলা বন্ধ করে সে আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়ালো। এই মেয়েদুটিকে তাদের গেটের সামনে দিয়ে যাওয়া - আসা করতে স্বর্ণলতা প্রায়ই দেখে। তাদের সম্পর্কে জানতে তার খুবই ইচ্ছে করে। কিন্তু নিজে গিয়ে তাদের সঙ্গে কথা বলতে তার সংকোচ হয়। মেয়েদুটিও কিছুক্ষণ তার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে আস্তে আস্তে চলে গেল। ওরা চোখের আড়াল হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে স্বর্ণলতা একটু সময় কিছু - একটা ভেবে নিয়ে দৌড়ে বাড়ির ভেতরে ঢুকে গেল।

দুই

'বিল্বকুটীর' নামটা যদিও কোন প্রাচীন কালের মুনি - ঋষির আশ্রমের ছবির কথা মনে পড়িয়ে দেয়, আসলে কিন্তু বাড়িটার গড়ন সে -যুগের সাহেবী শাসকদের বাড়ির ব্যবহারিক জ্ঞানেরই পরিচয় দেয়। ইংরেজরা যখন প্রথম আসামে এসে দেখতে পেল যে একটানা বৃষ্টি আর বন্যার জন্যে বছরের বেশির ভাগ সময় নিচু জমিগুলি জলে ডুবে থাকে, তখন তারা স্থির করলো যে এখানে থাকতে গেলে তার উপযুক্ত বাড়ি হবে ব্রাহ্ম দেশীয় বাড়িগুলোর মত উঁচু উঁচু খুঁটির ওপরে বানানো 'টঙের ঘর'। আসামের গ্রামের লোকেরা বর্ষার সময় দুঃখ - কষ্ট সহ্য করে জলে ডুবে থেকেও কেন উঁচু জায়গায় বাড়িঘর তৈরী করে না বা মিছিংদের মতো টঙঘরে কেন থাকে না, এই কথা ভেবে বিদেশীরা আশ্চর্য হয়ে যেত। 'অরুণোদই,' কাগজে একজন আমেরিকান পাদ্রী লিখেছিলেন: সাম বা ব্রহ্মদেশ এবং অন্যদেশে বসবাসকারী লোকেরা উঁচু করে বানানো টঙঘরে থাকে; অসমীয়ারাও সেই রকম ৩/৪ হাত উঁচু করে যদি টঙ্ঘর বানায়, তাহলে অনেক দিক দিয়ে ভালো হবে, আর এখনকার চেয়ে জ্বর-টর ইত্যাদি নানারকম রোগব্যামো কম হবে। আর জাতিকুলের কথা ভেবে যদি তারা ইতঃস্তত করে, তাহলে ভাত রান্নার জন্যে একটি ছোট ঘর নিচু জমিতে তৈরি করতে পারে, কিন্তু থাকা, শোওয়া বা জিনিষপত্র রাখার জন্যে টঙ্ঘর যথার্থই ভালো।

এই টঙঘরের প্রয়োজনীয়তার কথা গুণাভিরাম শৈশবকাল থেকেই ভেবে এসে ছিলেন।। তাঁর অভিভাবক এবং পরে ভগ্নীপতি আনন্দরাম ঢেকিয়াল ফুকন নগাঁওতে থাকার সময় প্রথমে ছিলেন সাহেবের বাংলোতে এবং পরে থাকতেন্ নিজের প্রয়োজন অনুযায়ী তৈরী করে নেওয়া টঙের বাংলোতে। গুণাভিরাম ও কয়েকবছর তাঁর সঙ্গে সেই বাংলোতে ছিলেন। শৈশবকাল থেকে কমিশনার জেন্‌কিন্স সাহেব এবং পাদ্‌রীদের সঙ্গে ফুকন পরিবারের ঘনিষ্ট সম্পর্ক থাকার ফলে বিদেশীদের ধ্যান ধারনা, থাকা খাওয়া , রীতিনীতি তাঁদের গভীর ভাবে প্রভাবিত করেছিল। সেই জন্যে 'বিল্বকুটীর' ছিল টঙবাংলো আর অসমীয়া খড়ের ঘরের এক সুন্দর সংমিশ্রণ। সামনে বসবার ঘর, শোওয়ার ঘর আর পড়বার ঘর ছিল টঙবাড়ীতে। পিছনদিকের উঠনের দুইদিকে রান্নাঘর, পুজোর ঘর, গোয়াল ঘর, চাকর বাকরদের ঘর ইত্যাদি ছিল মাটির। বর্ষার দিনে পাকাঘর থেকে রান্নাঘরে যেতে প্রথম - প্রথম যথেষ্ট অসুবিধা হত। কিন্তু নৈষ্ঠিকতার খাতিরে সেইটুকু কষ্ট বরুয়া আর তাঁর পরিবারের সকলে সহ্য করতেন। পরে অবশ্য টঙঘর থেকে রান্নাঘরে যাওয়ার জন্যে উপরে চাল দেওয়া একটা উঁচু রাস্তা করে দেওয়া হয়েছিল।

স্বর্ণলতা বেলগাছের তলা থেকে মাকে খুঁজতে খুঁজতে পেছনদিকের চওড়া বারান্দাতে পৌঁছাল। যদিও সে দৌড়ে আসছিল, তবুও বাংলোর ভিতরে পা রাখার সঙ্গে সঙ্গে যতদূর সম্ভব আস্তে আস্তে পা ফেলছিল। বাংলোর মেঝেটি কাঠের, ফলে জোরে - জোরে পা ফেললে শব্দ হয়। তাই মা তাকে ছোটবেলা থেকে শিক্ষা দিয়েছিলেন যে ঘরের ভিতরে দুপ্ দাপ্ করে পা ফেলা উচিত নয়। বাবার পড়াশুনোর ব্যাঘাত হয়। বিল্বকুটীরে পড়ার ব্যাঘাত হওয়াটা একটি গুরুতর অপরাধ। ফলে এই বিষয়ে সবাই সচেতন ছিল।

ছোট স্বর্ণলতা যখন বসার ঘরটা পার হয়ে পেছনদিকের বারান্দাতে পৌঁছাল, তখন অবশ্য গুণাভিরাম বাংলোর ভিতরে ছিলেন না। কাছারিতে যাওয়ার সময় হয়ে গিয়েছিল বলে তিনি মাঝখানের ঘরে ভাত খেতে বসেছিলেন। ভাত - রান্নার ঘর, চা - জলখাবার খাওয়ার ঘর আর মাঝখানের ঘর — এই তিনটি ঘরের সমষ্ঠি হচ্ছে রান্নাঘর। রান্নাবান্না করার জন্যে একজন রাঁধুনি বামুন ছিল। কারণ বড়ুয়ার সংসারে লোক অনেক। নিজের আত্মীয়স্বজন ছাড়াও বাইরের অতিথি প্রায়ই থাকে। বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী কখনো - কখনো এটা - ওটা সুস্বাদু ব্যঞ্জন রান্না করে পরিবারের সবাইকে নিজের হাতে পরিবেশনও করতেন। আজকেও স্বামীর পাতে ভাত বেড়ে দিয়ে তিনি কাছে বসেছেন। এমন সময়ে মেয়ে স্বর্ণ তার গলা জড়িয়ে ধরে বলল, "মা, আমিও ইস্কুলে যাব। খ্রিষ্টান মেয়েদের ইস্কুলে যাওয়া দেখলে কী ভালো লাগে! আমিও খ্রিষ্টান হতে পারি না?"

বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী অবাক হয়ে মেয়ের মুখখানি একটু দেখে আস্তে ধমক দেওয়ার সুরে বললেন," ছিঃ, সোনামা, এরকম বলতে নেই।" — কিন্তু গুণাভিরাম বড়ুয়া হঠাৎ কথাটা শুনতে পেয়ে হাতের ভাতের গ্রাসটি পাতে রেখে মেয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে মোলায়েম সুরে বললেন, "খ্রিষ্টান না হলেও তুই পড়ার সুযোগ পাবি, মা! কাল থেকে তোর বিদ্যারম্ভ হবে।"

সেইদিন সন্ধেবেলা গুণাভিরাম কাছারী থেকে ফিরে এসে চা-জলখাবার খেয়ে বিশ্রাম নেবার সময় বিষ্ণুপ্রিয়া জিজ্ঞেস করলেন, ''সোনামাকে মিশনস্কুলে পাঠাবার কথা ভাবছেন নাকি? আপনি তখন চলে যাওয়ার পর থেকে ও আমাকে বারবার একই প্রশ্ন করে পাগল করে তুলেছে।''

বড়ুয়া কিছুক্ষণ চিন্তা করে বললেন, ''পড়ার জন্যে খ্রিষ্টানদের কাছে পাঠাতে আমার মনে কোন দ্বিধা নেই। মিশনারীরা পশ্চিমী নিয়মে শিক্ষা দেয়। সেই শিক্ষাতেও আমাদের অনেক ভালো হতে পারে। এতদিন আমাদের এই আসামে স্ত্রী শিক্ষা ছিলই না। খ্রিষ্টানরাই একমাত্র সেইদিকে দৃষ্টি দিয়েছে। এ আমাদের কাছে খুব আনন্দের কথা।''

স্বামীর সঙ্গে এই বিষয়ে বিষ্ণুপ্রিয়া সম্পূর্ণ একমত হতে পারলেন না। সরকারী কাজ আর অধ্যয়নে ব্যস্ত থাকার জন্যে গুণাভিরামকে যেসব সমস্যা স্পর্শ করে না, বিষ্ণুপ্রিয়াকে প্রতি পদে-পদে সেই সমস্যা গুলোর সম্মুখীন হতে হয়। বেশীর ভাগ সময় তিনি একাই তার সমাধান করার চেষ্টা করেন। স্বামীর কাজকর্মে বিঘ্ন হতে পারে এরকম কোন পরিস্থিতি সৃষ্টি হোক্ — এটা তিনি চান না। কিন্তু অসীম সাহস আর দৃঢ়তার সঙ্গে তিনি যেরকম ভাবে সমাজের চাপিয়ে - দেওয়া সব অপবাদ আর কুসংস্কারের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে এসেছেন, ঠিক তেমনি নিজের সব সন্তানও যেন সেইসব পরিস্থিতি থেকে নিজেদের রক্ষা করতে পারে, এই তাঁর ইচ্ছে। স্বর্ণলতার নিষ্পাপ মুখখানি দেখে বিষ্ণুপ্রিয়া প্রায়ই মনে-মনে প্রার্থনা করেন, '' হে প্রভু, সে যেন জীবনে কোনো দুঃখ না পায়''। এই প্রার্থনার অন্তরালে আছে সামাজিক সংস্কার আর জীবন যাপনের হাজারো বছরের প্রভাব, যে - প্রভাব সমাজ বিপ্লবীদেরও মাঝে - মাঝে বিচলিত ক'রে তোলে। এরকম হওয়ারও কারণ আছে। গোটা সমাজের চাকা যখন একটা সংকীর্ণ পথে চলতে থাকে, তখন সেই পথটা বাদ দিয়ে আরেকটা প্রশস্থ পথ খুঁজতে প্রথম যে দুই একজন যায়, তাদের চলার পথ অত্যন্ত দুরূহ হয়ে ওঠে। পাশে দৃঢ় মনোভাবের একটা সহযাত্রী দল না - থাকলে প্রথম যাত্রী কয়েকজন কে রাস্তা হারিয়ে আবার পুরনো পথে ফিরে আসতেও দেখা যায়। গুণাভিরাম বরুয়ার মনের দৃঢ়তা ছিল অটুট। কারণ, তিনি যখন শহরে থাকতেন, তখন তাঁর ধীমান্ সতীর্থের অভাব ছিল না। নগাঁওর মতো একটা গ্রামদেশেও তিনি দেশী বিদেশী এমন কয়েকজন বুদ্ধিজীবী মানুষের সঙ্গে মেশার সুযোগ পেয়েছিলেন, যাঁরা সবাই তাঁদের স্বক্ষেত্রে সামাজিক সংকীর্ণতার উর্ধ্বে উঠতে সক্ষম হয়েছিলেন।

কিন্তু বিষ্ণুপ্রিয়ার সমস্যাগুলো ছিল একটু অন্য ধরনের। গুণাভিরামের সঙ্গে বিয়ের আগে যে সমাজের সঙ্গে তিনি পরিচিত ছিলেন সেই সমাজ এখনো তাঁকে সহজভাবে গ্রহণ করেনি। অথচ মানসিক ভাবে সেই সমাজ থেকে এখনো তিনি নিজেকে বিচ্ছিন্ন ও করতে পারেন নি। অসমীয়া নৈষ্ঠিক ব্রাহ্মণ সামজের কিছু কিছু রীতিনীতি এবং অন্ধবিশ্বাস এখনো তিনি আঁকড়ে ধরে আছেন। তাছাড়া মানসিক দিক থেকেও তিনি খুবই একলা। হারানো আত্মবিশ্বাস ফিরে পাওয়ার জন্যে স্বামীর বাইরে অন্য কারো সহযোগীতা তিনি

পাননি। সেই জন্যে মাঝে মাঝে তিনি নিজেকে ভীষণ অসহায় আর দোষী ভাবেন। তাই তিনি ভগবানের কাছে একান্তচিত্তে স্বামী এবং সন্তানদের রক্ষার জন্যে প্রার্থনা করেন। তাঁর জীবিত সন্তানদের সংখ্যা এপর্যন্ত চার — আগের পক্ষের দুটি কন্যা সন্তান— কালীপ্রিয়া ও দময়ন্তী। দুজনেরই কম বয়সে বিয়ে হয়ে গেছে। দ্বিতীয় বিয়ের দুটি ছেলেমেয়ে স্বর্ণলতা আর করুণাভিরাম। সত্যভিরাম নামের পুত্রসন্তানটি শৈশবে মারা গেছে।

স্ত্রী - শিক্ষা সম্পর্কে স্বামীর দেওয়া মন্তব্যের উত্তরে বিষ্ণুপ্রিয়া বললেন — ''আজকাল নাকি কলকাতার অনেক শিক্ষিত লোকেরাই স্ত্রী - শিক্ষার ব্যাপারে উঠে-পড়ে লেগেছেন। মিশানস্কুলে না গিয়েও আমাদের মেয়েরা দেশী স্কুলে পড়তে পারবে না কেন?''

কলকাতার স্ত্রী - শিক্ষার জন্যে মহামতি ঈশ্বরচন্দ্র আর অন্য সব জ্ঞানী-গুণীর কাজ কর্ম সম্পর্কে সজাগ মানুষ সেই যুগে আসামে গুণাভিরামের মত আর কজনই বা ছিলেন? যুবক - বয়সেই বিদ্যাসাগরকে নিজের আরাধ্য গুরু হিসেবে মেনে নিয়ে তাঁর কাজ কর্মের দ্বারা তিনি প্রভাবিত হয়েছিলেন। কলকাতায় পড়বার সময় সেই তখনই তিনি 'অরুণোদই' পত্রিকাতে লিখেছিলেন যে মেয়েদেরও ছেলেদের সঙ্গে সমানে শিক্ষা দেওয়া উচিত। ভারতের অন্যান্য জায়গার তুলনায় আসামের লোকেরা এক্ষেত্রে পেছনে পড়ে আছে। গুণাভিরাম 'অরুণোদই' — এর পাঠকদের বোঝাতে চেষ্টা করেছিলেন যে 'মেয়েদের পড়তে দেওয়া উচিত নয়' — এই কুপ্রথা তুলে না দিলে আসামের সামগ্রিক উন্নতি কখনই সম্ভব নয়।

কিন্তু সেই চিঠি লেখার কুড়িবছরের পরেও আসামে স্ত্রী - শিক্ষার উন্নতির জন্যে কোনো চেষ্টা গুণাভিরামের চোখে পড়ল না। সেইজন্যেই নিজের মেয়ের পড়ার ব্যাপারে তিনি এবং বিষ্ণুপ্রিয়া এত চিন্তাতে পড়েছিলেন। নগাঁওতে পাদরী মেমেদের স্কুলটি ছাড়া মেয়েদের শিক্ষা দেবার অন্যকোনো ভালো স্কুল ছিল না। অথচ পাদ্রীদের সঙ্গে কথা বার্তা বলে গুণাভিরাম এটুকু বুঝেছিলেন যে ধর্মপ্রচারই মিশনারীদের শিক্ষানীতির প্রধান লক্ষ্য। সুদূর আমেরিকা থেকে এত দুঃখ কষ্ট সহ্য করে আসামের দুর্গম অঞ্চলে পশ্চিমী শিক্ষা বিস্তার করার আড়ালে ছিল তাঁদের খ্রিষ্টান ধর্মের প্রতি গভীর আনুগত্য এবং ধর্মপ্রচারের মাধ্যমে 'অবিশ্বাসী' লোকদের ''একমাত্র শুদ্ধ'' পথ দেখানোই ছিল তাঁদের একমাত্র - উদ্দেশ্য। সেই জন্যেই ধর্মের প্রতি উদার মনোভাব থাকা সত্ত্বে ও ধর্মপ্রচারের উদ্দেশ্য থাকা কোন প্রতিষ্ঠানে কমবয়সী একটি মেয়ের শিক্ষার ভার তুলে দিতে - গুণাভিরামের দ্বিধা ছিল। পশ্চিমী শিক্ষার মাধ্যমে আধুনিক জগতের সঙ্গে পরিচয় এবং সংকীর্ন মনোভাব পরিত্যাগ করে জীবন আর জগৎ সম্পর্কে উদার দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণে তিনি গভীরভাবে বিশ্বাসী ছিলেন। কিন্তু তারজন্যে হিন্দুধর্ম ত্যাগের তিনি পক্ষপাতীনন। তাঁর ধারনায় ব্রাহ্মধর্ম হল হিন্দু ধর্মেরই এক ধরনের রুপ। এর মধ্যে আছে প্রাচীন বৈদিক ধর্ম ও আধুনিক ধ্যানধারণার অপূর্ব মিশ্রণ। সেইজন্যেই গুণাভিরাম নিজের ছেলেমেয়েদের পশ্চিমী শিক্ষা এবং প্রাচীন - বৈদিক পরম্পরা — এই দুটি বিষয়েই শিক্ষা দিতে চেয়েছিলেন।

কিন্তু প্রশ্ন হল নগাঁওতে সেরকম শিক্ষার কোনো সুবিধা আছে কি?

এই সব ভাবনাচিন্তা করে শেষে গুণাভিরাম স্থির করলেন, স্বর্ণলতাকে প্রথমে একজন গৃহশিক্ষক প্রাথমিক শিক্ষা দেবেন। তারপরে ধীরে ধীরে ভবিষ্যতের চিন্তা করা যাবে।

তিন

সেই - সময়ে নগাঁওর কোর্টে ওকালতি পাশ না করেও কয়েকজন অসমীয়া আর বাঙালি ভদ্রলোক ওকালতি করতেন। তাঁদের সরকার পুরনো নিয়ম অনুসারে ওকালতি চালিয়ে যাওয়ার অনুমতি দিয়েছিলেন। তাঁদের অবশ্য "পাকা উকিল" বলে ধরা হত না। এরকমই একজন উকিল ছিলেন পঞ্চানন শর্মা। ইংরেজী ভাল করে বলতে না পারলে ও তিনি অসমীয়া, বাংলা আর সংস্কৃত তিনটে ভাষাই লিখতে আর পড়তে পারতেন। গুণাভিরাম বড়ুয়া "আসাম বুরঞ্জী"লেখার সময় শর্মা প্রায়ই এসে লেখা নকল করাতে সাহায্য করতেন। সেইজন্যে বড়ুয়ার পড়ার - ঘরে তাঁকে প্রায় প্রতি সন্ধ্যায় দেখা যেত। বড়ুয়ার পান্ডিত্যকে শর্মা শ্রদ্ধা করতেন; বিষ্ণুপ্রিয়ার প্রতিও তাঁর যথেষ্ট সম্ভ্রম ছিল। কিন্তু বড়ুয়ার ঘরে তামোল ছাড়া তিনি অন্যকিছু গ্রহণ করতেন না। সেইজন্য অবশ্য বিষ্ণুপ্রিয়া আর তাঁর স্বামী কিছু মনে করেন নি। তাঁদের নিজেদের নিকট আত্মীয়েরাই সমাজিক ভাবে গ্রহণ করেন নি, নতুন পরিচিত লোক তাদের জাত যাবার কথা ভাবলে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই।

যাইহোক, স্বর্ণলতার জন্যে গৃহশিক্ষকের ভারটা গুণাভিরাম পঞ্চানন শর্মাকে দেবেন বলে ঠিক করলেন। বিষ্ণুপ্রিয়ার সঙ্গে যেদিন মেয়ের পড়ার বিষয়ে আলোচনা করেছিলেন, সেইদিনই সন্ধ্যেবেলা উপাসনার পরে বৈঠকখানাতে বসে গুণাভিরাম শর্মার সামনে কথাটা পাড়লেন। শর্মা প্রথমে বিস্ময়ে বড়ো বড়ো চোখে তাকিয়ে রইলেন; ভাবখানা যেন — মেয়ে পড়ানোর জন্য - গৃহশিক্ষক! "মেয়েকে খ্রিস্টান স্কুলে মাষ্টারনী বা দিদিমনি করবে বলে ভাবছো নাকি?" রামায়ণ মহাভারত পড়ার জন্যে যেটুকু শিক্ষা লাগে, মা - বাবা মেয়েকে তা ঘরেই দিতে পারবেন। আজবাদে কাল যে মেয়েকে অন্যঘরে পাঠিয়ে দিতে হবে — তাকে রান্নাবান্না, তাঁতে কাপড় বোনা ইত্যাদি - গৃহকর্মগুলিই শেখাতে হয়। মিছামিছি গণিত, ব্যাকরণ পড়িয়ে সময় নষ্ট করার কী দরকার? নিজেরও একটি মেয়ে আছে। নাম লক্ষ্মীপ্রিয়া। স্বর্ণলতা থেকে ও দুবছরের বড়ো। কিন্তু তাকে আজপর্যন্ত পড়ানোর কথা শর্মা কল্পনাই করেননি। অবশ্য তাঁর কাছ থেকেই মেয়েটির অসমীয়া বর্ণমালার জ্ঞান হয়েছে। সকাল সন্ধ্যে মা এবং ঠাকুমাদের সঙ্গে গোঁসাই নাম আইনাম, বিয়ানাম গাইতে শিখেছে। লক্ষ্মীর পাঁচালীর কয়েকটি পৃষ্ঠা বলে যেতে পারে। রান্নাঘরে শাক্ সবজি্ কাটা, তাঁতের কাজে সাহায্য করা, ছোটছোট ভাই বোনদের দেখাশোনায়

লক্ষ্মীপ্রিয়া অনবরত ব্যস্ত থাকে। ও পড়াশুনো করতে চাইলে ঘরের কাজ কি করে চলবে?

পঞ্চানন শর্মা অবশ্য মনে আসা এইসব কথা গুণাভিরামের সামনে বললেন না। স্ত্রী - শিক্ষা সম্পর্কে গুণাভিরামের উদার ধ্যান-ধারণার কথা তিনি ভালো করে জানেন। তবুও নিজের বিস্ময় প্রকাশ করেই বললেন — "আমাদের এদিকে ভদ্রঘরের মেয়েকে পড়াবার কথা শোণা যায়না; আপনি খুব উদারমনের বলেই এরকম একটা নতুন কাজ করতে এগিয়ে এসেছেন।"

এর উত্তরে গুণাভিরাম যে ক'টি কথা বললেন, সেই কথাগুলি তিনি আগেও বহুবার বলেছেন। কাগজ-পত্রে ও লিখেছিলেন। "আমি কোনো নতুণ কাজ করতে চাইছি না শর্মা, মেয়েকে ছেলের সঙ্গে সমানভাবে শিক্ষা দেবার কথা শাস্ত্রে আছে। প্রাচীনকালে ছেলেদের মতো মেয়েদেরও উপনয়ন দেওয়ার পরে গুরুগৃহে শিক্ষার জন্যে পাঠানো হত। বাল্যবিবাহ প্রথা আরম্ভ হওয়ার পরে এই নিয়ম বন্ধ হয়ে গেল। পরমেশ্বর যদি মেয়েদের পুরুষের মতো জ্ঞানী হওয়াটা না চাইতেন, তাহলে মেয়েদের বিচার বুদ্ধির শক্তি না দিয়ে জন্তুর মতো করলেই পারতেন। কিন্তু পৃথিবীর এগিয়ে যাওয়া দেশগুলিতে মেয়েরা পড়াশুনো করে ভালো ভালো বই লিখছেণ। আমাদের মেয়েরা সেইরকম জ্ঞান-অর্জন করতে পারলে নারী পুরুষ উভয়েরই মঙ্গল হবে"।

পঞ্চানন শর্মা হাকিম বড়ুয়ার মুখে এইসব কথা আগেও শুনেছেন। কিন্তু শুধু সুন্দর বচনবিন্যাসেই সমাজের পরিবর্তন হতে পারে বলে তাঁর মনে হয় না। তাঁর মতে বড়ুয়া মহাশয়ের সব কথা বার্ত্তাই একটু অন্যধরনের। অসমীয়া সমাজের সঙ্গে খাপ খায় না। যুক্তিতে শ্রীযুত বড়ুয়ার সঙ্গে পারা সম্ভব নয় বুঝে পঞ্চানন শর্মা তর্ক করলেন না। ভদ্রতা রক্ষা করেই তিনি বললেন, "আপনার মত জ্ঞানী লোক পথ প্রদর্শক হোক, ধীরে ধীরে অন্যেরাও সেই পথই নেবে। ঠিক আছে, কাল থেকেই আমি স্বর্ণর পড়ানোর দায়িত্ব নেবো।"

চার

স্বর্ণলতার কাছে প্রত্যেক ভোরবেলা বাবার সঙ্গে বেড়াতে যাওয়ার সময়টুকু ছিল দিনের মধ্যে সব চেয়ে আনন্দের। গুণাভিরামের এই প্রার্তভ্রমণ ছিল খুব নিয়মিত। বৃষ্টি হীন সকালে তিনি কলংয়ের পাড়ে পাড়ে বেড়াতে গিয়ে পথে মেয়েকে নানা কথা বোঝাতে বোঝাতে যেতেন। কী করে গাছের পাতাগুলি নিঃশ্বাস নেয়, কোন্ পাখির ডাক কেমন, কলং নদীটি ব্রহ্মপুত্র থেকে বেরিয়ে এসে আবার কেমন করে ব্রহ্মপুত্রে মিশে গেছে — এই সব নানা কথা তিনি বলতেন। স্বর্ণ তার কিছু বুঝতে পেরেছিল, কিছু কথা বুঝতে

পারেনি। কিন্তু বুঝতে না পারলেও তার ভালো লাগতো যে বাবা তারসঙ্গে কথা বলছেন। বাবার প্রতি স্বর্ণর গভীর শ্রদ্ধা। 'বিল্বকুটীরে' - বেড়াতে আসা জ্ঞানীগুণী মানুষের মাঝখানে বাবাকে বসে আলোচনায় মগ্ন থাকা অবস্থায় দেখে ছোট্ট স্বর্ণর মনে এমন এক - গভীর বিশ্বাসের জন্ম হয়েছিল যে তার বাবা পৃথিবীর সব চেয়ে জ্ঞানী লোক তারমনে উদয় হওয়া একশ একটা প্রশ্নের সঠিক উত্তর একমাত্র বাবাই দিতে পারেন একদিন ভোরবেলা সাহেবদের সুন্দর বাংলোগুলির সামনে দিয়ে বেড়াতে যাওয়ার সময় স্বর্ণ হঠাৎ বাবাকে - জিজ্ঞেস করল,"বাবা, সাহেবরা গীর্জায় যায় না?"

গুণাভিরাম অন্যমনস্ক ভাবে মাথা নাড়লেন। তিনি কিছু একটা কথা চিন্তা করছিলেন। সেইজন্যে অনেকক্ষণ চুপচাপ ছিলেন। কিন্তু স্বর্ণের দ্বিতীয় প্রশ্নটি গুণাভিরামকে সজাগ করে তুলল।

"বাবা, গীর্জাতে গেলে কি জাত যায়?" গুণাভিরাম অবাক হয়ে মেয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন —

" তোমাকে এসব মন্দ কথা কে শেখাচ্ছে সোনামা ?"

"কাল পঞ্চানন কাকা বলেছিলেন,"- স্বর্ণ ভয়ে ভয়ে উত্তর দিল। কিন্তু শিশুসুলভ কৌতূহল দমাতে না পেরে সে আবার প্রশ্ন করল," জাত কেমন করে যায়, বাবা?"

গুণাভিরাম কিছুক্ষণ একটা কথাও বললেন না। পঞ্চানন শর্মার ওপর তাঁর মনে মনে খুব রাগ হচ্ছিল। সামান্য কদিনেই সে ছোট্ট মেয়েটিকে এমন মন্দ কথা শিখিয়েছে? কিন্তু তারপরে তিনি উপলব্ধি করলেন যে পঞ্চানন শর্মার মতো প্রাচীন ধারনার মানুষেরা জাতপাতের বাছবিচার করাটা দেশাচার বলেই মনে করেন। সুতরাং তাঁর ওপরে রাগ করে কি লাভ? নিজের ছেলে মেয়ে কটিকে অবশ্য গুণাভিরাম এইসব কুসংস্কারের উর্ধ্বে রাখাই ভালো মনে করেন। কিন্তু তা করতে হলে তাদের নিছক খারাপ কথা থেকে আড়াল করে রাখলেই যেন হবে, তাদের যুক্তি দিয়ে বুঝিয়েও দিতে হবে কোন্টা ভালো, কোনটা খারাপ। গুণাভিরাম সেজন্যে ধীরভাবে স্বর্ণের প্রশ্নের উত্তর দিতে থাকেন।

"জাতপাত এগুলো আমাদের দেশের কু-সংস্কার । মানুষের স্বভাবই হল আসল। যার স্বভাব ভালো, তাঁর জাতও উঁচু, যে সবসময় খারাপ কাজ করে সে হচ্ছে নিচু জাতের। গীর্জাতে গেলে আবার জাত যায় কেমন করে? গীর্জাতে ভগবানের উপাসনাই হয়। উপাসনা করাটা কি খারাপ কাজ? ঈশ্বরের উপাসনা তা যে ধর্মেরই হোক্ না কেন, তার থেকে পবিত্র কাজ আর কিছুই নেই।" গুণাভিরাম কথাগুলি বলা শেষ করে মেয়ের মুখের দিকে চাইলেন। তার সুন্দর মুখে একটা অসহায় ভাব। হঠাৎ গুণাভিরাম উপলব্ধি করলেন, সে যে বড্ড ছোট। এত জটিল তত্ত্ব সে কেমন করে বুঝবে? এইবার তিনি স্নেহভরে বললেন, " আসছে রবিবারে তোকে আমি গীর্জাতে উপাসনা দেখাবার জন্যে নিয়ে যাবো?" স্বর্ণর-ঠোঁটে এবার আনন্দের হাসি ঝল্‌মল্ করে উঠল। তারমানে বাবার রাগ হয়নি সে বুঝল।

রবিবার দিন ভোর বেলা নতুন গীর্জাঘরের সামনে এক উৎসবমুখর অথচ - গম্ভীর পরিবেশ। নগাঁও আর আশপাশের প্রায় সব খ্রিস্টান পরিবারই সেইদিন পরিচ্ছন্ন পোষাক পরে সেখানে উপস্থিত। বেশির ভাগ মানুষই সাধারণ। মুখের চেহারা দেখলেই বুঝতে পারা যায়, — এদের মধ্যে বেশির ভাগই মিকির। দুই একটি বাঙালী আর অসমীয়া পরিবারও আছে। প্রত্যেকেরই পায়ের জুতো বা চপ্পল দেখলেই টের পাওয়া যায় যে রবিবারের বাইরে অন্যদিন জুতো টুতো পরার অভ্যেস নেই বলে বেশীর ভাগই খুব সচেতন ভাবে হাঁটছে। পুরুষ মানুষেরা হাফপ্যান্ট বা পাতলুন আর সার্ট পরেছে। স্ত্রীলোকদের বেশীর ভাগেরই পরনে শাড়ী বা সূতি কাপড়ের রিহা - মেখেলা। প্রত্যেকেরই মাথায় চাদরের ছোট্ট ঘোমটা।

গুণাভিরাম বরুয়া আর স্বর্ণলতা যখন গীর্জাঘরে গিয়ে পৌঁছলেন, তখন উপাসনা আরম্ভ হওয়ার সময় হয়েছে। দুই একজন পরিচিত লোকের দিকে তাকিয়ে মাথা একটু ঝুঁকিয়ে তাঁরা সামনের দিকের আসনে গিয়ে বসলেন। স্বর্ণ একটা সুন্দর ফ্রক পরে গিয়েছিল। মাথায় সিল্কের স্কার্ফ। গুণাভিরাম পরেছিলেন জামা, চাপকান আর মাথায় কালো মখমলের টুপী। তাঁরা গিয়ে বসবার কিছু পরেই উপাসনা আরম্ভ হ'ল। বেদীর সামনে দাঁড়িয়ে যিনি উপাসনা আরম্ভ করলেন তিনি ছিলেন সোনারাম — অর্থাৎ চার্লস্ সোনারাম। স্বর্ণলতা ও তাঁকে আগে দেখেছে। কিন্তু গীর্জাতে এতগুলি সাহেব - মেম উপস্থিত থাকতেও সোনারাম কেন উপাসনাতে মুখ্য ভূমিকা নিয়েছেন সেই কথাটা স্বর্ণ বুঝতে পারল না। যে বাইবেল পুঁথির থেকে সোনারাম পড়ছিলেন সেইটিও অসমীয়াতে লেখা। খ্রিস্টান ধর্মটা তাহলে কেমন করে সাহেবের ধর্ম হল স্বর্ণ ভেবেই পেল না। সোনারামের কথাগুলি খুব মনোযোগ দিয়ে শুনছিল না স্বর্ণ। কিন্তু একজন সাধারণ নিরীহ মানুষ এতগুলি উঁচুতলার মানুষের সামনে অর্নগল কেমন করে কথাগুলি বলেছিল, তা দেখে স্বর্ণও হতবাক্ হয়ে গিয়েছিল।

সোনারামের বলা শেষ করার সঙ্গে সঙ্গে গীর্জাঘরের এককোণে রাখা বড় অর্গ্যানটার সামনে বসে মিস্ কীলার ধীর, সুমধুর সুর একটা বাজাতে আরম্ভ করলেন। মিস্ কীলারকে স্বর্ণ চিনতে পেরেছিল। তিনি বিষ্ণুপ্রিয়ার সঙ্গে কথা বলার জন্যে দু-একবার বিল্বকুটীরে এসেছিলেন। অর্গ্যানের সুরের সঙ্গে সুর মিলিয়ে একদল ছেলে-মেয়ে ধর্মসঙ্গীত গাইতে শুরু করল। দলটার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে স্বর্ণ হঠাৎ লক্ষ্য করল যে তার মাঝখানের একটি মেয়েকে সে আগে দেখেছে। বিল্বকুটীরের সামনে দিয়ে যাওয়া আসা করা সেই মেয়েটিকে 'গোলাপীর মেয়ে' বলেই সে জানে। আসল নামটা জানে না। গান গাওয়ার সময় স্বর্ণ মন্ত্র মুগ্ধের মত মেয়েটির দিকে চেয়েছিল। সেই সবুজ সুতি কাপড়ের মেখেলা পরা মেয়েটি আজ যেন স্বর্ণর দৃষ্টিতে অনেক উপরে উঠে গে'ল।

উপাসনা শেষ হওয়ার পরে সকলে যখন বাইরে বেরিয়ে এল, স্বর্ণের চোখ তখন খুব আগ্রহে মানুষের - ভিড়ের মাঝখানে গোলাপীর মেয়েকে খুঁজতে সুরু করল। মিস্ কীলার

আর অন্য একজন পাদ্‌রী দুজন-গুণাভিরামের সঙ্গে কথাবার্তা বলতে বলতে আগে আগে যাচ্ছিলেন। একদঙ্গল মানুষের পাশ দিয়ে যেতে যেতে হঠাৎ স্বর্ণ তার ঈপ্সিত মেয়েটিকে লাজুক হাসি হেসে তারদিকে এগিয়ে আসতে দেখল।

" তোমার নাম কি?" সে জিজ্ঞেস করল।

" স্বর্ণলতা। তোমার"?

" তারা"।

" তুমি এত ভালো গান গাইতে পারো।" — স্বর্ণ বলল।

তারার চোখে মুখে এক তৃপ্তির হাসি ছড়িয়ে পড়ল। স্বর্ণ তার থেকে বয়সে ছোট হলেও হাকিমের মেয়ের মুখে এরকম প্রশংসা শুনে সে অপার আনন্দ পেল। স্বর্ণকে ও তার পরিবর্তে কিছু একটা ভালো কথা বলতে তার খুব ইচ্ছে হচ্ছিল। ছোট মেয়েটিকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে সে বলে ফেলল, —

"তুমিও খুব সুন্দর।" স্বর্ণর গোলাপী মুখখানি লজ্জায় রাঙা হয়ে গেল। এদিকে ওদিকে একটু খানি তাকিয়ে নিয়ে স্বর্ণ এগিয়ে যাওয়া বাবার দিকে দৌড়ে গেল।

ইতিমধ্যে সঙ্গীসাথীরা তারাকে ঘিরে ধরেছিল। হাকিমের মেয়ের সঙ্গেঁ সে কি কথা বলল তা জানবার জন্যে সবারই কৌতূহল। বিল্বকুটীরের সাহেবী আদব কায়দার মাঝে বড় হওয়া মেয়েটিকে তারা দূর থেকেই দেখেছে। কথা বলার সাহস কেউই পায়নি। কিন্তু তারার কথা আলাদা। সে কোনো কথাতেই পিছু হটতে জানে না। যে কাজটা করবে বলে মনস্থ করে তা সে করবেই। সেই জন্যেই তাকে পাদ্‌রী মেয়েরা এত ভালোবাসে। তারা নাহলে তাদের কোন কাজই হয় না।

পাঁচ

তারা যখন কোলের শিশু, তখনই ওর বাবা সেন্দুরা মারা গিয়েছিল। সেন্দুরা ছিল কমিশনার সাহেবের ঘোড়ার - সহিস। বাংলোর চৌহদ্দির একদিকে ছোট ঘর একটাতে সে তার স্ত্রী গোলাপীর সঙ্গেঁ থাকতো। আসলে গোলাপীকে বিয়ে করবার জন্যে তাকে গ্রামে একঘরে করার রাগেতে সে নওগাঁতে চলে এসেছিল আর সাহেবের বাংলোতে কাজে বহাল হয়েছিল। সে কায়স্থকুলের যুবক ছিল আর গোলাপী ছিল জেলেসম্প্রদায়ের।।

সেন্দুরা সব সময়ই ছিল হাসিখুশি। সাহেবের ঘোড়াগাড়ীর পেছনে - পেছনে একমাইল দৌড়ে যাওয়ার পরও তার মুখের হাসি মিলিয়ে যায়নি। সেই জন্যে সাহেব ও তাকে খুব স্নেহ করতেন। যখন কলেরা অসুখে সে শয্যাশায়ী ছিল তখন সাহেব নিজে গিয়ে তাকে এককৌটো বার্লি দিয়ে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন যে কেমন করে বার্লি সেদ্ধ করতে হয়। সরকারী ডাক্তারকে তিনি সেন্দুরার কাছে পাঠিয়েছিলেন। অবশ্য সমস্ত চেষ্টা বিফলে গেল। মহামারী

সংহারমূর্ত্তি ধরে শয়ে শয়ে মানুষের প্রান নিয়ে নিল। নগাঁওর মানুষ নিরুপায় হয়ে "মহামারীর দেবতার" হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্যে দিন - রাত্রি নাম কীর্ত্তন, পূজা - অর্চ্চনা করতে শুরু করে ছিলেন। সাহেব কিন্তু গোলাপীকে সাবধান করে দিয়েছিলেন যে সে ও যদি নাম কীর্ত্তনে যোগ দিতে যায় তাহলে সরকারী ডাক্তার সেন্দুরার চিকিৎসা করবেনা। সেইকারণে প্রথমে গোলাপী সেদিকে যায়নি। কিন্তু ডাক্তারের ওষুধে কাজ হচ্ছে না দেখে একদিন সাহেব যাতে জানতে না পারে এরকম ভাবে রুপোর দুটি টাকা আর তিনমাসের বাচ্চাটিকে বুকে করে নিয়ে গোলাপী কাছের গ্রামের একদিকে সকলে মিলিতভাবে বড় করে পাতা নামসংকীর্তন সভাতে আশীর্বাদ নিতে গে'ল। রাত্রী একপ্রহরে পুজো সাঙ্গ হওয়ার পরে সকলে মিলে কলাগাছের ভেলায় মুগের ডাল, চাল, গুড়, ঘি ইত্যাদি নানা উপকরণ তুলে দিয়ে কলঙের জলে ভাসিয়ে দেবার জন্যে গেল। গোলাপী কলঙের পাড়ে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম জানিয়ে ইষ্ট দেবতার কাছে কাতর প্রার্থনা করল যেন ভেলার সঙ্গে মহামারীর দেবতা ও চলে যায় আর তার সেন্দুরা পুণরায় উঠে বসে।

এদিকে প্যান্ডেলের নাম - কীর্তনের শব্দ শুনে পাদ্‌রী ব্রন্‌সন্ সাহেব চিন্তিত হয়ে ঘরের বাইরে বেরিয়ে এলেন। খানিক্ষণ আগেই তিনি যার যার বাড়িতে কলেরা হয়েছে বলে টের পেয়েছিলেন তাদের বাড়িতে বাড়িতে গিয়ে রোগীর খবর নিয়ে এসেছিলেন আর দু-একজনকে আমেরিকা থেকে আসা নতুন ওষুধটাও দিয়েছিলেন। এই ওষুধে মিশনস্কুলের বেশ কয়েকজন কলেরায় আক্রান্ত হওয়া ছাত্রের ভালো কাজ দিয়ে ছিল। ঘরের থেকে দুপা হেঁটে এসে কমিশনার সাহেবের বাংলোর সামনে আসতেই তিনি দেখলেন যে কোন একজন লোক বাংলোর গেট খুলে তাঁর দিকে ছুটে আসছে। কাছাকাছি আসার পর লোকটিকে চিনতে পেরে তিনি জিজ্ঞেস করলেন,"কি হল বাপুরাম?"

বাপুরাম কমিশনার সাহেবের সঙ্গী ব্রন্‌সনকে দেখে একটু থতমত খেয়ে বলল "কিছুই হয়নি হুজুর। সেন্দুরার অবস্থা খুব খারাপ। আমি গোলাপীকে ডাকতে যাচ্ছি।"

"কিন্তু এই মধ্যরাত্রে গোলাপী কোথায় গেল?" সাহেব অবাক্ হয়ে জিজ্ঞেস করলেন "মহামারীর দেবতাকে সন্তুষ্ট করার জন্যে লোকেরা বড়করে নামকীর্তনের জন্যে প্যান্ডেল করেছে। সে সেখানেই গেছে," — বাপুরাম ঢোঁক গিলে বলল। সে জানে এই সব পূজো আচ্চার কথা ব'ললে সাহেবরা ভীষণ রাগ করে।

" গড্ সেভ দিজ পিপল্" বলে ব্রানস্‌ন স্বগতোক্তি করে সেন্দুরার ঘরের দিকে - হাঁটতে শুরু করলেন।

সেন্দুরার সমস্ত শরীর স্যাঁতা আর ঠান্ডা হয়ে এসেছিল। চোখের পাতা দুটো উল্টে পাল্টে দেখে ব্রণ্‌সন বুঝতে পারলেন যে শেষসময় এসে গেছে। তবুও তিনি তাড়াতাড়ি বাপুরামের সাহায্যে হাতায় তেল গরম করে নিজেই সেন্দুরার হাত পা গুলোতে মালিশ করতে লেগে গেলেন। একটু পরে খুব কষ্টে চোখ খুলে সে হাঁপিয়ে হাঁপিয়ে গোলাপীকে ডাকল। সাহেবের চোখদুটি ছল্ ছল্ করে উঠেছিল। নরম গলায় তিনি

সেন্দুরার মাথায় হাত বুলিয়ে আশ্বাস দিলেন,'' গোলাপী তোমার জন্যে ভগবানের দয়া ভিক্ষা করতে গেছে। তুমি ও এখন ভগবানের নাম নাও। তিনিই একমাত্র তোমাকে রক্ষা করবেন।''

ব্রনসন্ সাহেবের শান্ত সৌম্য মুখখানির দিকে বহুক্ষণ তাকিয়ে থাকার পর সেন্দুরা বেশ তাঁকে চিনতে পারল। তাঁর গরম হাত খানি নিজের ঠান্ডা হয়ে যাওয়া হাত দুটি দিয়ে জড়িয়ে ধরে সে আকুল হয়ে বলল,

''সাহেব আমাকে বাঁচাও।'' দয়া আর মমতার প্রতীক সাধু মানুষটি তখন সেন্দুরার মাথায় হাত রেখে প্রভুযিশুর নাম উচ্চারন করতে থাকলেন। আস্তে আস্তে সেন্দুরার প্রাণবায়ু বেরিয়ে গেল।

ইতিমধ্যে গোলাপী এসে ঘরে ঢুকেছিল। নামকীর্তনের পরে তার মনটা একটু শান্ত হলো। তার অন্তরের গভীর বিশ্বাস ছিল যে নামকীর্তনের পরে সেন্দুরার অবস্থা ভাল হবে। দরোজার চৌকাটে পা দিয়েই সে দেখল, ব্রন্সন্ সাহেব বিছানার কাছে দাঁড়িয়ে প্রার্থনা করছেন আর বাপুরাম এক কোনে গিয়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। গোলাপীকে দেখে সাহেব আস্তে আস্তে বাইরে বেরিয়ে এলেন। জীবনে তিনি বহুবার এরকম পরিস্থিতির সন্মুখীন হয়েছেন। পাহাড়ের সমতলে দুঃখী অনাথ অনেক হত ভাগ্য মানুষকে মৃত্যুর পরে একটু শান্তি দেওয়ার জন্যে তিনি চেষ্টা করেছেন। নিজের জীবনের রোগ, শোক, হতাশা, ক্লান্তি এই সবকিছু যন্ত্রণার অভিজ্ঞতাই এই ত্যাগীবীরকে আগুনে পোড়া খাঁটি সোনার মতো করে তুলেছে। তবুও এখনো অন্যের দুঃখ দেখলে তিনি বিচলিত হয়ে পড়েন। জীবনের নিষ্ঠুর অভিজ্ঞতা তাঁকে কঠোর উদাসীনতা দিতে পারেনি। গোলাপীর সেন্দুরার দেহের ওপর উপুড় হয়ে পড়া হৃদয়বিদারক কান্নার দৃশ্য দেখে ব্রন্সন আস্তে আস্তে আবার ঘরের ভিতরে ঢুকে পড়লেন। গোলাপীর মাথায় হাত রেখে তিনি তাঁকে সান্ত্বনা দিতে লাগলেন। জীবনে কোনোদিন কোনো ভালো মানুষের কাছে এরকম স্নেহমাখা ব্যবহার না পাওয়া গোলাপীর নিজের চরম বিপদের মুহূর্তে এই পুরুষটিকে সাক্ষাৎ ভগবানের অবতার বলে মনে হল। সেই দিন থেকে সে ব্রন্সন সাহেবকে নিজের আর বাচ্চা মেয়েটির ত্রান কর্তা বলে মেনে নিয়ে তাঁর উপদেশমতো জীবনের বাকী অংশের গতি ঠিক করে নিল।

সেন্দুরা মারা যাওয়ার পর ব্রন্সন সাহেব আর তার মেম গোলাপীর খবরাখবর নিতে শুরু করলেন। নিজের বলতে গোলাপীর আপনজন বিশেষ ছিল না। বা থাকলেও তারা তার সংসারের বোঝা নিতে এগিয়ে এল না। ব্রন্সন সাহেবই তাকে যে কোন প্রকারে পেটভাতায় থাকবার জন্যে মিশনস্কুলের চৌকিদারনীর কাজ দিলেন। খ্রিস্টানপট্টিতে থাকবার জন্যে ছোট্ট একটা ঘর তৈরি করে দিলেন। ব্রন্সন সাহেবের মেম নিজের ঘরে দুজন বয়স্ক মানুষকে লেখাপড়া শেখাচ্ছিলেন। গোলাপীকে তিনি

তাদের সঙ্গে পড়াতে লাগলেন। গোলাপীর বুদ্ধি বেশ প্রখর ছিল। নিজের ইচ্ছের চাইতেও পাদরী সাহেবের - মেমসাহেবকে আনন্দ দেবার জন্যেই খুব কমসময়ের ভেতরে সে চমৎকার অসমীয়া পড়তে লিখতে সক্ষম হল। "বারেমতরা", "ফুলমনি আরু করুনা" ইত্যাদি দু একটি ছোট ছোট বই পড়া হয়ে গেলে পাদরী মেমসাহেব গোলাপীকে "অরুনোদই" এর পুরনো সংখ্যা গুলি পড়তে দিলেন।

খ্রিষ্টান ধর্মে দীক্ষা নিতে গোলাপীর মনে বিশেষ কোনো অন্তর্দ্বন্দ্ব হয়নি। দীক্ষা নেওয়ার আগের থেকেই খ্রিস্টানপট্টির কাছাকাছি লোকজনদের তার নিজের আপনজন বলেই মনে হয়েছিল। কারণ বিপদে আপদে তারাই ছিল তার পথ প্রদর্শক। তারপর ব্রনস্‌ন দম্পতির সংস্পর্শে আসবার পরে গোলাপী প্রথমবাবের জন্যে ধর্ম কি জিনিস সে বিষয়ে কিছু জ্ঞান পেল। তার আগে কিছু না বুঝেই সে পূজো করতে গিয়েছিল অজানা অচেনা দেবতা - অপদেবতাদের কোপদৃষ্টির থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্যে। কিন্তু এখন সে নিজের ভাষাতে ধর্মের কথা পড়তে পারে। নিজের মনের সন্দেহ দূর করবার জন্যে পাদরী সাহেবকে এখন সে প্রশ্ন করতে পারে। এই সব কারণে গোলাপীর ক্ষেত্রে খ্রিস্টান ধর্মে দীক্ষা নেওয়াটাকে এক স্বাভাবিক পরিনতি বলা চলে। দীক্ষা নেওয়ার পরে পরেই তাকে পাদরী মেমেরা গাঁয়ের স্ত্রী লোকদের মাঝখানে ধর্ম প্রচারের কাজে সাহায্য করার জন্যে সঙ্গে নিতে আরম্ভ করলেন। ইতিমধ্যে তারার বয়স পাঁচবছর হল। ওকে ভর্তি করে দেওয়া হল মিশনস্কুলে। গোলাপীর ধর্মীয় কাজকর্মের পরিধি আস্তে আস্তে বাড়তে লাগল।

ছয়

বিল্বকুটীরে প্রত্যেক সন্ধ্যায় এক সঙ্গীত মধুর পরিবেশের সৃষ্টি হয়। অবশ্য এই সঙ্গীতের উৎস কোনো পার্থিব প্রেমের বিরহ যন্ত্রনা নয়। এই সঙ্গীত চিরন্তন ব্রহ্মের উপাসনার জন্যে। রান্নাঘরের কাছে থাকা পুজোর ঘরটির মাটির মেঝেতে গালিচা পেতে বসে গুণাভিরাম ও তাঁর পরিবারের প্রত্যেকের উপাসনা করাটা একটা নিত্যদিনের নিয়ম ছিল। কোনো কারনেই এই নিয়ম ভঙ্গ করতে দেওয়া হয়নি। উপাসনা ঘরটিতে কোনো ধরনের উঁচু কাঠের ঠাকুরের আসন, দেব-দেবীর মূর্ত্তি বা ছবি ছিল না। সম্পূর্ন খালি ঘরটির এককোনে কেবল একটা উঁচু ওককাঠের গাছাতে মাটির প্রদীপ জ্বালিয়ে রাখা হয়েছিল। তার পাশে রাখা একখানি ছোট টেবিলের ওপর গীতা, বাইবেল, উপনিষদ, কীর্তন, ভাগবত, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের রচিত 'ব্রাহ্মধর্ম' ইত্যাদি বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থ সাজিয়ে রাখা হয়েছিল। উপাসনার নেতৃত্ব দিতেন গুণাভিরাম নিজে। প্রথমে মনে মনে গায়ত্রী মন্ত্র জপ করে নিয়ে তিনি গম্ভীর

কণ্ঠে বেদ উপনিষদের শ্লোকগুলি গাইতেন। এর মধ্যে সবসময় গাওয়া শ্লোকটি ছিল ''অসতো মা সদ্‌গময়, তমসো মা জ্যোতির্গময়।'' স্বর্নলতা আর বিষ্ণুপ্রিয়া ও কিছু কিছু শ্লোক সঙ্গে সঙ্গে গাইতেন সংস্কৃত শ্লোকের পরে কখনো কখনো গুণাভিরাম খ্রিস্টানদের ''লর্ডস প্রেয়ার'' — গেয়ে তার অর্থ অসমীয়াতে অনুবাদ করে সকলকে বুঝিয়ে দিতেন। তারপরে গুনাভিরাম আর বিষ্ণুপ্রিয়া একসঙ্গে শ্রীমন্ত শংকর বা মাধবদেবের একটি বরগীত গাইতেন। ''পায়ে পরি হরি'' গাইবার সময় প্রায়ই বিষ্ণুপ্রিয়ার দুগালের ওপর দিয়ে চোখের জল বয়ে যেত। স্বর্ণলতা তখন বুঝতে পারেনি যে মা কেন গান গাওয়ার সময় তেমন করে কাঁদতেন। বহুদিন পরে নিজের জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে স্বর্ণলতা বুঝেছিল যে মায়ের অন্তরের গভীরে আঘাত আর সামাজিক লাঞ্ছনার যে ক্ষত ছিল সেই ক্ষত স্থান নিঙড়েই চোখের জল পড়ত। সেই চোখের জলে দুর্বলতার চিহ্ন ছিল না। ছিল দৃঢ় মনোবল আর আত্মবিশ্বাসে ভগবানের চরনে নিজেকে সপে দেওয়ার আনন্দের প্রকাশ। স্বর্ণলতা তন্ময় হয়ে মা-বাবার যুগলকণ্ঠের গানগুলি শুনত আর যখন বাবাকে 'ব্রহ্ম কৃপাহি কেবলম' বলে উপাসনা সমাপ্ত করতে দেখত তারপরও বহুক্ষন ধরে তার মনটা যেন আলাদা একটা আধ্যাত্মিক জগতের মধ্যে ভেসে বেড়াত।

সন্ধ্যের উপাসনার পরে ঘরটিতে এক শান্ত পরিবেশ বিরাজ করে। বিষ্ণুপ্রিয়া দুবছরের শিশুপুত্র করুনার পরিচর্যা শেষ করে পেছনের চওড়া বারান্দার এককোনে পত্রিকা বা বই পড়েন। গুণাভিরাম বরুয়া নিজের পড়ার ঘরটিতে কাজ করেন। স্বর্ণলতা ও এই সময়ে পঞ্চানন শর্মার কাছে পড়ে। সে অতি অল্পদিনের মধ্যে বর্ণমালা পড়ে শেষ করে এখন বাবার শিব সাগরের অরুণোদয় প্রেসের থেকে আনানো 'বারে মতরা' আর অংকের বইদুটি পড়তে শুরু করেছে। পড়াশুনাতে অন্য ছেলেরা এইটুকু শিখতে যে সময় নেয়, তারপ্রায় অর্ধেক সময়ে স্বর্ণ ততখনি আয়ত্ত করে ফেলেছে। এই ছোট্ট মেয়েটির পড়াশুনোর প্রতি আগ্রহ দেখে পঞ্চানন শর্মা আশ্চর্য হন। মেয়েদের বুদ্ধি ছেলেদের থেকেও কম বলে এতদিন ধরে বিশ্বাস করা লোকটি এখন নিজের ধারনা পরিবর্ত্তন করতে বাধ্য হয়েছেন। স্বর্ণকে পড়াবার পর থেকে শর্মার মনে আর একটি চিন্তার উদয় হতে সুরু করেছে। তাঁর নিজের মেয়ে লক্ষ্মীপ্রিয়াকে কোনদিন তিনি একটা অক্ষরও শেখাননি, অথচ ছেলেদুটিকে মারধর করে হলেও প্রত্যেকদিন সকাল সন্ধ্যে পড়তে বসান। একদিনের জন্যেও তিনি তাদের স্কুল বন্ধ করতে দেন না। ছেলেদুটিকে এন্ট্রান্স পরীক্ষা পাশ করিয়ে সরকারী চাকরীতে ঢুকিয়ে দেওয়াটাই পঞ্চানন শর্মার একমাত্র আকাঙ্ক্ষা। কিন্তু মেয়েদুটিকে যত তাড়াতাড়ি পারা যায় ভালো বর দেখে বিয়ে দেবার বাইরে তিনি আর অন্য চিন্তা করেন না। মেয়ের জন্যে শর্মার অন্তরে যথেষ্ট স্নেহও আছে। কিন্তু বিদ্যাশিক্ষা থেকে বঞ্চিত করে তার প্রতি কিছু একটা বিশেষ অন্যায় আচরণ করা

হয়েছে বলে এতদিন তিনি একবারও ভাবেন নি। এখন ধীরে ধীরে তাঁর ধারণার কিছুটা পরিবর্তন হয়েছে। যদি স্বর্ণলতার সঙ্গে লক্ষ্মীকে মাঝে-মাঝে পড়াতে বসাতে পারেন তাহলে বিয়ে দেবার আগে তার প্রতি তাঁর কর্তব্য সম্পূর্ণ হবে। এই কথা ভেবে সেদিনই স্বর্ণর পড়া শেষ হওয়ার পরে তিনি বিষ্ণুপ্রিয়াকে বললেন, " বৌমা কালকের থেকে আমার লক্ষ্মীকে ও কিছুদিনের জন্যে স্বর্ণর সঙ্গে পড়তে বসাব বলে ভেবেছি। মেয়ে তো, কয়দিনই বা ঘরে থাকবে? বর্ণপরিচয়টা শিখিয়ে দিলে ভবিষ্যতে হয়তো কাজে আসবে।"

বিষ্ণুপ্রিয়ার মুখে আনন্দের হাসি ছড়িয়ে পড়ল। সমবয়স্কের ভদ্রঘরের মেয়ে একটির সঙ্গেঁ স্বর্ণর পরিচয় হোক, এটা তিনিও চাইছিলেন। এতদিন শুধু ব্রাহ্ম পরিবারের ছেলেমেয়েদের সঙ্গেঁই স্বর্ণর পরিচয় হয়েছে আর তারা বেশীর ভাগই বাঙালি। অসমীয়া পরিবার গুলির সঙ্গেঁ বরুয়াদের বিশেষ আসাযাওয়া নেই। ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করার জন্যে উচ্চবর্নের অসমীয়ারা তাদের "ম্লেচ্ছ" বলে ভাবেন। তারপরে আবার বিষ্ণুপ্রিয়া বামুনের বিধবা হয়ে দ্বিতীয়বার বিয়ে করেছেন। এরকম কাউকে সমাজ কেমনকরে স্বীকৃতি দেবে? ফলে লোকের সামনে সকলে বড়ুয়া পত্নীকে সন্মান করলেও নিজের ছেলেমেয়েদের ব্রাহ্মন - কায়স্থ সকলেই পারতপক্ষে 'বিল্বকুটীর' থেকে দূরে সরিয়েই রাখে। বিষ্ণুপ্রিয়া এইসব কথা ভালোকরে উপলব্ধি করতে পারেন। নিজের থেকেও মেয়ের নিঃসঙ্গঁতাই তাঁকে বেশী কষ্ট দেয়। আর সেই জন্যই পঞ্চানন শর্মার প্রস্তাব শুনে তিনি ভীষণ খুশি হয়ে আনন্দের সঙ্গেঁ নতুন ব্যবস্থাতে সন্মতি জানালেন।

সাত

লক্ষ্মীকে পড়ানোর কথাটা বিষ্ণুপ্রিয়াকে বলার আগে পঞ্চানন শর্মা তাঁর বাড়িতে একবারও বলেন নি। বিল্বকুটীর থেকে ফিরে তিনি গম্ভীর সুরে লক্ষ্মীকে আদেশ দিলেন "কাল থেকে ভোরবেলা তুই আমার সঙ্গে যাবি। স্বর্ণর সঙ্গে একত্রে দুজনে লেখাপড়া শিখবি।"

লক্ষ্মী আনন্দে উদ্বেল হয়ে দৌড়ে এসে সকলকে কথাটা জানানোর সঙ্গে সঙ্গে ঘরখানিতে ছোটখাট একটা ঝড়ের সৃষ্টি হ'ল। পঞ্চানন শর্মার সিদ্ধান্তকে সমর্থন করবে এমন মানুষ বাড়িতে একজন ও ছিল না। লক্ষ্মীর ঠাকুমা, বিধবা পিসী, কাকীমা, মা — এই সব মহিলারা সকলেই শর্মার এই অসম্ভব সংকল্পকে সমালোচনা করতে লাগলেন। তাঁদের মতে বামুনের মেয়েদের লেখাপড়া করতে নেই। তারওপর হাকিমের অশুচি বাড়ীতে মেয়েকে পাঠানো হচ্ছে বলে লোকে জানলে কোনো ভদ্রমানুষের ঘরে তাকে বিয়ে

দেওয়া যাবে না। শর্মার ভাই দুজন অল্পসল্প লেখাপড়া জানা লোক, তবুও তাঁদের মতের সঙ্গেঁ মহিলামহলের মতের বিশেষ পার্থক্য দেখা গেল না। ভোলানাথ নামের বড়ো ভাই শাস্ত্রের বচন শুনিয়ে দাদাকে বোঝাতে আরম্ভ করল যে স্ত্রী শিক্ষার প্রকৃত অর্থ হ'ল সাংসারিক কাজকর্ম স্ত্রীলোকদের ভালো ভাবে করতে জানতে হবে, আর সবসময় গৃহস্থের সুখ, শান্তি আর তৃপ্তির জন্যে চেষ্টা করতে হবে। লেখাপড়া জানা স্ত্রীলোক অসৎ স্বভাবের হয়। তারা অবসর সময় খারাপ বই পড়ে সময় নষ্ট করে। এধরনের বহু যুক্তি ভোলানাথ দাদার সামনে তুলে ধরলেন। কিন্তু চারদিক থেকে ওজর আপত্তি যতই বাড়তে থাকল, পঞ্চানন শর্মার জেদ ততই বেড়ে গেল।

অবশেষে অনেক কান্নাকাটি, গাল - মন্দ, তর্ক - বিতর্কের পরে পঞ্চাননের কথাই টিকলো। তিনি নির্দেশ দিলেন, লক্ষ্মী রোজ সকালবেলা তাঁর সঙ্গে হাকিমের বাড়ি যাবে। কিন্তু পড়াশুনো করবার সময় সে সঙ্গে নিয়ে যাওয়া নিজের আসনে বসবে। কখনোই হাকিমের ঘরে কোন খাবার জিনিষ মুখে তুলবে না। ফিরে এসে সে বাইরে স্নান করে তবে ঘরে ঢুকবে। কেবলমাত্র ঘরের শান্তির জন্যেই যে শর্মা এতগুলি সর্ত মেনে নিয়েছিলেন তা সত্যি নয়। আসলে নিজের ক্ষেত্রে যে সমস্ত নিয়ম তিনি এত কঠোর ভাবে প্রযোজ্য বলে ভাবেন নি, মেয়ের ক্ষেত্রে সেগুলিকেই প্রয়োজনীয় বলে ধরে নিয়েছিলেন। পুরুষ মানুষদের বাইরে ঘোরাঘুরি করে কাজ কর্ম করতে হয়। ফলে তাদের পক্ষে সব সামাজিক নিয়মকানুন মেনে চলা সম্ভব নয়। কিন্তু মেয়েছেলেরা নিয়ম কানুন মেনে চললেই সমাজ সুষ্ঠু ভাবে চলতে থাকে — শর্মার এই ধারণা ছিল।

প্রথম দিন থেকেই স্বর্ণ আর লক্ষ্মীর মাঝখানে এক স্বাভাবিক বন্ধুত্ব গড়ে উঠেছিল। স্বর্ণ ছিল লাজুক স্বভাবের তাই নতুন লোককে সহজে আপন করে নেওয়া তারপক্ষে অসম্ভব ছিল। কিন্তু লক্ষ্মী ছিল ঠিক তার বিপরীত। ছোটবেলার থেকেই ঘরের বড় মেয়ে হিসেবে সে বড়দের জগতে একছোট আকারের পাকা গৃহিনীর মতই বিচরণ করছিল। ছোট ছোট ভাই বোনদের গান গেয়ে শোয়ানোতে বা চটকে চটকে ভাত খাওয়ানোতে তার চেহারাতে মাতৃত্বের রূপ ফুটে উঠেছিল। রান্নাঘরে শাক সবজী কুটে দেওয়াতে বা বাবাকে ঠাকুর ঘরের সরঞ্জাম সাজিয়ে দেওয়াতে তাকে দেখাতো এক সুনিপুন গৃহিনীর মতো। মোট কথা লক্ষ্মী যেন একজন গৃহিনী বা মা হয়েই জন্মেছিল। শিশুসুলভ কথাবার্তা খেলাধুলো এসব লক্ষ্মীর জগতের বাইরে ছিল।

স্বর্ণকে দেখবার পরে লক্ষ্মী নিজেকে স্বর্ণর দিদি বলে ভেবে নিল। হাকিমের মেয়ে হিসেবে বা পড়া শুনোতে এগিয়ে থাকার সুবাদে স্বর্ণরই কর্তৃত্বের ভাবটা বেশি হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু লক্ষ্মীর ব্যবহার এটা সুনিশ্চিত করে দিল যে দুজনের মধ্যে সেইই বয়স এবং অভিজ্ঞতায় সবদিক থেকে বড়ো। পড়া শেষ হওয়ার পরে দুজনে যখন বেলগাছ তলার পরিষ্কার খোলামেলা জায়গাটিতে যায়, তখন লক্ষ্মীর মুখ দিয়ে খই ফোটার মত করে বলা কথাগুলি শুনে শুনে স্বর্ণ অবাক হয়ে যায়। প্রথমদিনই লক্ষ্মীর তীক্ষ্ন দৃষ্টিতে

স্বর্ণর রান্নাবাটির ছোট ছোট সরঞ্জাম গুলির খুঁতগুলো ধরা পড়ে। স্বর্ণর সাজানো উনুনগুলি দেখে লক্ষ্মী মুখে ঢাকা দিয়ে বিজ্ঞের মতো হাসল —

"এ রামো! এই উণুনে আগুন জ্বালা-লে ভাত কখন হবে? দেখ, আমি সাজিয়ে দিচ্ছি দাও," বলে তার ছোট - ছোট নিপুণ আঙ্গুলে মুহূর্তের ভেতরে সুন্দর উণুন একটা বানিয়ে দিল। তারপরে রান্না করার বাসনগুলি একদিকে পরিপাটি করে সাজাল।

"ভাতের বাসন আর চায়ের বাসন একাকার করবে না। এইদিকে ভাতের বাসন, এইদিকে চায়ের, বুঝলে?" অনর্গল কথা বলে বলে সে স্বর্ণর ছোট খেলার রান্নাঘরটি পরিপাটিকরে সাজিয়ে ফেলল। তাকে দেখতে দেখতে স্বর্ণর এরকম মনে হচ্ছিল যেন সত্যিসত্যি রান্নাঘরে সুগৃহিনী একজন ব্যস্ত হয়ে কাজ করছে। স্বর্ণর কাছে যেগুলি ছিল খেলা, লক্ষীর কাছে সেইগুলিই যেন দৈনন্দিন জীবনের কাজ।

একদিন রান্নাবান্না খেলা একঘেয়ে লাগাতে লক্ষ্মী পূজা পূজা খেলার প্রস্তাব দিল। নতুন খেলার নাম শুনে স্বর্ণ খুব আগ্রহে লক্ষ্মীর নির্দেশমতো দৌড়াদৌড়ি করে জিনিসের যোগান দিতে ব্যস্ত হল। লক্ষী মাটির ঢেলাতে ফুল-পাতা গুঁজে 'দেবীমূর্তি' বানাল। তারপরে শিউলি ফুলে সাজিয়ে দিল পূজার বেদীটা।

" এই খানটায় পুরোহিত বসবে বুঝলে? আর এই খানে বলি দেবে," বলে হাড়িকাঠ বসিয়ে দিল।

"বলি কেমন করে দেয়?" — বিস্ময় ভরে জিজ্ঞেস করে স্বর্ণ।

" পাঁঠাকে ঘ্যাচ্ করে এক কোপে কাটতে হবে," লক্ষ্মী নিজের ডান হাতিটি তুলে দা দিয়ে ঘা মারার অভিনয় করল। স্বর্ণের মুখে ফুটে উঠল ভয় আর বিতৃষ্ণার ভাব। অবিশ্বাসের সুরে সে জিজ্ঞেস করে। "পাঁঠাটি তো তাহলে মরে যাবে।" লক্ষ্মী খিলখিল করে হেসে উঠলে,

" বলি দিলে তো মরবেই ! কি যে বোকা মেয়ে!"

স্বর্ণ সঙ্গে সঙ্গে গম্ভীর হয়ে যায়। — "আমি তাহলে পুজো পুজো খেলব না। বলি আমার ভালো লাগে না।" "শীরিবিষ্টু! বলি দেখতে খারাপ লাগে বলতে নেই ভাই। দেবীমার শাপ লাগবে।" লক্ষ্মী বিজ্ঞের মত বলল।

স্বর্ণের মুখখানি ভয়ে বিবর্ন হয়ে গেল। আর কোন প্রতিবাদ না করেই সে লক্ষ্মীর নির্দেশ মতো কাজ গুলি করতে লাগল। কিন্তু সেই দিনের খেলা থেকে এককোটা আনন্দও পেল না স্বর্ণ। বেলগাছের তলার জায়গাটি যেন হঠাৎ এক অজানা ভয়ের কেন্দ্র হয়ে দাঁড়ালো — সেই আদিম মানুষের ভয়! এমনি সময়ে পঞ্চানন শর্মা যাওয়ার উপক্রম করতেই খেলার ইতি পড়ল। পরের দিন ভোরবেলা 'আপী' খেলার জায়গাটি ভালো করে মুছে সাফ না করে ফেলা পর্যন্ত আর একবারও বেলগাছ তলায় যাওয়ার সাহস পেল না স্বর্ণ।

আট

মাইলস্ ব্রন্‌সন্ সাহেব উত্তর আসামে ধর্মপ্রচারে বিশেষ সুবিধে করতে না পেরে যখন নিজের কর্মক্ষেত্র নগাঁওতে তুলে আনলেন,তখন থেকেই সেখানে ব্যাপ্‌টিস্ট মিশনারীদের সমাগম বাড়তে লাগল। ধর্ম প্রচারের কাজে ও ক্রমে ক্রমে উৎসাহ উদ্দিপনা বৃদ্ধি পেল। নগাঁওতে ব্রন্‌সন্ নিজে নেতৃত্ব নিয়ে ধর্মপ্রচার আর শিক্ষার বিস্তার দুটি কাজ একসঙ্গে চালাতে থাকলেন। সুদূর আমেরিকার থেকে আসা এই পাদ্‌রীদের মধ্যে নারী-পুরুষ সকলেই সমানভাবে ধর্মের কাজে নিঃস্বার্থভাবে আত্মোৎসর্গ করেছিলেন। সেইসময় তাঁদের গভীর বিশ্বাস ছিল যে উচ্চশিক্ষা পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আসামের লোকেরা খ্রিস্টানধর্মের মহানবাণীর প্রতি আপনা - আপনি আকৃষ্ট হ'বে। এই আশাতেই তাঁরা সব বাধা-বিপত্তি গ্রাহ্য না করে নিজের কাজ একান্তমনে করে গিয়েছিলেন। গ্রীষ্মে যখন গরম থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্যে সমতলে থাকা শাসক ইংরেজদের মেমেরা শিলং, দার্জিলিং বা সিমলাতে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছিলেন, তখন নগাঁওতে ভর দুপুরে রোদে মিসেস্ ব্রন্‌সন্, মিস্ অরেল কীলার ইত্যাদি পাদ্‌রী মেমেরা ঘরে ঘরে গিয়ে স্ত্রীলোকদের মধ্যে ধর্মপ্রচারের কাজ করেছিলেন। এই কাজকে তাঁরা সোজাসুজি জেনানার কাজ বলে অভিহিত করতেন। ধর্মের কথা বল'লে মানুষের সাহায্য পাওয়া যাবে না বলে অতীতের অভিজ্ঞতা থেকে এটুকু বুঝতে পেরে তাঁরা প্রথমে উল, সেলাই বা সেই সংক্রান্ত কিছু কাজ শেখাতে যেতেন। তারপরে আস্তে আস্তে ধর্মের কথা প্রকাশ করতেন। কিন্তু এত সাবধানে এগিয়ে যাওয়া সত্ত্বেও বেশির ভাগ হিন্দুর ঘরে পাদ্‌রী মেমেদের বিমুখ হতে হয়েছিল। কখনো বা কোনো একজনের ঘরে ''গৃহস্থ মানা করেছে'' বলে তাঁদের উঠোনে পা দেওয়া মাত্রই বিদায় দেওয়া হত। কখনো বা বসার ঘরে বসতে দেওয়ার পরে ঘরের গৃহিনী বেরিয়ে এসে তাঁদের বলতেন '' তোমাদের ধর্ম তোমাদের জন্যে ভাল। আমার জন্যে আমার ধর্মই ভালো। তোমাদের ধর্মের কথাগুলি আমার মাথাতে ঢোকে না। আমাকে সেইসব ধর্মের কথা বলে তোমরা অনর্থক সময়ই নষ্ট করবে।''

এরকম কঠোর কথা শুনেও অবশ্য পাদরীরা হতাশ হননি। তাঁদের অটল বিশ্বাস ছিল যে ভালো কথাতে একদিন না একদিন এ দুর্ভেদ্য প্রাচীর ভাঙা সম্ভব হবে।

''বিল্বকুটীরের দুয়ার কিন্তু পাদ্‌রীদের জন্যে সবসময় খোলা ছিল। গুণাভিরাম বরুয়া আর বিষ্ণুপ্রিয়া দুজনে ব্রন্‌সন্ আর অন্য ব্যাপটিস্টদের খুব আদর - আপ্যায়ন করতেন। অসমীয়া ভাষা শিক্ষার প্রতি পাদ্‌রীদের আগ্রহ এবং নিষ্ঠা দেখে তাঁরা অভিভূত হতেন। খ্রিস্টান ধর্মের প্রতি ও তাঁদের মনে অণুমাত্র বিদ্বেষভাব ছিল না। ব্রাহ্মধর্মের প্রবর্ত্তক রাজা রামমোহন রায়ও সকল ধর্মের সমন্বয় আর একেশ্বরবাদেই বিশ্বাস করেছিলেন। তিনি যিশুর বাণীসমূহ আধুনিক যুগের জন্য পরম মহত্ত্বপূর্ণ বলেও লিখেছিলেন। ফলে উদারপন্থী ব্রাহ্মদের জন্যে কোনো ধরণের ধর্মীয় গোড়ামিই গ্রহণযোগ্য ছিল না। পাদ্‌রী মহিলারা

কখনো কখনো দুপুরে বিষ্ণুপ্রিয়ার কাছে এলে তিনি নিঃসংকোচে তাঁদের সঙ্গেঁ ধর্মের বিষয়ে কথাবার্তা বলতেন আর তাঁদের দেওয়া নীতিকথা আর ধর্মের বইগুলিও পড়তেন।

গোলাপী ও কখনো কখনো একলা আর কখনো বা পাদ্রী মেমদের সঙ্গে বিল্বকুটীরে আসে। বিষ্ণুপ্রিয়াই তাঁদের থেকে সেলাইয়ের কাজ, উলের কাজ ইত্যাদি শেখেন আর স্বর্ণকে ও শেখান। গীর্জাতে তারার সঙ্গে স্বর্ণর পরিচয় হওয়া থেকে গোলাপী ও মাঝে মাঝে তারাকে সঙ্গেঁ নিয়ে আসে। তারাকে স্বর্ণ খুবই সন্মানের চোখে দেখে। তার চোখে, গান গাওয়া, সোলাই করা, পড়াশুনো করা, সব দিক থেকেই তারার সঙ্গে কেউ পেরে উঠবে না। তারা এলে স্বর্ণ তার সঙ্গে খুব কথা বলে। তারার স্কুলজীবনের অভিজ্ঞতার বিষয়ে স্বর্ণর সব থেকে বেশী কৌতূহল। তারার মুখে " মেমেদের ইস্কুলের" কথা শুণে শুণে স্বর্ণর সেরকম একটা স্কুলে পড়তে খুব ইচ্ছে হয়। নিজের ঘরের এককোণে লক্ষ্মীর সঙ্গে নামতা মুখস্থ আওড়ানো থেকে একই বয়সের অনেক মেয়ের সঙ্গে বসে পড়তে নিশ্চয়ই বেশী ভালো লাগবে বলে স্বর্ণর মনে হয়। স্বর্ণকে একান্ত বাধ্য শ্রোতা পেয়ে তারা প্রায়ই তার সামনে নিজের কল্পনার জগৎটা বাস্তবে রূপান্তরিত করতে চেষ্টা করে। আপন মনে সে বলে যায় — মিস্ - কিলার হয়তো আমেরিকা যাওয়ার সময় তাকে সঙ্গে নিয়ে যাবে। সাগরের বুকে জাহাজে উঠে সে দেশ বিদেশ ঘুরে বেড়াবে।

"আমেরিকা কত দূর"? স্বর্ণ বিস্ময়ে জিজ্ঞেস করে।

তারা পা দিয়ে মাটিতে টোকা মেরে গম্ভীর সুরে বলে, "এই পৃথিবীর এই দিকে এখানে যখন রাত হয়, সেখানে দিন হয়। সেখানকার সব ব্যাপার এখানকার উল্টো। আমরা যখন শুয়ে থাকি, সেখানে মানুষেরা তখন ঘোরাফেরা করে। সেখানকার লোকজন সবই সাহেব - মেম। আমাদের মত মানুষ নেইই"। অবিশ্বাসের সুরে স্বর্ণ বলে ওঠে ঃ

"তোমাকে সেসব কথা কে বল'ল"?

"কেন, আমাদের কাছের বগীদিদির বাবা ধনীরাম ব্রন্‌সন্ সাহেবের সঙ্গে আমেরিকা গিয়েছিল না? বগীদিদি আমাকে সব কথা বলেছে। তাদের ঘরে আমেরিকা থেকে আনা কত সুন্দর - সুন্দর জিনিষ আছে"।

"তুমি একলা আমেরিকা যেতে পারবে তো, ভয় লাগবে না"? স্বর্ণ জিজ্ঞেস করে।

"কিসের ভয়"? তারা বীরত্বের সুরে বলে। "আমার সঙ্গে পাদবী মেমসাহেবরাও তো যাবে। তাঁদের সাগরের ঢেউরাও ভক্তি করে। তারা যীশু ভগবানের নাম নিলে কারও কোনো বিপদ হয় না"।

"খ্রিস্টান মানুষকে জল কিছু করতে পারে না নাকি"?

"পারে না। যিশু জলের ওপর দিয়ে হেঁটে গিয়েছিলেন। সেইজন্যে খ্রিস্টানরা জলে পড়ে গেলে নাকি যিশু তুলে আনেন"। তারার কথা গুলিতে অটল বিশ্বাসের সুর ফুটে ওঠে। ধর্মের বিষয়ে মা বা অন্যের কাছ থেকে শোণা কথার সঙ্গে নিজের কল্পনার কিছু রং মিশিয়ে সে আনন্দ পায়। তার বিশ্বাস করা কথাগুলির প্রতি স্বর্ণর মনে প্রত্যয়ের জন্ম

হোক্ - এই তার বড় ইচ্ছে। সেইজন্যে সে প্রবল উৎসাহে যিশুর লীলার কথা নিজের কল্পনায় কিছুটা অতিরঞ্জিত করে স্বর্ণর সামনে বলে যায়। স্বর্ণ মুগ্ধ হয়ে সেইসব শোনে। মাঝে মাঝে কিছু একটা প্রশ্ন করলে তারা দক্ষ ধর্মপ্রচারকের ভঙ্গীতে চট করে উত্তর একটা দিয়ে দেয়।

নয়

হাকিম গুণাভিরাম বরুয়া প্রায়ই মফঃস্বলে যান। তখন আসামে রেলপথ তৈরি হয়নি। বর্ষার দিনে নৌকো আর শীতকালে গোরুর গাড়ী বা ঘোড়ার গাড়ী ছাড়া বাইরে যাতায়াতের অন্য উপায় ছিল না। সরকারী অফিসাররা অবশ্য ঘোড়া বা হাতিতে ও মফঃস্বলে যেতেন। নগাঁওর থেকে তখন গুয়াহাটী যাওয়ার জন্যে রহা পর্যন্ত তেরমাইল রাস্তা স্থলপথে আসার পরে কলং নদী পার হতে হত। তখন রহাতে কলঙের ওপরে সেতু ছিল না। নৌকোতে নদী পার হয়ে আরও দশমাইল গিয়ে ডিমাল নদী পার হতে হয়। তারপরে কপিলি, কিলিং, এম্নি আরও ছোটখাট বহু নদী পার হতে হয়। প্রবল বর্ষায় নদীগুলির দুইপাড় ডুবে গিয়ে আলপথের চিহ্নও অদৃশ্য হয়ে যায়। ফলে ওই সময়ে মফঃস্বলে যেতে হলে নৌকেতে যাওয়া বই অন্য উপায় থাকে না। গোটা রাস্তা নৌকোতে গেলে সময় অনেক লাগে এ সত্যি। কিন্তু আলপথে যাওয়ার থেকে বেশি স্বচ্ছন্দে যেতে পারা যায়; অর্থাৎ এবড়োখেবড়ো রাস্তার ধাক্কা, কখনো বা কাদাতে গাড়ির চাকা বসে যাওয়া, ঘোড়ার পা পিছলানো, এসবের উপরে ও যথা সময়ে ডাকবাংলো গিয়ে না পৌঁছোলে দুর্গমস্থানে রাত্রে বসবাসের ভয় থাকেই। তার তুলনায় নৌকোতে গেলে মশার কামড় আর শীতকালে কখনো কখনো বা বালিতে নৌকো ঢেকে যাওয়ার বাইরে বিশেষ ভয় থাকে না। অবশ্য দুর্ঘটনার ভয়টা থাকেই। তার জন্যে প্রত্যেক যাত্রীকেই মানসিক ভাবে সবসময় প্রস্তুত থাকতে হয়। তবে সাধারণতঃ মাঝিরা নিজেদের কাজে এত বেশি ওস্তাদ যে সুরক্ষার বিষয়টা তাদের ওপরে নিশ্চিন্তে ছেড়ে দেওয়া যায়। খেল নৌকোর ছৈ এর ভেতরে বা বড় মার নৌকোর ছাউনির ভেতরে যাত্রীরা বেশ শুয়ে বসে যেতে পারে, কষ্টটাও কম হয়।

এসব কথা ভেবেই গুণাভিরাম সেই বছর নৌকোতে মফঃস্বলে যাওয়ার সময় বিষ্ণুপ্রিয়া, স্বর্ণ আর করুণাকে সঙ্গে করে নিয়ে যাওয়ার কথা ভাবলেন। বিয়ের পরে নগাঁওতে আসবার পর থেকে বিষ্ণুপ্রিয়া কোথাও যাননি। একবার বেড়িয়ে এলে তাঁর মনটা ভালো লাগবে ভেবে গুণাভিরাম ভেলেউগুরীর কাছে এক চা - বাগানের কৈলাশ নাথ রায় নামের বাঙালী বন্ধুর বাড়িতে যাবেন বলে ঠিক করলেন। রায় বাবু বাগানের ম্যানেজার। তার পত্নী কলকাতায় এক ব্রাহ্মন পরিবারের মেয়ে। তিনি নিজেও ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করেছেন। বিষ্ণুপ্রিয়াকে মহিলাটি খুব আদর - আপ্যায়ণ করেন আর বিষ্ণুপ্রিয়াও তাঁকে আপনার বলে

ভাবেন। নগাঁওতে এলে তারা প্রায়ই 'বিশ্বকুটীরে' অতিথি হয়ে থাকেন। তাঁরা অনেকদিন ধরেই বরুয়া পরিবারটিকে দুদিনের জন্যে হলেও বাগানে বেড়িয়ে যেতে অনুরোধ করছিলেন। ফলে গুণাভিরাম সপরিবারে যমুনামুখ পর্যন্ত যাবেন ঠিক করলেন। রহা, যমুনামুখ ইত্যাদি জায়গাতে নিজের সরকারী কাজ শেষ করে ভেলেউগুরী অব্দি যাবেন ঘোড়ার গাড়ীতে। ওখানে দিনদুই থেকে আসবেন ঠিক করা হ'ল।

নৌকোযাত্রার কথা ঠিক হওয়ার পর থেকেই স্বর্ণর মন আনন্দে নেচে উঠেছে। নগাঁওর থেকে দূরে কোথাও বেড়াতে যাওয়ার কথা তার মনে পড়ে না। আসামের এখান ওখান থেকে তাদের বাড়িতে প্রায়ই এসে থাকা অতিথিদের মুখে সে অবশ্য অনেক আশ্চর্য অদ্ভুত যাত্রা কাহিনী শুনেছে। তখনকার দিনে জোরহাট থেকে নগাঁওতে আসা লোকের মুখে কত লোমহর্ষক কাহিনী শুনতে পাওয়া যেত। লমবর জঙ্গলের মাঝখান দিয়ে আসবার সময় ভয়ঙ্কর বন্যজীবজন্তু আর ডাকিনী-যোগিনী, দেবতা-অপদেবতা সব যেন পথিককে ভয় দেখানোর জন্য সবসময় ওঁৎ পেতে থাকে। নৌকো যাত্রার গল্পও স্বর্ণ অনেক শুনেছে। বাবাও তাকে কলকাতা থেকে গুয়াহাটীতে নৌকোতে আসবার রাস্তায় কি কি দেখতে পান সেইসবের সুন্দর বিবরণ দিয়েছেন। ফলে নগাঁওতে 'বিশ্বকুটীরে' থেকেও স্বর্ণ কল্পনায় জগতের বহু জায়গা ভ্রমণ করেছে।

নৌকোযাত্রার কথাটি শোনার পর থেকেই স্বর্ণ তারা আর লক্ষ্মীকে খবরটা দেওয়ার জন্যে অস্থির হয়ে উঠছে। লক্ষ্মী কিন্তু সব শুনে বিশেষ উৎসাহ দেখাল না। অভিজ্ঞ ব্যক্তির মতো সে জানালো, অশোকাষ্টমীতে স্নান করবার জন্যে সে বেশ কয়েকবারই বাড়ির সবার সঙ্গে নৌকোয় করে কলঙের পূবদিকে আড়িকাটি মুখ পর্যন্ত গেছে। নৌকোযাত্রা তার একটুও ভালো লাগে না। নৌকোর চেয়ে গোরুর গাড়িতেই যাওয়াটা বেশি সুবিধের। ছৈ-এর ভিতরে বসে কত সুন্দর সুন্দর দৃশ্য দেখতে পাওয়া যায়। নৌকোতে করে গেলে দিনের রোদ আর রাতের মশার কামড়ে প্রাণ যায় যায়। লক্ষ্মীর এসব কথা স্বর্ণকে কিছুক্ষণের জন্যে চিন্তিত করলেও তার উৎসাহ একটুও দমাতে পারল না। তারাকেও কথাগুলি বলবার জন্যে সে খুব আশায় পথ চেয়ে ছিল। সমুদ্রযাত্রা না হলেও অন্ততঃ নৌকোযাত্রা তারার থেকে আগে করতে পারবে – এটুকু ভেবে ভেবে সে যেন একটু তৃপ্তি পেল। কিন্তু যাওয়ার আগে একবারও তারার দেখা পেল না। বাড়ির সামনে দিয়ে যাওয়ার সময় মিশন স্কুলের একটি মেয়েকে জিজ্ঞেস করে জানল তারা 'ক্যাম্পে' গেছে। 'ক্যাম্প' যে কি তা মেয়েটি বুঝিয়ে বলতে পারল না। স্বর্ণ ভাবল যে কোন একটি গাঁয়ের নামই হয়তো বা হ'বে।

যাত্রার দিন হাকিম পরিবার নৌকোতে ওঠার সময় তাদের মাল-পত্র দেখে মনে হচ্ছিল যেন দলটি বহু দূর দেশ ভ্রমণ করতে যাচ্ছে। বিছানা-পত্র, রান্নাবান্নার সরঞ্জাম, খাবার-দাবার ইত্যাদি বহুপরিমাণ সামগ্রী তাঁরা সঙ্গে নিয়ে বেরিয়েছিলেণ। সেই সঙ্গে একটি কাজ করা ছেলে, রাঁধুনী ছেলে একটি আর 'আপী' ও সঙ্গে যাচ্ছিল। বড়-নৌকোর ওপরে খড়

আর বাঁশের সুন্দর ঘর বানিয়ে দেওয়া হয়েছিল। তাতে ছিল বরুয়া পরিবারের থাকা ও শোয়ার ব্যবস্থা। মেঝেতে পেতে দেওয়া হয়েছিল মিহি চাটাই। রাত্রে মশারী খাটানোর জন্যে ঘরের চাল থেকে দড়ি ও ঝোলানো ছিল। মোটকথা এরকম পরিস্থিতিতে যতরকম সুবিধে দেওয়া যায় হাকিমের পরিবারটিকে ততখানি দেওয়ারই ব্যবস্থা করা হয়েছিল। ছোট নৌকোতে যাচ্ছিল কাছারীর একজন কেরানী আর একজন মুহুরি। ওই নৌকোটিরও একটা অংশ ছৈয়ে ঢাকা। তার ভিত রে খড়ের ওপর বিছানা পেড়ে শোয়ার ব্যবস্থা। খাওয়ার সময় দুটি নৌকো একসঙ্গে জুড়ে দেওয়া হত, সকলে বড় নৌকোটিতে খাওয়াদাওয়া করতেন।

নৌকো ছেড়ে দেবার সঙ্গে সঙ্গে স্বর্ণ বাবার কাছে বসে তার মনে দেখা দেওয়া হাজারো প্রশ্নের উত্তর জিজ্ঞেস করতে আরম্ভ করে। গুনাভিরামও ধৈর্যের সঙ্গে সেই গুলির উত্তর দিয়ে যান। জেইল পার হয়ে খনামুখে ঢোকার সময় তিনি মেয়েকে বুঝিয়ে দিলেন কেমন করে আনন্দরাম ঢেকিয়াল ফুকন জেলের কয়েদীদের দিয়ে মাটি কাটিয়ে মরি কলঙের গতি অন্যদিকে বইয়ে দিয়ে দু মাইল রাস্তা কমিয়ে দিলেন। আনন্দরামের কথা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করে মেয়েকে বললেন, ''মানুষের অসাধ্য কিছু নেই, দেখলি। ইচ্ছা আর বুদ্ধিতে মানুষ একটি নদীকেও বশ করতে পারে।''

''সাগরের ঢেউকে ও পারবে?'' স্বর্ণ কি একটা চিন্তা করে জিজ্ঞেস করে। গুনাভিরাম একটু দ্বিধায় পড়লেন। কিন্তু নিজের দেওয়া যুক্তির সমর্থনের জন্য তিনি বললেন, ''আজ পর্যন্ত সেই কাজ কেউই করতে পারেন নি, কিন্তু ভবিষ্যতে কখনো মানুষের জ্ঞান বাড়লে মানুষ পারতে-ওপারে''।

''বাবা, যিশু নাকি জলের ওপর দিয়ে হেঁটে যেতে পেরেছিলেন ''? এইবার স্বর্ণর প্রশ্নের হেতু গুণাভিরাম বুঝতে পারলেন। মুচকি হেসে মেয়ের মাথায় হাত বুলিয়ে বললেন, ''সব ধর্মেই এরকম কিছু অলৌকিক গল্প থাকে। এগুলি সত্যি না মিথ্যে মানুষের নিজের বিচার-বুদ্ধিতে ভেবে দেখতে হবে। সেই জন্যেই মানুষকে লেখাপড়া শিখে জ্ঞান বৃদ্ধি করতে হয়।'' স্বর্ণ বাবার কথাগুলি ভালকরে বুঝতে পারল না। কিন্তু বড় মাপের লোকেরা যে সোজাসুজি উত্তর দেন না, সে কথা সে এতদিনে বুঝতে পেরেছে। ফলে সে আর এই বিষয়ে কিছু জিজ্ঞেস করল না। এর মধ্যে অন্য কোনো দৃশ্যে আকৃষ্ট হয়ে স্বর্ণ এই প্রসঙ্গ ভুলেও গেল।

ভারী বড় নৌকোটি আস্তে আস্তে এগোচ্ছিল। মাঝিরা লম্বা লম্বা বাঁশের লগি এক গলা জলের নীচে ঠেলতে ঠেলতে নৌকোখানি এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল। রহা পার হতেই একদিন লেগে গেল। ফুলগুরী পেতে না পেতেই সন্ধ্যা হল। হঠাৎ নদীতে কিছু ঝিক্‌মিক্ করতে থাকা প্রদীপ ভাসতে দেখতে পাওয়া গেল। প্রথমে সকলে সেইগুলিকে জেলেদের নৌকা বলে ভেবেছিল। কিন্তু কাছাকাছি আসতেই দেখা গে'ল যে সেগুলো আসলে কলাগাছের ভেলা। ছোলাফলমূল আর প্রদীপ জ্বালিয়ে জলে ভাসিয়ে দেওয়া হয়েছে।

সেইগুলির দেখা পাওয়া মাত্র গুণাভিরাম সকলকে সতর্ক করে দিলেন; বললেন কেউ যেন নদীর জল না ফুটিয়ে মুখে না দেয়। কলা গাছের ভেলাগুলি দেখেই তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে কাছাকাছি গ্রামগুলিতে কলেরা হয়েছে। গাঁয়ের মানুষ মহামারী হ'লে এমনি করে অপদেবতাকে পূজো দেয়। স্বর্ণ কথাগুলি শুনে খুব ভয় পেল। নৌকেটির ওপরে ওড়া এক ঝাঁক মশা যাত্রীদের খুব বিরক্ত করছিল। মশার কামড় থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্যে যাত্রীরা খুব তাড়াতাড়ি খাওয়া-দাওয়া সেরে মশারির আশ্রয় নিলেন। প্রথম রাতে রান্না-বান্না করবার প্রয়োজন হ'ল না। সঙ্গে নেওয়া জিনিসগুলি দিয়ে খিদে মেটালেন।

রহার ঘাটে প্রথম রাত নৌকো বাঁধা হল। ঘাটে আরও অনেক নৌকো ছিল। বেশির ভাগই মাড়োয়ারী ব্যবসায়ীর নৌকো। এইসব নৌকোয় নাগাপাহাড়, উত্তর কাছাড় আর অন্যান্য ভিতরের অঞ্চল থেকে তুলো, গালা এসব এনে ব্রক্ষ্মপুত্র দিয়ে গুয়াহাটী নেওয়া হয়। গুয়াহাটীর ব্যাপারীদের নৌকোগুলির কোনোটা কোনোটা রহা থেকে কপিলি দিয়ে ভিতরের নানা জায়াগায় যায়। ফলে রহাতে বহু ব্যাপারীর সমাগম হয়, প্রতি সপ্তাহে একটি বড়ো হাট বসে । হাটে বেচা-কেনার বাইরেও মাঝে-মাঝে গাঁয়ের থেকে আসা পাদ্‌রী মেম-সাহেব সকলে খ্রিস্টানধর্মের অসমীয়ায় লেখা ছোটছোট বই বা যিশুর ছবি বিনামূল্যে বিতরণ করেন।

রহাতে গুণাভিরামের কিছু সরকারী কাজ ছিল। ফলে ঘাটে নৌকো বেধেঁ তাঁরা ডাকবাংলোতে গিয়ে উঠলেন রহাতে কাজকর্ম শেষ করে পরেরদিন সকালে নৌকো কপিলি দিয়ে পূর্বদিকে রওনা হল। কপিলির স্রোত খুব বেশি ফলে নৌকো দুটি যাচ্ছিল খুব ধীরে ধীরে। রহা পার হওয়ার পরে দুদিকের মাঠ ময়দানের সংখ্যা কমতে থাকল। তখন আশ্বিন মাস। বন্যার জল শুকিয়ে যাচ্ছে, যদিও নদীর দুই পারে বহুদূর পর্যন্ত আগাছায় ভরা খালের জল দেখতে পাওয়া যাচ্ছিল। এখানে ওখানে ধানের ক্ষেত। কিন্তু বেশীর ভাগ জায়গাই ভরে আছে আগাছায়, খালের জলে আর বনজঙ্গলে। কিছুদূর পূর্বদিকে যাওয়ার পরে দুই-দিক লম্বা লম্বা নল-খাগড়ায় ভরা একটা অঞ্চলের মাঝখান দিয়ে নৌকো দুটি যেতে আরম্ভ করল। বেশির ভাগ অঞ্চলই জনশূন্য বলে মনে হয়। মাঝে মাঝে কখনো জনবসতির কাছাকাছি হলে পাড়গুলিকে বেশ খোলামেলা পরিষ্কার দেখায়। তখন নৌকো দুটি পাড়ে বাঁধা হয় আর যাত্রীরা সকলে পাড়ে উঠে হাত পা সোজা করে নেয়। কাজের লোকজন তখন গ্রামে গিয়ে কখনো কখনো শাক সবজি, হাঁস পায়রা ইত্যাদি কিনে এনে পারে এসে ভাত রান্না করে। কিন্তু হাকিমের নৌকো পাড়ে লেগেছে বলে জানতে পারলে নিজেরা এসে আগ্রহ করে দৈ, দুধ, ঘি, বাড়ীর লাউবেগুন এসব দিয়ে যায়। গুণাভিরাম অবশ্য দাম না দিয়ে জিনিষ নেন না। গ্রামের লোকেরা কাকুতি মিনতি করলেও তিনি কখনো কখনো কড়াসুরেই তাঁদের সঙ্গে কথা বলে পয়সা নিয়ে যেতে বাধ্য করেন।

গ্রামের ছবি গুলি দেখতে স্বর্ণর খুব ভালো লাগে। নদীতে স্নান করতে আসা মিকির

যুবতীরা নৌকো দুটির দিকে এক দৃষ্টিতে চেয়ে থেকে থেকে হঠাৎ খিল খিল করে হেসে ফেললে স্বর্ণ খুব লজ্জা পায়। কিন্তু যখন মেয়েগুলি তাকে আর ছোট ভাইটিকে হাত - ছানি দিয়ে ডাকে তখন তাদের তার খুব ভালো লাগে। নৌকো ঘাটের থেকে চলে না যাওয়া পর্যন্ত পাড়ের ছেলেমেয়ের দল তাদের দিকে তাকিয়ে থাকে। স্বর্ণের কাছে তারা যেন অন্য এক জগতের প্রাণী। তারা কেমন বাড়ীতে থাকে, কী খায়, স্বর্ণর খুব জানতে ইচ্ছে করে। বাবা তাকে বুঝিয়ে বলেন, '' এরা হচ্ছে মিকির মানুষ। এদেরও এক ধরণের নিজস্ব সভ্যতা আছে। কিন্তু আমাদের লোকেরা এদের সম্পর্কে ভালোকরে কিছু জানে না বলে এদেরকে অসভ্য জাতির বলে ভাবে। ইংরেজরাও প্রথমে আমাদের দেশের লোকদের অসভ্য বর্বর বলে ভেবেছিল। কিন্তু যেসব ইংরেজ আমাদের দেশের সভ্যতার কথা পড়েছেন, শুনেছেন, সেইসব লোকেরা বুঝতে পেরেছেন যে আমাদের সভ্যতা কত পুরনো, কত ঐশ্বর্যপূর্ণ। সেইজন্যে মানুষের যোগ্য শিক্ষার প্রয়োজন। শিক্ষাই আমাদের মনে সব জাতির প্রতি সন্মান জাগাবে।''

''কিন্তু, আমাদের পড়ার বইগুলিতে দেখেছি এইসব কথা কিছুই নেই,'' — স্বর্ণ বলে।

''বড়ো হ'লে আস্তে আস্তে, সবই পড়বি। আমাদের বাড়ির 'অরুনোদয়' গুলিতে আমাদের প্রতিবেশী জাতিগুলির কথা সব লেখা আছে।''

আস্তে আস্তে নৌকোদুটি এক বিস্তৃত বনাঞ্চলের মাঝে এগিয়ে যেতে শুরু করল। দুইদিকে বড়ো বড়ো, লম্বা লম্বা গাছ। কিছু কিছু গাছের ডাল নদীর দিকে ঝুঁকে পড়েছে। গাছের ডালে ডালে বাঁদর গুলিকে লম্ফ ঝম্ফ করে কুচ - কাওয়াজ করতে দেখে স্বর্ণ আর তার ভাইটি খুব মজা পায়। নানারঙের মাছরাঙা পাখী গুলি গাছের ডাল থেকে জলে ছোঁ মেরে নেমে এসে আবার ওপরে উড়ে চলে যাচ্ছে। রোদের আলোয় যেন তাদের পাখা থেকে রামধনুর রঙ বেরুচ্ছে। এক - এক গোছা মরা গাছের ডালে কখনো কখনো এক ঝাঁক বক বসে থাকে আর নৌকোখানি কাছে আসার সঙ্গে সঙ্গে গোটা ঝাঁকটি একসঙ্গে আকাশে উড়ে যায়। তাদের অদৃশ্য হওয়া পর্যন্ত স্বর্ণ তাদের সঙ্গে কোন্ এক চম্পাবতীর দেশে উড়ে যায়। কখনো বা দূরদূরান্তের থেকে এক ঝাঁক বুনোহাঁস মালার মতো একদিকে থেকে আরেকদিকে ওপর দিয়ে কোন্ অজানার পথে উড়ে যায়। তারা যেন চীৎকার করে ডেকে ডেকে স্বর্ণকে কি এক অচিন লোকের খবর দিয়ে যায়। গুণাভিরাম শাল গাছগুলিতে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে খুব দুঃখের সঙ্গে বললেন, ''একদিন আমাদের এই মূল্যবান গাছগুলি ঝোঁপ জঙ্গলের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে যাবে। দরঙের দিকের কাঠের কিছু ব্যবসায়ী আজ কয়েকবছর ধরে লোক লাগিয়ে বড়ো বড়ো গাছগুলি কেটে ধ্বংস করে ফেলছে। এখন যেগুলো দেখছ, বেশির ভাগই নতুন গাছ। ব্যবসায়ীর চোখ যখন পড়েছে এগুলিও বেশিদিন থাকবে না।''

কামপুরে গুণাভিরামের কিছু সরকারী কাজ - কর্ম ছিল। ফলে একদিন কামপুরের

ডাকবাংলোয় থেকে পরের দিন আবার যাত্রা আরম্ভ হ'ল। দুপুরের দিকে নৌকো গিয়ে বালিরাম নামে একটি গ্রামের কাছাকাছি গিয়ে পৌছাল। সেই জায়গায় নৌকা লাগাবার কথা ছিল না। সাতদিনের নৌকোযাত্রার ফলে যাত্রীরা ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল আর যত তাড়াতাড়ি সম্ভব যমুনামুখ পাওয়ার কথা চিন্তা করেছিল। কিন্তু বালিরামের ঘাটে দুটি বড় নৌকা দেখতে পেয়ে নৌকোর যাত্রীরা কৌতূহল সম্বরন করতে পারলেন না। নৌকো চালকদেরও বড়ো নৌকো দুটির নৌকো চালকরা চিনতে পারায় তাদের কাছাকাছি যেতে ইচ্ছে হল। গুণাভিরাম নৌকোটির কাছাকাছি যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সেই নির্জন জায়গাটি মুখরিত করে তোলা এক সুমধুর সঙ্গীতের সুর শুনতে পাওয়া গে'ল। স্বর্নলতা অবাক হয়ে পারের দিকে তাকিয়ে থাকে। সঙ্গীতের সুরটি তার খুব চেনা চেনা লাগছে। আরও কাছাকাছি যাওয়াতে সে সেই সুর কার গলার তাও চিনতে পারল। এ হচ্ছে তারারই গলা। স্বর্ণদের নৌকো পারে লাগাবার সঙ্গে সঙ্গে সে এক আশ্চর্য দৃশ্য দেখতে পেল। বড়ো নৌকো একখানির ওপর মিস্ অরেল কীলার অর্গ্যান বাজাচ্ছেন আর কাছে দাড়িয়ে তারা এবং আরও দুজন মেয়ে ধর্মীয় সঙ্গীত গাইছে। ইতিমধ্যে পারে বহু লোক ভিড় করেছে। গান শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে অন্য একজন পাদরী মহিলা লোকেদের মধ্যে ছোট ছোট পুস্তিকা কিছু কিছু বিতরন করতে শুরু করলেন। বেশীরভাগ মানুষই পুস্তিকা গুলি উল্টেপাল্টে দেখে আবার সেগুলি ফেরৎ দিলেন। পুস্তিকা গুলি অসমীয়া ভাষাতে লেখা হলেও এই গাঁয়ের লোকদের মধ্যে লেখা - পড়া জানা লোক বোধকরি -একজনও ছিল না। কথাটা বুঝতে পেরে দুইজন মেম পারে নেমে এসে ভাঙ্গা ভাঙ্গা অসমীয়াতে তাদের যিশুর কথা বলতে শুরু করলেন। প্রথমে সকলে মনোযোগ দিয়ে তাঁদের কথা শুনতে লাগল। কিন্তু যখন মিশনারী কয়েকজন তাদের সেই জায়গাতে আসার উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করে জানালেন যে তাঁরা মেয়েদের জন্যে এখানে একটি ইস্কুল বানাবার চেষ্টায় আছেন, তখন বয়স্করা আস্তে আস্তে চলে যেতে উদ্যত হলেন। শেষে মেমেদের কথা শোনবার জন্যে একদল ছেলেমেয়ে মাত্র থাকল। ইতিমধ্যে গুণাভিরাম বড়ুয়া, বিষ্ণুপ্রিয়া আর স্বর্ণলতা পারে উঠে এসেছিলেন। তারা তাঁদের দেখে আশ্চর্য আর উৎফুল্ল হয়ে দৌড়ে কাছে এল।

"এই গ্রামটির নাম ক্যাম্প নাকি"? স্বর্ণ আগ্রহে জিজ্ঞেস করল।

"কি - যে বল । গ্রামের নাম তো বালিরাম। এখানে দুটি খ্রিস্টান পরিবার আছে। সেইজন্যে আমি এখানে এসেছি। এইভাবে আসাকে ক্যাম্পে আসা বলে। আমরা পনের দিন ধরে এরকম করে নৌকোতে ঘুরছি। আরও পনের দিন পরে আমরা ঘরে ফিরে যাব।"

"এত দিন! স্বর্ণর একসপ্তাহ নৌকোতে ঘুরেই ক্লান্ত লাগছে"।

ইতিমধ্যে গুণাভিরাম পাদরী মেমেদের সঙ্গে কথা বার্তার জন্যে প্রস্তুত হলেন। এরকম সময়ে গাঁয়ের দিক থেকে একদল লোক এগিয়ে এলেন। সঙ্গে মোড়ল ধরনের একজন।

তাঁরা একটু ইতস্তত করে গুণাভিরাম আর মেমেদের কাছে এগিয়ে এলেন। হয়তো গুণাভিরামকেও পাদরীদের মধ্যে একজন বলে ভেবেই তাঁরা তাঁকে বললেন যে যদিও খ্রিস্টানদের বিরুদ্ধে বলবার তাদের কিছুই নেই, কারণ তাঁরা সব ভালো কথাই বলেন, তবুও মেয়েদের জন্যে পাঠশালা করাটা তাঁদের পছন্দ হচ্ছে না। গাঁয়ের ছেলে যে দু - একজন লেখাপড়া শিখেছে তারাই ক্ষেতের কাজে মনযোগ দিচ্ছে না। এবার মেয়েরাও পড়তে গেলে ঘরের কাজকর্ম কে করবে? লোকেরা কথাগুলি বেশ উত্তেজিত হয়ে বলছিল।

মিশনারী দলটির প্রধান ব্যক্তির মতোই গুণাভিরাম গাঁয়ের লোক গুলিকে ধৈর্যের সঙ্গে বোঝাতে চেষ্টা করলেন যে মেয়েরা ইস্কুলে যে শিক্ষা পাবে তাতে ঘরের কাজকর্ম আগের চেয়ে ভালোভাবে করতে পারবে। তারওপরে, মেয়েরা শিক্ষিতা হ'লে গাঁয়ের ছেলেমেয়েরা ভালো হবে। মায়েরা যদি মূর্খ হ'য় সন্তানদের কি পরিমাণ বিপদ হ'তে পারে সে কথা গুণাভিরাম বুঝিয়ে বললেন। মিস্ কীলার ও আধা অসময়ীতে একটা গল্প বল'লেন। গল্পটির মূলকথা ছিল যে জ্ঞানী গুনী একজন মা বিপথে যাওয়া সন্তানকেও সৎপথে আনতে পারে। সঙ্গে সঙ্গে গাঁয়ের বৃদ্ধ কজনের মন কোমল হল। ইতিমধ্যে একজন গ্রামের একজনকে ফিস্ ফিস্ করে গুণাভিরামের আসল পরিচয় দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যুতের মতো কথাটা ছড়িয়ে পড়'ল। গ্রামের মানুষেরা সম্ভ্রমের সঙ্গেঁ বড়ুয়াকে আশ্বাস দিলেন যে পাদরী মেম আর তাঁদের দলটিকে গ্রামে থাকবার সবরকম সুবিধে দেওয়া হ'বে। ইস্কুল করবার জন্যেও অনুমতি দেওয়া হল। কিন্তু তাঁরা মাত্র একটি আশ্বাসই খুঁজলেন যে ইস্কুলে পড়া মেয়েদের যেন নিজের ধর্ম ত্যাগ করতে শিক্ষা দেওয়া না হয়। গুণাভিরাম লোকজনদের জানালেন যে কলিকাতা ইত্যাদি বড়ো শহরে অনেক মেয়ে উচ্চশিক্ষা নিচ্ছেন। কিন্তু তাঁরা নিজের ধর্ম ত্যাগ করেন নি।

এরকমভাবে লোক গুলিকে বোঝানোর পরে গুণাভিরাম নিজের নৌকোতে ফিরলেন। সেইসময় তাঁর চোখের সামনে ভেসে উঠে ছিল আর একজন মহামানবের ছবি যিনি স্ত্রী - শিক্ষার জন্যে প্রায় একাই এক প্রতিকূল পরিস্থিতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিলেন। সেই মহাত্মা বিদ্যাসাগরের মহান্ আদর্শই গুণাভিরামকে নিজের জীবন যুদ্ধে সবসময় অনুপ্রেরণা দিয়ে আসছে। তিনি যদি বিদ্যাসাগর বাঙালীজাতির জন্যে যতখানি করেছেন তার একশো ভাগের এক ভাগও অসমীয়া জাতির জন্যে করতে পারতেন। কিন্তু নদীর দুই তীরের অন্ধকার জঙ্গলের দিকে তাকিয়ে গুণাভিরামের মনে হতাশার ভাব নেমে আসে। ঝক্মকে অনেক প্রদীপ কলিকাতাকে আলো দিচ্ছে। আসামের এই অন্ধকারের মাঝখানে তিনি একা আলো দেখাতে পারবেন কি?

দশ

চা - বাগানের এক সপ্তাহ খুব হৈ চৈ এর মধ্যে দিয়ে কেটে গেল। কৈলাসনাথ রায় আর তার পত্নী বড়ুয়া পরিবারকে আদর যত্নে অভিভূত করে ফেললেন। প্রথম দিন ঘাটে গাড়ি পাঠিয়ে নিয়ে যাওয়া থেকে তাদের আথিত্যের সীমা ছিল না। বাগানে অতিথি বলতে কদাচিৎ কেউ কেউ গিয়েছিল। ফলে রায়বাবু আর তাঁর স্ত্রী গুণাভিরামের পরিবারকে ছাড়তে চাইলেন না। কিন্তু সরকারী কাজের তাগিদে গুণাভিরাম চারদিনের বেশি থাকতে পারলেন না। আসার সময় বিষ্ণুপ্রিয়া আর কৈলাস নাথ রায়ের পত্নী, দুজনেরই চোখ জলে ভরে গিয়েছিল। বিয়ের পরে এত আদর যত্ন বিষ্ণুপ্রিয়া আর কারও কাছ থেকে পান নি।

স্বর্ণদের মফঃস্বল থেকে ঘুরে আসতে প্রায় কুড়িদিন হল। এই সময়ের মধ্যে লক্ষ্মীপ্রিয়ার জীবনে এক বিরাট পরিবর্তন ঘটে গেল। তার বিয়ে ঠিক হয়েছে। বর কলিয়াবরের রামপ্রসাদ গোস্বামীর মেজ ছেলে গোবিন্দ প্রসাদ। তার বয়স ন বছর পূর্ন হওয়ার পর থেকে পঞ্চানন শর্মা ভাল একটি বরের খোজে ছিলেন। বিশেষ করে যখন থেকে লক্ষ্মী হাকিমের ঘরে পড়তে যাওয়া শুরু করল তখন থেকেই শর্মাকে মা আর পত্নীর তাগিদে বর খোঁজার জন্য বেশি করে জোর দিতে হ'ল। শেষে কালিয়াবরের গোস্বামীর ছেলের সঙ্গে কোষ্ঠীর ভাল মিল হ'ল। ছেলেটি দেখতে শুনতে বেশ ভালো। নগাঁও - হাইস্কুলে ফোর্থ ক্লাস পর্যন্ত পড়েছিল। কিন্তু অন্যের সঙ্গে থেকে পড়াতে অসুবিধে হওয়ায় ঘরে ফিরে এসে এখন কাছের একটি প্রাইমারী স্কুলে শিক্ষকতা করছে। বরের ঘরের লোক এসে মেয়েও দেখে গে'ল। মাঘমাসে বিয়ের দিন ঠিক করা হয়েছে। ঋতুমতী না হওয়া পর্যন্ত মেয়ে মায়ের ঘরে থাকবে।

লক্ষী বিয়ে সম্পর্কে প্রথমে কিছুই বুঝতে পারেনি। সব ঠিক ঠাক হওয়ার পর যখন মা - ঠাকুমারা তার চুলের গোছা রোজ রিঠার জলে ধোয়া, 'কেরু' পরানোর জন্যে কানের ফুটো বড় করা ইত্যাদি ব্যাপারে দৃষ্টি দিতে শুরু করলেন, তখন সে আস্তে অস্তে বুঝতে পারল যে তার জীবনে কিছু একটা পরিবর্তন আসতে চলেছে। ঘরের তাঁতে পাটের মেখেলা লাগানো হ'ল। পাশের গাঁয়ের দুজন তাঁতবোনা দিদিকে বিয়ের জন্য ফুল করা রিহা মেখেলা আর সন্মান জানাবার কাপড়গুলি তাঁতে বুনবার জন্যে দেওয়া হ'ল। মোটকথা শর্মার ঘরের সব কাজেরই এখন একটাই লক্ষ্য— লক্ষ্মীর বিয়ে। স্বর্ণদের না থাকা কয়েক দিন লক্ষ্মীর বড্ড খালি খালি লাগছিল। ফলে এই নতুন পরিস্থিতির আবির্ভাব হওয়াতে তার ভালই লাগছে। বিশেষ করে, ঘরের সবাই তার খাওয়াদাওয়া, সাজ - সজ্জা, শরীর - স্বাস্থ্যের দিকে এত মন দিয়েছে দেখে তার মন শিশুসুলভ আনন্দে ভরে গেল। স্বর্ণ এসে গেলে কথাগুলি বলবার জন্যে সে আগ্রহভরে অপেক্ষা করছিল।

স্বর্ণেরা ফেরার পরদিনই সে বাবার সঙ্গে বিল্বকুটীরে গে'ল। কিন্তু যে আগ্রহে সে এই

দিনটির দিকে চেয়েছিল তার তুলনায় তার মনটা যেন একেবারে বিষন্ন। পঞ্চানন শর্মা মফঃস্বল ভ্রমনের খবরাখবর নেওয়ার জন্যে গুণাভিরামের কাছে বসলেন। লক্ষ্মী স্বর্ণর হাত ধরে বেলগাছ তলায় তাদের খেলার জায়গাটায় গে'ল। অন্যদিন লক্ষ্মীর মুখ থেকে অনর্গল কথার খই ফুটতে থাকে। কিন্তু আজ স্বর্ণই কথার রেলগাড়ি চালাল। নৌকো যাত্রার কথা, তারার সঙ্গে দেখা হওয়ার কথা, বাগানের কথা — এইসব বলতে বলতে স্বর্ণ মনেই করেনি যে এতক্ষন লক্ষী চুপচাপ আছে। অনেকপরে কথাটা খেয়াল করে স্বর্ণ বলল,"তোমার কি হ'ল লক্ষ্মী — এত মনমরা হয়ে আছ কেন"? লক্ষ্মী কোনো উত্তর দিল না। অবাক হয়ে তার মুখখানি দেখতে গিয়ে স্বর্ণ লক্ষ্য করল, লক্ষ্মীর সুন্দর চোখ দুটি জলে ভরে গেছে। তাকে আগে কোনদিন স্বর্ণ কাঁদতে দেখেনি। একটু অবাক হয়ে সে আবারও জিজ্ঞেস করলে —"কি হ'ল, বলত"?

"আমি আর তোমার সঙ্গে পড়তে আসতে পারব না। মাঘমাসে আমার বিয়ে হবে।" এই বলে লক্ষ্মী হাউ হাউ করে কেঁদে উঠল। বিয়ের খবরটা এরকমভাবে স্বর্ণকে দিতে হবে এটা সে একবারও ভাবে নি। কিন্তু সেইদিন স্বর্ণদের ঘরে আসবার সময় মা বলল, " স্বর্ণ মাকে ডেকে আসবি। বিয়ের আগে আর তাঁদের ঘরে যেতে হবে না। হাকিমের ঘরের সঙ্গেঁ যাতা য়াত আছে বলে কেউ যদি সেখানে লাগিয়ে দেয়, তাহলে ভয়ানক কথা হবে।"

লক্ষ্মী এবারই বুঝতে পারল যে বিয়ের অর্থ শুধুমাত্র নতুন কাপড় আর সোনার গয়না নয়। তার জীবনে যেটুকু স্বাধীণতা ছিল এখন সেটুকু ও কেড়ে নেওয়ার চেষ্টা চলছে। লক্ষ্মী বেলগাছতলায় মাথা রেখে মন প্রাণ উজাড় করে কাঁদল। স্বর্ণের মুখখানি ভয় আর দুঃখে বিবর্ণ হয়ে গেল। বিয়ে যে একটা সাংঘাতিক ভয়ানক ঘটনা তার এরকম মনে হল। তাকে ও তারমানে মা বাবা বিয়ে দিয়ে দেবে নাকি? এক অজানা ভয়ে তার মনটা কেঁপে উঠল। লক্ষ্মী কেঁদে কেঁদে ক্লান্ত হয়ে ঘুরে দেখল যে স্বর্ণ ও ফুপিঁয়ে ফুপিঁয়ে কাঁদছে। নিজের দুঃখ ভুলে লক্ষ্মী স্বর্ণ কে সান্ত্বনা দিয়ে বললে "কেঁদো না স্বর্ণ। আচ্ছা আমি না হয় কখনো পারলে তোমার কাছে আসব। তুমি দিদি ভালো করে মন দিয়ে পড়াশুনো করবে। আমার বিয়েতে আসবে কিন্তু।" শেষের কথাগুলি বলতে বলতে লক্ষ্মী হাসতে চেষ্টা করছিল। স্বর্ণ আসলে কেন কাঁদছিল সে নিজেই বুঝতে পারল না। সেই অল্পবয়সে অন্যের কান্না দেখলে এমনিতে ও যে দুঃখ অনুভবে চোখে জল আসে সে কথা বোঝবার বয়স লক্ষ্মীর হয় নি। স্বর্ণর চোখের জল তার প্রতি স্বর্ণর ভালোবাসার চিহ্ন বলে ভেবে লক্ষ্মী কৃতজ্ঞ বোধ করল।

এগারো

লক্ষ্মীর বিয়ে ঠিক হবার পরে গুণাভিরাম আর বিষ্ণুপ্রিয়া অনেক ভাবনাচিন্তা করে স্বর্ণের জন্যে অন্য একজন গৃহশিক্ষকের বন্দোবস্ত করার কথা স্থির করলেন। তাঁদের ধারণা হ'ল যে মানুষ নিজে শিক্ষিত হয়েও অল্পবয়সের একটি মেয়েকে গৌরীদান করতে পারেন, সেই মানুষের কাছ থেকে স্বর্ণ যথার্থ শিক্ষা কখনই পাবে না। সেইসময়ে ভারতের বঙ্গদেশ এবং অন্যান্য প্রদেশে বাল্যবিবাহের স্বপক্ষে আর বিপক্ষে অনেকে পত্র পত্রিকায় লিখেছিলেন। গুণাভি রাম নিজেও কলকাতাতে পড়ার দিন গুলিতে 'অরুণোদয়' কাগজ লিখেছিল যে বিয়ের সময়ে ছে'লে এবং মেয়ে উভয়েরই আরও মন পরিপক্ক হওয়া উচিত। ছে'লে আর মেয়ের মধ্যে যদি বয়সের ব্যবধান বেশী হয়, তাহলে স্বামী এবং স্ত্রীর মধ্যে পিতা কন্যার মতো সম্পর্ক তৈরি হয়। তাঁদের মধ্যে সমবয়সীদের মতো বন্ধুত্ব বা প্রীতির সম্পর্ক গড়ে ওঠে না, ফলে একসঙ্গে সংসার করার সময় অনেকসময়ে দুজনে অসুখী হয়।

এসব ধ্যাণ - ধারণা গুণাভিরাম পেয়েছিলেন কলকাতার ব্রাহ্মসমাজ থেকে। ব্রাহ্মদের থেকে শুরু হওয়া সমাজবিপ্লবের এক প্রধান লক্ষ্যই ছিল হিন্দু বিবাহপদ্ধতির এক আমূল পরিবর্তন সাধন করা। বাল্যবিবাহ আর বহুবিবাহের বিরোধিতা করে আর বিধবা বিবাহ সমর্থন করে কেশবচন্দ্র সেন, রাজ নারায়ণ বসু প্রমুখ ব্রাহ্ম সমাজের নেতারা জোরদার প্রচার চালাচ্ছিলেন। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, কেশবচন্দ্র সেন, শিবনাথ শাস্ত্রী, এঁরা ব্রাহ্ম সমাজের নেতা, নারীমুক্তির ক্ষেত্রে একজন আর একজনের চেয়ে বেশি উদার দৃষ্টি গ্রহণ করবার জন্যে চেষ্টা করেছিলেন। দেবেন্দ্রনাথ সর্বপ্রথম নিজের মেয়ের বিয়ে ব্রাহ্মমতে দেন। কেশবচন্দ্র নারীশিক্ষার ক্ষেত্রে অগ্রবর্তী হলেন, আর শিবনাথ শাস্ত্রী উপাসনার সময় নারী - পুরুষের একসঙ্গেঁ বসার ব্যবস্থা করার জন্যে উঠে পড়ে লাগলেন। নগাঁওর ব্রাহ্মে রা পত্র-পত্রিকার মাধ্যমে এইসব খবর রাখতেন। ফলে কলিকাতার বুদ্ধিজীবী জগতের এই ঝড়ের এক ঝলক হাওয়া তাঁদেরও ছুঁয়ে গিয়ে ছিল। ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের উদাত্ত কণ্ঠ দূর অসমের এককোনে থেকেও তাঁরা ক্ষীন ভাবে হলেও শুনতে পেয়েছিলেন। আদি ব্রাহ্মসমাজের 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' আর নতুন করে গড়া বিপ্লবী ব্রাহ্ম দের ইন্ডিয়ান মিররের মাঝখানে হওয়া খুব বেশি মতের অমিল নগাঁওর ব্রাহ্মদের মাঝখানেও আলোরণ সৃষ্টি করেছিল। গুনাভিরাম বড়ুয়া প্রমুখ বেশ কয়েকজন ব্রাহ্মসমাজী কেশবচন্দ্র সেনের বিপ্লবী আদর্শের দ্বারাই প্রধানত প্রভাবিত হয়েছিলেন। প্রতি রবিবারে গুনাভিরামের উদ্যোগে সজ্জিত নতুন ব্রাহ্মমন্দিরটিতে বিকেলের উপাসনার পরে এইসব বিষয়ে আলোচনা হত। আলোচনাতে প্রধানতঃ অংশ নিতেন 'বাংলাস্কুলের হেডমাস্টার গুরুনাথ দত্ত আর গুণাভিরাম বড়ুয়া। গুরুনাথ দত্ত আচার্যরূপে উপাসনার কাজ কর্ম চালিয়েছিলেন। দেবেন্দ্রনাথের আদি ব্রাহ্মসমাজে কিন্তু ব্রাহ্মণ ছাড়া অন্যকে এইভার দেওয়া হয়নি। নগাঁওর

ব্রাহ্মসমাজ এব্যাপারে কেশবচন্দ্রের আদর্শেরই অনুসরণ করেছিলেন।

পঞ্চানন শর্মার নিজের মেয়েকে গৌরী দান করার সিদ্ধান্ত গুণাভিরামের মনকে খুব বিষন্ন করে ফেলেছিল। স্বর্ণর ভবিষ্যতের জন্যে তাঁর মনে অন্য আশঙ্কা ও স্থান পেয়েছিল। সেইজন্যে রবিবার উপাসনার পরে দত্ত এবং অন্যান্য সকলের সঙ্গে আলোচনা করবার সময়ে তিনি বাল্যবিবাহের প্রশ্নটা উত্থাপন করলেন। কলিকাতার ব্রাহ্মরা চোদ্দবছর হবার আগে মেয়ের বিয়ে দেওয়া নিষিদ্ধ করবার জন্যে উঠে পড়ে লেগেছেন। কিন্তু সমাজের অন্য সকলের মাঝে এই কথাগুলির ভালোমতো প্রচার হয়েছে কি?

"কেন হয় নি?" দত্তবাবু বললেন, "আজকাল অনেক পত্র - পত্রিকায় এই বিষয়ে লেখা লেখি হয়েছে তাতো আমরা দেখইছি। সেইদিনও দ্বারকানাথ গাঙ্গুলীর 'অবলাবান্ধব' এ এই বিষয়ে সুন্দর একটি আলোচনা প্রকাশিত হয়েছে। এখন কথা হচ্ছে লেখা পড়া জানা লোকেরা এসবের দ্বারা প্রভাবিত হবেই। অবশ্য অশিক্ষিত লোকেদের কথা আলাদা। তাদের অবস্থার পরিবর্তন হতে অনেক সময় লাগবে।"

"শিক্ষিত বলতে আমি সাধারণতঃ ব্রাহ্মণ, কায়স্থ ইত্যাদি উচ্চবর্ণের লোকেদের বুঝি। কিন্তু এইখানে আমাদের একটা বিরাট ভুল হচ্ছে। অসম ওড়িশা ইত্যাদি রাজ্যে নীচুজাতের মধ্যে বাল্যবিবাহ, সতীদাহ প্রথা ইত্যাদি কুসংস্কার গুলি নেই। উচ্চবর্ণের মধ্যে সেগুলো ঢুকেছে। সেইজন্য শিক্ষিত উচ্চবর্ণের ভেতরের এই কুসংস্কার গুলো সরিয়ে দেওয়া প্রয়োজন।"

গুণাভিরামের কথাগুলি যে শুধুমাত্র তর্কের জন্য বলা তা কিন্তু নয়, এসব যে তাঁর অন্তরের গভীর উপলব্ধি থেকে বেরুনো সেটা সবাই বুঝেছিলেন। খুব কম সময় সকলে চুপ করে থাকবার পরে দুর্গানাথ রায় নামের যুবক উকিলটি একটু উত্তেজিত হয়ে বলে উঠলেন,

"ব্রাহ্মণ কায়স্থের মাঝখানে যাঁরা প্রকৃত শিক্ষিত তাঁরা ইতিমধ্যে ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করেছেনই। বাকি যাঁরা একরোখা হয়ে নিজেদের কুসংস্কার গুলি আঁকড়ে ধরে আছেন তাঁদের কেউই রক্ষা করতে পারবে না। তাঁরা সবসময় আমাদের ব্রাহ্মসমাজের লোকজনদের 'ব্রহ্মজ্ঞানী' বলে বিদ্রুপ করবেই! আমাদের সেইসমস্ত সংকীর্ণ মনের মানুষদের সম্পর্কে চিন্তা করার কোনো প্রয়োজন নেই।"

নবদীক্ষিত ব্রাহ্মদের মধ্যে দুর্গানাথ রায় একজন। তিনি কলকাতায় কেশবচন্দ্র সেনের তেজস্বী বক্তৃতা শুনেছেন। শিবনাথ শাস্ত্রীর সঙ্গে তাঁর চেনা পরিচয় আছে। ফলে আদি ব্রাহ্মসমাজের সভ্যদের মতো ব্রাহ্মণদের সঙ্গে আপোস করার মধ্যে তিনি নেই। গুরুনাথ দত্ত, গুণাভিরাম বড়ুয়া প্রমুখ বয়োজ্যেষ্ঠদের প্রতি দুর্গানাথের ভ্রাতৃসুলভ শ্রদ্ধার অভাব নেই। কিন্তু তাঁরা ভাবেন যে দুর্গানাথের অতিবেশি উৎসাহকে কিছুটা নিয়ন্ত্রণে রাখা প্রয়োজন।

"তুমি খুব জ্ঞানের কথা বললে না, দুর্গানাথ। আমরা ব্রাহ্মরা যদি এত আত্মাভিমানী

হই তাহলে যে উদ্দেশ্য নিয়ে আমাদের সমাজ গড়া হয়েছিল, সেই উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হবে। আমরা এমন একটা নতুন ভারত গড়তে চাই যেখানে জাতপাতের মতো কুসংস্কার গুলো থাকবে না। যেখানে আধুনিক শিক্ষার বিস্তার হ'বে। বিশ্বের অন্যান্য সভ্যদেশ থেকেও আমাদের এগিয়ে যেতে হবে। ফলে যারা আমাদের বিদ্রুপ করছেন, তাঁদের অন্ধকার থেকে আলোয় আনা আমাদের কর্তব্য।'' গুরুনাথ দত্ত সব সময়ই আলোচনার মোড় ঘুরিয়ে দেন, যখনই তিনি দেখেন যে আলোচনার গতি তিক্ততার দিকে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে। তাঁর এই বিশেষ গুণটির জন্যে সবাই তাঁকে খুব সম্মান করে চলে।

সেইদিনের আলোচনা শেষ হওয়ার পরে গুরুনাথ দত্তকে একলা ডেকে এনে স্বর্ণর গৃহশিক্ষকের সমস্যাটা গুণাভিরাম প্রকাশ করলেন। একটু সময় চিন্তা করে গুরুনাথ গুণাভিরামকে আশ্বাস দিয়ে বললেন যে তাঁদের স্কুলের মাস্টার মশাই রজনীনাথ দাস এই দায়িত্ব গ্রহণ করতে পারবেন। স্বর্ণর ইংরেজীও একটু শেখা দরকার যাতে উচ্চশিক্ষার জন্যে সে পরে ভালো একটি স্কুলেও যেতে পারে।

''এই ব্যাপারে আমি খুব চিন্তায় আছি। আমাদের মেয়েদের জন্যে নগাঁওতে এখনো একটি ভালো স্কুল হল না,'' গুণাভিরাম দুঃখ করে বললেন।

''আপনি চিন্তা করবেন না,'' — গুরুনাথ বাবু আশ্বাস দিয়ে বললেন, ''পরমেশ্বরের ইচ্ছে হলেই স্বর্ণ বেথুন স্কুলে একদিন পড়তে যেতে পারবে। তাছাড়া শুনছি যে কিছুদিন হল এনেট্ এক্‌র ইদ্ নামের আর একজন ইংরেজ মহিলা দ্বারকানাথ গাঙ্গুলীর সঙ্গে মিলে কলকাতাতে আর একটি মেয়েদের স্কুল করেছেন। নামটি হল 'হিন্দু মহিলা বিদ্যালয়।' এই স্কুলটিতে নাকি শিক্ষাপদ্ধতি অন্যধরণের হ'বে। শুনেছি, কেশবচন্দ্রের সঙ্গে দ্বারকানাথের এই বিষয়ে মনোমালিন্য হয়েছে। যাইহোক, আমরা সকলে চিন্তা ভাবনা করে স্বর্ণর জন্যে ভাল স্কুল একটি ঠিক করব। আপনি কি বলেন?''

গুরুনাথ দত্তের কথাগুলি গুণাভিরাম বড়ুয়ার মনের ভারী বোঝা হাল্কা করে দিল। কিন্তু স্বর্ণকে কলিকাতায় পাঠাতে হবে একথা ভেবে তাঁর মন হঠাৎ বিষাদে ভরে গেল। এত আদরের এই ছোট্ট মেয়েটিকে এতদূরে তিনি কেমন করে পাঠাবেন? আর তিনি পাঠালেও তার মা কেন এই ব্যাপারে রাজি হ'বে? অথচ তিনি আর বিষ্ণুপ্রিয়া দুজনেই স্বর্ণকে নিয়ে কত স্বপ্ন দেখেছেন। তাকে তাঁরা দুজনে এক নতুন যুগের আদর্শ রূপে গড়ে তুলবেন, তারজন্যে হয়তো তাঁদের নিজের হৃদয়কেও কঠোর করে তুলতে হবে। গুণাভিরাম বাড়ি ফিরে আসবার সময় মেয়ের হাতখানি নিজের দুইহাতের মধ্যে নিয়ে এইসব কথাই ভাবতে থাকলেন।

বারো

ক্যাম্পের থেকে ফিরে আসার পরে তারার দিন গুলি খুব ব্যস্ততার মধ্যে কেটে গেল। বড়দিনের আগে সে বাৎসরিক পরীক্ষা দেবে। তখনকার দিনে নগাঁওতে মেয়েদের দুটি প্রাইমারী স্কুল ছিল। একটি হল নতুন গড়া বাংলা স্কুল আর অন্যটি হল পাদরীদের পরিচালিত অসমীয়া স্কুল। দুটি স্কুলেরই মেয়েদের সংখ্যা মোটামুটি পঞ্চাশের বেশি নয়। বাৎসরিক পরীক্ষা নেওয়া হয় ছেলেদের বাংলা স্কুলের শিক্ষক নকুলবাবুর ঘরে। নকুলবাবুর স্ত্রী নিজেও মেয়েদের স্কুলটির শিক্ষায়িত্রী। পরীক্ষার দিনগুলিতে তাঁদের বাড়িতে এক উৎসব মুখর পরিবেশ গড়ে ওঠে। একটা বড় ঘরে পরীক্ষা নেওয়া হয়। দুটি স্কুলের পরীক্ষার্থী মিলিয়ে প্রায় কুড়িজনের মতো। পরীক্ষাতে বাংলা স্কুলের শিক্ষিকাদের বাইরেও মিশনারী মেম দু - একজনও উপস্থিত থাকেন। তারার কাছে এইবারের পরীক্ষাটি অতি গুরুত্বপূর্ণ। এই পরীক্ষাতে ভালোভাবে উত্তীর্ণ হতে পারলে তাকে মিশনের পক্ষ থেকে সরকারী নর্মালস্কুলে পাঠানো হবে। মিস্ কীলারের একান্ত ইচ্ছে যে তারা নর্মালস্কুলে পড়ে বালিরামে নতুন গড়ে ওঠা মেয়েদের স্কুলে কাজ করে। ক্যাম্প থেকে ফিরে আসবার পর তিনি গোলাপী আর তারার সঙ্গে এ বিষয়ে অনেক কথা বললেন। প্রথমে গোলাপীর কথাটা একটুও ভালো লাগেনি। স্বামী মারা যাওয়ার পর থেকে বুকে ধরে বড় করা তারাকে একলা এতদূরে পাঠানোর কথাটা তাঁর পক্ষে চিন্তা করাটাই যথেষ্ট কষ্টের। কিন্তু তাঁর আপত্তি শোনার পরে মিস্ কীলার যে সমস্ত কথা বললেন তার উত্তরে গোলাপীর বলবার মত কিছুই ছিল না। নৌকোতে বসে সুদূর দিগন্তের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে অরেল কীলার বলেছিলেন,

"গোলাপী, আমার মা ও ঠিক তোমার মতোই ভেবেছিলেন। আমিও তাঁর একমাত্র সন্তান ছিলাম। কিন্তু ভগবানের প্রতি তাঁর মনের অটল বিশ্বাসের বলে তিনি সমস্ত দুর্বলতাকে জয় করেছিলেন। আমার মিশনারী হওয়ার বাসনায় তিনি হাসিমুখে সম্মতি জানিয়েছিলেন। কিন্তু আমি জানি যে আমার আসার পরে তিনি দুঃখে ভেঙে পড়েছেন। তবু ও তিনি আমাকে বাধা দেননি। এখন দেখ তো, আমেরিকার বোস্টন শহর থেকে এসে আমি অসমে আছি, কিন্তু আমি কখনই নিজেকে নিঃসঙ্গ ভাবিনি। তোমরাই এখন আমার মা - বাবা, ভাই - বোনের মতো হয়ে গেছ। আমি যদি পারি, তারাই বা কেন পারবে না?"

মিস্ কীলারের কথা শুনে গোলাপী কোন উত্তর দিল না। সে সঙ্গে সঙ্গে নিজের মত পরিবর্তন করে ফেলল। তারা কিন্তু অন্য একটা কথা ভাবছিল।

"আমি তাহলে তোমার সঙ্গে আমেরিকা যেতে পারব না?" তারা হতাশার সুরে বলে।

মিস্ কীলার হেসে হেসে তার পিঠ চাপড়িয়ে বললেন, "তুমি কেন চিন্তা করছ? আমি কথা দিয়েছি তোমাকে একদিন আমেরিকা নিয়ে যাবোই। কিন্তু তার আগে তোমাকে

এখানকার লোকজনের মধ্যে কাজ করতে হবে। তাহলেই তুমি আমেরিকার মানুষদের বুক ফুলিয়ে বলতে পারবে যে তুমি একজন ছোট্ট চেহারার অসমীয়া মিশনারী।"

সেই দিনের পর থেকেই তারা মিশনারী হওয়ার স্বপ্ন দেখছে। তার মতে মিস্ কীলারের মত জ্ঞানী গুণী মহিলা এই সংসারে আর দ্বিতীয় কেউ নেই। সেও তাঁর মতো যিশুর বাণী প্রচার করবে, স্কুলে পড়াবে, গান শেখাবে — এর থেকে গৌরবের কথা তার কাছে আর কী হতে পারে? ক্যাম্প থেকে ঘুরে সেই কারণে তারা নতুন উদ্যমে নিজের কাজকর্মে মেতে উঠেছে। একদিন মায়ের সঙ্গে সে স্বর্ণদের বাড়ি গিয়েছিল। স্বর্ণই তাকে লক্ষ্মীর বিয়ের কথা বলল। তারা লক্ষ্মীকে দেখেছে। লক্ষ্মীদের ঘরে সে একবার মা আর মেমেদের সঙ্গে 'জেনানা' কাজের জন্যে গিয়েছিল। কিন্তু লক্ষ্মীর ঠাকুমা উঠোন থেকেই তাদের বিদেয় করে দিয়েছিলেন। এরকম অভিজ্ঞতা তাদের প্রায়ই হয়। তারারা তাই রাগ করেনি। কিন্তু লক্ষ্মী চুপিচুপি গেটের কাছে এসে তাদের সঙ্গে দেখা করেছিল। তারা তাকে নীতি কথার একখানি ছোট বই উপহার দিয়েছিল। লক্ষ্মীর বিয়ের কথা শুনে তারা একটু ও আশ্চর্য হয়নি। ব্রাহ্মণ সমাজে মেয়েদের ছোটবেলায় বিয়ে হয় বলে সে জানে। সেই বিষয়ে মাথাঘামানোর প্রয়োজন সে বোধ করেনি। তার এখন অনেক অন্য কথা চিন্তা করবার আছে। বড়দিনের আর মাত্র একসপ্তাহ বাকি। এখন তার একমাত্র কাজ বড়দিনের 'ক্রিশ্‌মাস ট্রী' সাজানোতে মেমদের সাহায্য করা। তারপরে ও তাঁর ভালোবাসার প্রত্যেককে নিজের হাতে ফুল তোলা রুমাল মেঝেতে পাতার শতরঞ্চি ইত্যাদি উপহার দেবার কাজ ও আছে। নতুন চেনা মিকির গ্রামের ছেলে মেয়েদের ও বড়দিনের উপহার পাঠাতে হবে। তাই স্বর্ণর সঙ্গে বেশিক্ষণ বসে কথা বলার সময় তারার নেই। স্বর্ণকে বড়দিনের উৎসবে আসার জন্যে বারবার বলে তারা বিদায় নিল।

তের

নগাঁওতে মিশনের বড়দিনের উৎসবে মাইলস্ ব্রণ্সনে গুণাভিরাম বরুয়াকে বিশেষভাবে নিমন্ত্রণ করলেন। এই উৎসবে গুণাভিরাম আগেও দু - একবার গেছেন। কিন্তু স্বর্ণকে সঙ্গে নেননি। একবার স্বর্ণর আগ্রহ দেখে তিনি তাকে সঙ্গে নিয়ে গেলেন। সেইদিন মিশনের ভেতরে নগাঁও আর তার আশেপাশে থাকা বেশির ভাগ খ্রিস্টান পরিবার গুলির খুব ভালো সমাবেশ হয়েছিল। অসমীয়া, বাঙালী আর মিকির ইত্যাদি বিভিন্ন জাতির খ্রিস্টানরা একজোট হয়ে উৎসাহের মধ্য দিয়ে এই পবিত্র উৎসবটির আয়োজন করেছিলেন। গুনাভিরাম পরিচিতদের বড়দিনের শুভেচ্ছা জানিয়ে নিজের আসনে বসলেন। স্বর্ণ বাবার কাছে বসল, যদিও তার চোখ মাটিতে কার্পেটের ওপরে বসে থাকা ছেলেমেয়েদের মধ্যে তারার খোঁজ করতে লাগল। কিন্তু তারাকে সে কোথাও দেখতে পেল না। ইতিমধ্যে

সামনে সুন্দরভাবে সাজিয়ে রাখা 'ক্রিশ্‌মাস ট্রী' দেখে ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের মধ্যে আনন্দের হিল্লোল বয়ে গেল। সত্যিকারের 'ক্রিশ্‌মাস ট্রী' না থাকার জন্যে অন্য একটা গাছকে রংবেরঙের কাগজে মুড়ে তাতে নানারঙের তারা, ফুল আর ছোট ছোট পুতুল এঁকে দেওয়া হয়েছিল। স্বর্ণ অবাক হয়ে সেদিকে তাকিয়ে থাকার মধ্যেই অর্গ্যানে বড়দিনের গানের সুর বেজে উঠল। আর সঙ্গে সঙ্গে স্বর্ণ এক অপূর্ব দৃশ্য দেখতে পেল। মাথা থেকে পা পর্যন্ত সাদা পোষাক পরে মা মেরীর রূপে তারা এগিয়ে আসছে। তার কোলে যিশুরূপী একটি পুতুল। শুভ্র বস্ত্র পরিহিত ছেলেমেয়েদের একটি দল গান গেয়ে তারাকে বেদীর ওপর বসাল। তারপরে 'যিশুখ্রিস্টে'র জন্মের কাহিনীটি ছেলেমেয়েরা গান গেয়ে গেয়ে সুন্দরভাবে পরিবেশন করল। মা মেরি আর শিশু যিশুকে স্বর্গের দেবদূত, ভেড়ার রাখাল আর প্রাচ্যের রাজারা যখন মাথা নত করে স্বাগত জানাল, তখন তারাকে সত্যিসত্যিই কোন একজন স্বর্গের দেবদাসী বলে মনে হল। স্বর্ণ অভিনয় আগেও দেখেছে। নগাঁওতে যাত্রাপার্টি এলে বাবা ঘরে ডেকে আনেন যাতে সবাই একসঙ্গে দেখতে পায়। স্বর্ণর যাত্রাপালা দেখতে ভালো লাগে। কিন্তু আজকের এই অনুষ্ঠানের গাম্ভীর্য অন্য ধরণের। অর্গ্যানের গম্ভীর সুর, সমস্বরে গাওয়া মধুর গীত আর শুভ্র পোষাক পরিচ্ছদ তার মনে এক পবিত্র আনন্দের ভাব এনে দিল।

অভিনয় শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের মধ্যে আনন্দের কলরব উঠল। পিঠে একটা বোঝা নিয়ে 'সান্তাক্লজ' বা 'বড়দিনের দাদু' থপ্‌থপিয়ে এগিয়ে এল। তাঁর কৃত্রিম সাদা দাড়ি - গোঁফ, লালটুপী আর লালসাদা পোযাক দেখে ছেলেমেয়ে আর বুড়োরা হাত তালি দিতে লাগল। 'বুড়ো' বড়দিনের সাজিয়ে রাখা গাছের তলায় বোঝাটি রেখে তার থেকে একটি একটি করে উপহার বের করে প্রতিটি ছেলেমেয়ের নাম ধরে ডেকে ডেকে উপহার দিতে লাগলেন। স্বর্ণ অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকতে থাকতে সে যেন শুনতে পেল তার নাম ধরে কেউ ডাকছে। প্রথমে সে বিশ্বাস করতে পারেনি। কিন্তু দ্বিতীয়বার আরও জোরে বুড়োটি তার নাম ডেকে উঠল ''স্বর্ণলতা বরুয়া।'' ইতিমধ্যে ছেলেমেয়েদের মাঝখানে দাঁড়িয়ে থাকা তারা হাসিমুখে তারদিকে ইঙ্গিত করাতে স্বর্ণ উঠে দাঁড়িয়ে অসহায়ভাবে বাবার মুখের দিকে তাকাল। গুণাভিরাম হাসিমুখে সম্মতি জানাবার সঙ্গে সঙ্গে স্বর্ণ এগিয়ে গিয়ে তার পুঁটলিটা কোনোমতে নিয়ে এল। লজ্জায় তার মুখখান লাল হয়ে গেল। কিন্তু সকলের সঙ্গে তাকে সমান গুরুত্ব দেবার ফলে তার অন্তর কৃতজ্ঞতায় ভরে গেল। কিছুক্ষণ পরে উপহারটি বুকে চেপে ধরে বাড়ি ফিরে আসবার আগে পর্যন্ত সে যেন কোন এক স্বপ্নপুরীতে হারিয়ে গিয়েছিল।

বড়দিনের উৎসব থেকে ফিরে এসে ঘরের প্রবেশ পথ থেকে স্বর্ণ এক ছুটে ভেতরে দৌড়ে গেল মাকে উপহার দেখাবার জন্যে। কিন্তু ভেতরে অতিথি দেখে সে একটু থমকে গেল। লক্ষ্মীর মা এবং বাবা এসেছেন। লক্ষ্মীর মা যে আগে কখনো বিল্বকুটীরে এসেছে একথা স্বর্ণর মনে পড়ে না। কিন্তু অতিথি বসে থাকা সত্ত্বেও স্বর্ণ নিজের আনন্দ আর

উত্তেজনা দমন করতে পারল না। মায়ের দিকে লাল কাগজে বাঁধা উপহারের প্যাকেটটা এগিয়ে দিয়ে সে প্রায় চীৎকার করে বলে উঠল "মা দেখ, আমাকে কি দিয়েছে। আমার নামটাই বা ওরা জানলে কেমন করে?

বিষ্ণুপ্রিয়া মেয়ের দিকে স্নেহের হাসি হেসে বললেন, "তুই যেতে পারিস একথা জেনেই তারা হয়ত তোর জন্যে উপহারের প্যাকেটটা বেঁধে রেখেছিল। মেয়েটিকে সত্যিই বড়ো ভালো লাগে। ঈশ্বর ওর মঙ্গল করুণ।"

স্বর্ণ পুঁটলিটা খুলে তার ভেতরে একটি ফুলতোলা রুমাল আর একটা সূঁচ সূতো রাখার বাক্স পেল। আনন্দে সে রুমালে চুমু খেল। লক্ষ্মীর মা স্বর্ণ আর বিষ্ণুপ্রিয়ার কথাবার্তা শুনে কিছু একটা বলার জন্যে উশখুশ করছিলেন। এবার বলে উঠলেন "মা স্বর্ণ, তুমি খ্রিসটানের বাড়ি ঘুরে এসেছ না? ভালোভাবে চান করে শুদ্ধ হয়ে নাও।"

স্বর্ণ অবাক হয়ে বড়ো বড়ো চোখে মায়ের মুখখানি দেখল। বিষ্ণুপ্রিয়া একটু অপ্রস্তুত হয়ে মেয়েকে ভিতরে যাওয়ার নির্দেশ দিলেন। স্বর্ণ চলে গেলে শর্মাগিন্নী হেসে বললেন, "ছোট মেয়ে তো, এখন থেকে সব কথা না শেখালে পরে সমস্যায় পড়বে।"

বিষ্ণুপ্রিয়া একটাও শব্দ করলেন না। হয়তো অতিথির সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করতে নেই বলেই কিছু বললেন না। কিন্তু তাঁর চোখেমুখে বিতৃষ্ণার ভাব ফুটে উঠল। শর্মাগিন্নি অবশ্য সেদিকে লক্ষ্য করেন নি। তিনি তাঁর সঙ্গে আসা ছোট ছেলেটির হাত থেকে পানের বাটাটি নিয়ে বিষ্ণুপ্রিয়ার সামনে রেখে বললেন,

"লক্ষ্মীর বিয়ের খবর পেয়েছেন নিশ্চয়ই। মাঘ মাসের পনের তারিখে বিয়ের দিন ঠিক হয়েছে। আপনাদের বিয়েতে নিমন্ত্রণ করলাম।" শর্মাগিন্নির মুখে আনন্দ ও গর্বের হাসি ফুটে উঠল। আজ তাঁর কথাবার্তার মধ্যে যেন এক নতুন আত্মবিশ্বাস ফুটে উঠেছে। কিন্তু বিষ্ণুপ্রিয়ার মন্তব্য যেন তাঁর উৎসাহে কিছুটা ঠান্ডাজল ঢেলে দিল।

"খুব ছোটবেলায় বিয়ে দিতে চাইছ। তাছাড়া লক্ষ্মীর পড়াশুনোতে ও মনোযোগ ছিল। আজকাল সবাই মেয়েদের উপযুক্ত শিক্ষা - দীক্ষা দেবার কথাই বলে। আমাদেব দিন অন্যরকম ছিল।

"ছোট বলেই বা কি করে বলছি? দশ বছরে পা দিলেই মেয়েরা বড় হয়ে যায়। দুই — এক — বছরের মধ্যেই ঋতুমতী হবে। মেয়েদের পড়ার কথা ভাবলে বিয়ের বয়স চলে যাবে। আপনাদের স্বর্ণ কেও তো দু — এক — বছরের মধ্যে বিয়ে দিতে হবে, নাকি? ঠিক সময়ে বিয়ে দিতে না পারলে গোটাসমাজ আমাদের ছি - ছি করবে।"

"স্বর্ণর বিয়ের কথা আমরা ভাবিইনি। ওর বাবার ইচ্ছে পড়াশুনো করে স্বর্ণ বড় হোক্। কপালে বিয়ে যে সময় লেখা আছে তখনই হবে," বিষ্ণুপ্রিয়া আস্তে আস্তে বললেন। শর্মা গিন্নী চক্ষু স্থির করে মাথা দোলাতে লাগলেন। কিন্তু হাকিমগিন্নীর কথা যে তাঁর একেবারেই মনঃপুত হয়নি সেটা তাঁর ভাবভঙ্গীতে প্রকাশ পেল। অবশ্য মুখে প্রতিবাদ করার সাহস পেলেন না। হাকিমের বাড়ির সম্পর্কে নোংরা কথা - বার্তা তিনি অনেকই

শুনেছেন। এমনকি মহিলা মহলে তাঁর একথাও কানে এসেছে যে বিষ্ণুপ্রিয়াকে একজন পতিতা নারী মনে করা হয়। কিন্তু বিষ্ণুপ্রিয়ার সুন্দর চেহারা, সুরুচিপূর্ণ সাজ - পোষাক আর তাঁর চলনবলনে যে গাম্ভীর্য ফুটে ওঠে তার সামনে কোনো ধরনের কুৎসাই যেন দাঁড়াতে পারে না। ক্ষণকালের জন্যে শর্মাগিন্নীর মনে সব এলোমেলো হয়ে যায়। কোন্‌টা ভালো, আর কোন্‌টা খারাপ? কিন্তু গভীরভাবে এই সব কথা চিন্তা করার ক্ষমতা তাঁর নেই। সমাজের বেশির ভাগের মতই তাঁর মত। তিনি তাই চটপট বিষ্ণুপ্রিয়ার এগিয়ে দেওয়া তামোল পাত্র তুলে নিয়ে চলে যেতে উদ্যত হলেন। বিষ্ণুপ্রিয়া দূর থেকেই দেখতে পেলেন শর্মাগিন্নী ঘাসের ঝোঁপের মধ্যে কিছু একটা ছুঁড়ে দিলেন। তাঁর যেন মনে হল এ তাদেরই দেওয়া তামোল।

বিষ্ণুপ্রিয়া অনেকক্ষণ বারান্দায় স্থির হয়েরইলেন। শর্মাগিন্নির মতো কারো সঙ্গে দেখা হলে বিষ্ণুপ্রিয়ার নিজের অতীতের কথাই মনে পড়ে। বর্তমান তাঁর কাছে অত্যন্ত মূল্যবান্। গুণাভিরামের হাত ধরে তিনি এক উদার পৃথিবীর দিকে - অনেকখানি এগিয়ে এসে ছেন। আরও অনেকদূর তাঁকে এখনো যেতে হবে। তাঁর স্বর্গীয় স্বামী পরশুরাম বরুয়ার কাছে ও তিনি যথেষ্ট আদর যত্ন পেয়ে ছিলেন। কিন্তু তখনও তাঁর মনটা পঞ্চানন শর্মার গৃহিনীর মতোই এক সংকীর্ণ গন্ডীর মধ্যে আবদ্ধ ছিল এবং তিনি নিজে তাঁর সেই সীমাবদ্ধতা সম্পর্কেও ছিলেন অজ্ঞ। অথচ সেই অজ্ঞতার মাঝে ও তিনি বেশ আনন্দেই ছিলেন। কথাগুলো চিন্তা করলেই তাঁর এখন হাসি পায়। দেখ তো, এই জ্ঞানের অলোক পাবার জন্যে তাঁকে অনেক মানসিক অশান্তির মাঝখান দিয়ে যেতে হচ্ছে। কিন্তু, কী আশ্চর্য। এই অশান্তিরই মধ্যে বেঁচে থাকতেই যেন আসল তৃপ্তি।

চৌদ্দ

বড়দিনের পরপরই ব্রাহ্মদের মাঘোৎসব। রাজা রামমোহন রায়ের ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠার দিনটার কথা স্মরণ করে প্রতি বছর মাঘ মাসের এগারো তারিখে অতি আনন্দের সঙ্গে এই উৎসব পালন করা হয়। নাগাঁওর ব্রাহ্মদের মধ্যে বেশিরভাগ বাঙালিই দীর্ঘদিন ধরে অসমবাসী হওয়ার ফলে তাঁদের কথাবার্তা অসমীয়াদের মতই হয়ে গেছে। বিবাহ এবং উচ্চশিক্ষার মাধ্যম হিসেবে অবশ্য কলিকাতার সঙ্গে তাঁদের সুদৃঢ় সম্পর্ক আছে। মাঘোৎসবের আয়োজনেও তাঁরাই প্রধান ভূমিকা নেন আর সেই কারণেই গান - বক্তৃতা সবই বাংলা ভাষায় হয়। গুণাভিরাম বড়ুয়ার বড় ইচ্ছে অসমীয়ারা ব্রাহ্মসমাজের আপন হয়ে উঠুক্। সেইজন্যে এইসব মাঘোৎসব অনুষ্ঠানে তিনি অসমীয়া ধর্মসঙ্গীত পরিবেশণের ব্যবস্থা করেছেন। গুরুনাথ দত্ত ও আরও কয়েকজন বাঙালী ভদ্রলোক এই ব্যাপারে আনন্দের সঙ্গে সম্মতি জানালেন। গড়মূর সত্রের শিষ্য চন্দ্রকান্ত মহন্ত চমৎকার বরগীত গাইতে

পারেন। নগাঁওয়ের সবাই জানে। তাঁকে গুণাভিরাম মাঘোৎসবের দিন দুখানি বরগীত গাইতে অনুরোধ করলেন। মহন্ত তৎক্ষণাৎ সম্মতি জানালেন এবং সেই সঙ্গে নিজের থেকেই স্বর্ণ ও অন্য একটি বাঙালী মেয়েকে একটি বরগীত শিখিয়ে দেবার দায়িত্ব নিলেন।

বড়দিনের পর থেকেই স্বর্ণ তাই খুব ব্যস্ত। একদিকে বরগীতের মহলা আর অন্য দিকে নতুন গৃহশিক্ষক রজনীনাথ দাসের কাছে একই সঙ্গে অঙ্ক আর ইংরাজি শেখা। রজনীনাথ দাস বড্ড একরোখা মানুষ। পঞ্চানন শর্মা পড়ানোর সময় স্বর্ণ কখনো কখনো ঘুমিয়েও পড়ত। কিন্তু এখন একটু অন্যমনস্ক হলেই রজনীবাবু সশব্দে বইটি বন্ধ করে বলে ওঠেন, "পড়ায় যদি মন নেই তাহলে যাও — বাবাকে বলো, বর একটা খুঁজে দিতে। কাঁদতে কাঁদতে 'শ্বশুরবাড়ী' যাবে।"

স্বর্ণর কাছে এর চেয়ে কঠিন শাস্তি কল্পনারও অতীত। মুহূর্তের মধ্যে তার চোখ ছল্ ছল্ করে ওঠে, গালমুখ লাল হয়ে যায়। রজনীবাবুর মন দুঃখে ভরে ওঠে। কিন্তু ছাত্রীকে তিনি লাই দিতে চান না। ফলে পুনরায় পাঠদান আরম্ভ হয়। স্বর্ণর মধ্যে রজনীবাবু যথেষ্ট মেধার পরিচয় পান। এই মেয়েটি উপযুক্ত সুযোগ সুবিধে পেলে নিশ্চয়ই একদিন অসমের মধ্যে প্রথম এন্ট্রান্স পাশ করা মেয়ে হিসেবে পরিচিতি পাবে — এই তাঁর বিশ্বাস।

বড়দিনের উৎসব শেষ হওয়ার পরে স্বর্ণর আরও একটি কাজ বেড়েছে। বড়দিনে উপহার পাওয়া সেই সূঁচ সুতোর বাক্সটি তাকে অন্য এক নতুন আনন্দের সন্ধান দিয়েছে। এখন একটু অবসর পেলেই সে রুমালে ফুল তুলতে বসে। বিষ্ণুপ্রিয়া অশেষ ধৈর্যে তাকে সেলাই শেখাচ্ছেন। মেয়েকে যখন তিনি ছোট ছোট আঙ্গুলগুলি দিয়ে সূঁচসূতোর সঙ্গে যুদ্ধ করতে দেখেন তখন তাঁর মাতৃহৃদয় ভালোবাসায় ভরে যায়।

দেখতে দেখতে মাঘোৎসবের দিনটি এসে পড়ে। ভোরবেলা থেকেই ব্রাহ্মমন্দির প্রাঙ্গনে মানুষের হুলস্থূল পড়ে যায়। মন্দিরের বাইরে সামিয়ানা টাঙিয়ে নিমন্ত্রিত ব্যক্তিদের বসতে দেওয়া হয়েছে। নিমন্ত্রিত সকলের মধ্যে নগাঁওর ব্রাহ্মদের বাইরেও বেশকিছু হিন্দু, মুসলমান ও খ্রিস্টান লোক ও আছেন। সকলকে চেয়ারে বসতে দেওয়া হয়েছে। মন্দিরের প্রাঙ্গনে জুতো পরে ঢোকাতে কোনো বাধা নেই। ভারতীয়দের মধ্যে অবশ্য কেউ কেউ জুতো প্রবেশদ্বারের মুখে খুলেও ভেতরে যাচ্ছেন।

অনুষ্ঠান শুরু হল ধর্ম গ্রন্থ পাঠের মধ্য দিয়ে। বেদ, উপনিষদ, কোরান আর বাইবেল থেকে অংশবিশেষ পাঠ করার পরে ধর্ম সঙ্গীত শুরু হল। প্রথমেই বিষ্ণুচন্দ্র চক্রবর্তীর কয়েকটি বিখ্যাত বাংলা ব্রাহ্মসঙ্গীত সমবেত কণ্ঠে সুন্দরভাবে গাওয়া হল। তারপরে ব্যাপ্টিস্ট মিশনের ছোট ছোট কয়েকটি ছেলে ডেভিডের 'সাম' (psalm - ধর্মসঙ্গিত) দু - একটা গাইল। চন্দ্রকান্ত মহন্ত, স্বর্ণ আর বাঙালি মেয়ে রাণু বরগীত আর ঘোষা গেয়ে দর্শকদের মুগ্ধ করে ফেলল। মহন্ত নিজে খোল বাজিয়ে যখন "শুন শুনরে সুর বৈরী প্রশামা" গাইলেন, তখন সভার সকলে সমস্বরে "সাধু সাধু" বলে প্রশংসা করে উঠলেন। সভার বেশিরভাগ লোকেই আগে কোনদিন বরগীত শোনেনি। অসমীয়া ভাষাতে এমন

সুমধুর ধর্মসঙ্গীত আছে জানতে পেরে তাঁরা অবাক্ হলেন। সবশেষে স্বর্ণ আর রাণু - পাটের রিহা মেখেলা পরে যখন খোলের তালে তালে ছন্দ মিলিয়ে "হরি নাচে কৃষ্ণ" গেয়ে শোনাল তখন গুণাভিরাম আর বিষ্ণুপ্রিয়া আনন্দে ও গর্বে আত্মহারা হয়ে গেলেন। তাঁদের এই আনন্দ শুধু নিজের মেয়ের প্রশংসা শুনে নয়, তার সঙ্গে আরও যা ছিল তা হল এত লোকের সামনে অসমীয়া সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের পরিচয় দেওয়ার জন্যেও তাঁদের মনে একধরণের জাতীয় গর্বের ভাব ফুটে উঠল।

মাঘোৎসবের দিন ব্রাহ্মরা সকলে একসঙ্গে বসে চা - জলখাবার খান। পরিবেশন করা এবং খাওয়ার মধ্যে কোনরকম জাতপাত বা উচুঁ নিচুর ভেদাভেদ থাকে না। আনন্দ-ফূর্তি করে সবাই একসঙ্গে খান। বিষ্ণুপ্রিয়ার কাছে এই পরিবেশ এখনো অভিনব। রক্ষণশীল ব্রাহ্মণ পরিবারের কঠোর নিয়ম কানুনের মধ্যে বড় হওয়া বিষ্ণুপ্রিয়ার কাছে এরকম এক মুক্ত উদার পরিবেশ সত্যিই অপূর্ব। কিন্তু ধীরে ধীরে এই উদার সমাজের সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নেওয়ার ফলে তাঁর মনের পূর্বের সংকোচ আর ভয় অনেকখানি দূরে সরে গেছে। এখনও অবশ্য তাঁর মনের কিছু কিছু ধ্যান ধারণার কোন পরিবর্তন হয়নি। যেমন ব্রাহ্মণের বাইরে অন্য কারও রেঁধে দেওয়া ভাত তিনি আজও খাননি। হয়ত পরিস্থিতি বাধ্য করলে তিনি খেতে ও পারতেন। কিন্তু 'আদি' ব্রাহ্মসমাজের সভ্যদের মাঝে কিছু কিছু ধারণা এত গভীরভাবে মনের মধ্যে গেঁথে আছে যা জাতপাত সম্পর্কে কিছু ভেদাভেদ পুষে রাখতে সহায়তা করেছে। গুণাভিরামের সবথেকে অন্তরঙ্গ বন্ধুরা যদিও এইসব ধারণার পরিপন্থী, তথাপি তিনি নিজে এখনো পর্যন্ত কেশবচন্দ্রের নতুন ধ্যান্‌ধারণার সঙ্গে একাত্ম হতে পারেন নি। সেই জন্যেই তিনি বিষ্ণুপ্রিয়ার কোন কোন বিশ্বাসের ক্ষেত্রে বাধা ও দিতে চান নি।

পনের

মাঘোৎসবের কয়েক দিন পরেই লক্ষ্মীর বিয়ের তারিখ। স্বর্ণ খুব আগ্রহভরে দিনটির পথ চেয়ে আছে। এর আগে সে কোনদিন কোনো বিয়েবাড়ির ভোজ খায়নি। তার সঙ্গে থাকা 'আপী' তাকে মুখের ভাষায় বিয়ে কিরকম ভাবে হয় সে সম্পর্কে বুঝিয়ে বলেছে। এমনিতে বিষ্ণুপ্রিয়া স্বর্ণর বেশির ভাগ প্রশ্নের উত্তর দিতে পারেন। কিন্তু বিয়ের প্রসঙ্গে তিনি স্বর্ণকে কিছুই বলতে চান না। তাই এ সম্পর্কে অনেক প্রশ্নের সমাধান না পেয়ে অবশেষে স্বর্ণকে হতাশ হয়ে 'আপীর' শরণাপন্ন হতে হয়।

নগাঁও তে আসার পরে দুই - একটি ব্রাহ্ম পরিবারের বিয়েতে বিষ্ণুপ্রিয়া আর গুনাভিরাম গেছেন। কিন্তু ব্রাহ্মন পরিবারের বিয়েতে কখনো যান নি। পুরনো নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণরা তাদের বিবাহ অনুষ্ঠানে ডাকেন না, কারন ব্রাহ্মধর্মের লোকদের অনেকে খ্রিস্টান বলেই

মনে করেন। তাই পঞ্চানন শর্মার মেয়ের বিয়ের নিমন্ত্রন পেয়ে গুনাভিরাম আশ্চর্য হয়েছিলেন। তাঁর মনে হল হয়ত মানুষটি উদার মানসিকতার বলেই তাঁদের নিমন্ত্রন করেছেন। তবু ও স্ত্রীকে বিয়েতে পাঠাতে তাঁর কিছুটা দ্বিধা ছিল। কিন্তু সেদিন তিনি একটু অসুস্থ ছিলেন, ঠান্ডা লেগে সামান্য জ্বর হয়েছিল। মা ও মেয়েকে সাজগোজ করে বেরোতে দেখে তিনি একটু চিন্তিতভাবে বললেন,

"ঘোড়ার গাড়িটি বিয়েবাড়ির গেটের বাইরে অপেক্ষা করবে। যদি কোন অসুবিধে হয় তাহলে সঙ্গে সঙ্গে চলে আসবে।"

বিষ্ণুপ্রিয়া একটু অবাক্ হয়ে স্বামীর দিকে চাইলেন। হঠাৎ তাঁর কেন এই সতর্কীকরণ তা তিনি বুঝতে পারলেন না। গুনাভিরাম আর কিছুই বললেন না। কিন্তু বিষ্ণুপ্রিয়া লক্ষ্মীকে দেবার জন্য নতুন সোনার হারটি যখন রুমালে বেঁধে নিচ্ছিলেন তখন তাঁর মনে কিছু একটা ঘটতে পারে এমন একটা খুঁত খুঁতুনি থেকে গেল। অথচ খোলাখুলিভাবে স্বামীকে কিছু জিজ্ঞেস করতে ও তাঁর ইচ্ছে হল না। কিছু বিশেষ কথা থাকলে স্বামী তাকে নিশ্চয়ই বলতেন একথা চিন্তা করে তিনি স্বর্ণকে নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন। কলিকাতা থেকে বাবার এনে দেওয়া গোলাপী রঙের সিল্কের ফ্রক পরে স্বর্ণ প্রজাপতির মতো আনন্দে যেন উড়তে লাগল। ফ্রকটা যে তাকে খুবই সুন্দর মানিয়েছে একথা ঘরের সবাই ওকে বলেছে। ফলে তার চোখ মুখ আনন্দে ঝলমলে। মেয়ের শিশুসুলভ মুখখানির দিকে তাকিয়ে বিষ্ণুপ্রিয়ার মনে কেমন জানি কষ্ট হয়। যার বিয়ের নিমন্ত্রনে তাঁরা যাচ্ছেন তার বয়স স্বর্ণর থেকে বেশি নয়। সেই বা বিয়ের অর্থ কি বুঝেছে কে জানে?

বিয়েবাড়ি গিয়ে পোঁছানোর সঙ্গে সঙ্গে কয়েকজন মহিলা বিষ্ণুপ্রিয়াকে শশব্যস্ততার সঙ্গে ডেকে নিয়ে একটি অব্যবহৃত বাঁশের আসনে সম্পূর্ন আলাদা করে বসতে দিয়ে পানের বাটাতে তামোন পান এগিয়ে দিয়ে অভ্যর্থনা জানালেন। তাঁদের দেখতে পেয়ে বধূর বেশে সজ্জিতা লক্ষ্মী বিয়ের মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানের জায়গা থেকে লাফ দিয়ে উঠে এসে স্বর্ণের গলা জড়িয়ে ধরল। বিষ্ণপ্রিয়া তাকে সোনার হারটি দিয়ে থুতনিতে হাত রেখে আদর করলেন। দুজন মেয়ে তাকে ধরে নিয়ে আবার বিয়ের জায়গাতে বসিয়ে দিল। স্বর্ণ গিয়ে বসল তার কাছে। পাটের রিহামেখলা আর সিঁদুরের টিপটি যে একটি মেয়ের চেহারাতে এত পরিবর্তন এনে দিতে পারে স্বর্ণর বিশ্বাসই হচ্ছিল না। সে অবাক হয়ে লক্ষ্মীর মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

এদিকে এয়োরা বিয়ের গান গাইতে লাগলেন। বিষ্ণুপ্রিয়ার মনে পড়ে গেল পুরনো দিনের কথা। প্রথম বিয়ের সময়ে তাঁর বয়স লক্ষ্মীর মতোই ছিল। বিয়ের দিনটির কথা তাঁর অস্পষ্টভাবে মনে আছে। খিদে তেষ্টায় অনিদ্রায় আর ক্লান্তিতে ভেঙে পড়ার কথা ছাড়া আর বিশেষ কিছুই তাঁর মনে পড়ে না। বর কে ছিলেন, কি পরেছিলেন, কখন এসেছিলেন এবং বিয়েই বা কিরকমভাবে হয়েছিল এসব কিছুই তাঁর মনে নেই শুধু ঢুলুনির মধ্যে আগুনের শিখা আর সবাই যে তাঁকে টানাটানি করে নিয়ে বিয়ের সব করণীয় করিয়ে

নিচ্ছিল সেটুকুই তাঁর মনে পড়ে। সেই সময়ে ভবিষ্যৎ জীবনের কথা তিনি একবার ও চিন্তা করেন নি। যে যা করতে বলেছিল তিনি শুধুমাত্র তাই করে যাচ্ছিলেন। বিয়ের পরে স্বামীর বাড়িতে তিনি শুধু অন্যের নির্দেশই পালন করে গেছেন। স্বামী শ্বশুর এবং শাশুড়ীর বাধ্য থাকার জন্যে পারিবারিক জীবনে তাঁর কোন অশান্তি ছিল না। কিন্তু স্বামী পরশুরাম বড়ুয়ার মৃত্যুর পরে সবকিছুই যেন ওলটপালট হয়ে গেল। দুটি ছোট ছোট মেয়েকে বুকে নিয়ে কঠিন বিধবার ব্রত পালন করে যখন তিনি ক্লান্ত, অবসন্ন, ঠিক তখনি একদিন স্বামীর পুরনো বন্ধু গুণাভিরাম তাঁকে এক নতুন জীবনের সন্ধান দিয়েছিলেন। প্রথমে প্রস্তাব শুনে ভয়ে তিনি শিউরে উঠেছিলেন। কিন্তু গুণাভিরাম তাঁকে বিদ্যাসাগরের মহান্ বাণী গুলির তাৎপর্য বুঝিয়ে বলবার পরে তাঁর মনের পরিবর্তন হয়েছিল। স্বামীরূপে পাওয়ার অনেক আগেই তিনি গুণাভিরামকে বন্ধু আর পদ প্রদর্শক রূপে চিনতে পেরেছিলেন। গুণাভিরামই তাঁকে প্রথম সামাজিক অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে শিখিয়েছিলেন — কেবলমাত্র যুক্তিতর্ক দিয়ে বুঝিয়ে নয়, নিজের জীবনে সাহসের সঙ্গে তিনি বিষ্ণুপ্রিয়াকে বিধবা বিবাহ করে দেখিয়েও দিয়েছিলেন। বিষ্ণুপ্রিয়ার ভাবতে আশ্চর্য লাগে, তাঁর মত একজন দূর্বল, ভীরু রমনী কেমন করে গোটা সমাজের বিরুদ্ধে গিয়ে দ্বিতীয়বার বিয়ে করতে সাহস পেলেন? বিয়ের গান শুনতে শুনতে এইসব চিন্তাতে তিনি ডুবে ছিলেন। ঠিক এমনি সময়ে স্বর্ণের হাতের স্পর্শ পেয়ে তিনি চমকে উঠলেন।

"কি হল সোনামা?"

স্বর্ণ ফিস্‌ফিস্ করে মাকে সুধোল "দেখ না মা, সবাইকে ভেতরে ডাকছে অথচ আমাদের ডাকছে না।"

বিষ্ণুপ্রিয়া কিছুটা বিরক্তির সঙ্গে স্বর্ণকে বলে উঠলেন "সময় হলেই ডাকবে, এত লোভ ভাল নয়, সোনামা।" কথা বলতে বলতেই অবশ্য বিষ্ণুপ্রিয়া সামিয়ানার দিকে তাকিয়ে আশ্চর্য হয়ে দেখলেন এ বাড়ির জনা কয়েক বাদে নিমন্ত্রিতরা সকলেই বাড়ির ভেতরে গেলেন। দূর থেকে কনের কাকীমা এবং পিসিমাকে তাঁর দিকে চেয়ে কিছু একটা জটিলসমস্যা আলোচনা করতে দেখতে পেলেন। তাঁর চোখে চোখ পড়তে তাঁরা দূরে চলে গেলেন। বিষ্ণুপ্রিয়ার অস্বস্তি হতে লাগল। একটু পরে কৃষ্ণ পুরোহিতের স্ত্রী দেবেশ্বরী ভেতর থেকে এসে তাঁর কাছাকাছি বসলেন। কিন্তু যেন তাঁর মধ্যে একটা দোষী দোষীভাব ফুটে উঠল। আড়চোখে বিষ্ণুপ্রিয়ার দিকে তাকাতে চোখের ইঙ্গিতে তাঁকে তিনি কাছে ডাকলেন। দেবেশ্বরী কাছে এলে বিষ্ণুপ্রিয়া আস্তে আস্তে বললেন,

"অনেকক্ষণ বসলাম। উঠব বলে ভাবছি। মেয়ের মাকে ডেকে আনো তো।" দেবেশ্বরী চোখ দুটি বড়ো করে আশ্চর্য হওয়ার মতো করে বলে উঠলেন,

"আপনি মুখে কিছু না দিয়ে যদি চলে যান তাহলে এরা যে দুঃখ পাবে দিদি। আপনি এসেছেন বলে এরা কত আনন্দ পেয়েছে। শুধু ভেতরে বসতে দেওয়া নিয়ে একটু সমস্যা হয়েছে। ব্রাহ্মণ সধবাদের সঙ্গে আপনাকে বসাতে পারেনা, আবার বিধবাদের সঙ্গেই বা

আপনাকে কি করে বসাবে কারণ তা আপনাদের ধর্মের বিরুদ্ধে যাবে। লোকেরা যে ভীষণ দোষ ধরে — ''

দেবেশ্বরীর কথা শেষ হবার আগেই বিষ্ণুপ্রিয়া ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ালেন। এক হাতে চাদরের আঁচল খামচে ধরে অন্যহাতে স্বর্ণর একখানি হাত চেপে ধরে বিয়ের প্যান্ডেল পেরিয়ে হাঁটতে শুরু করলেন। বিবাহমন্ডপে হুড়োহুড়ি পড়ে গেল। বিয়ের কনে ''স্বর্ণরা চলে গেল'' বলে হাউমাউ করে কাঁদতে শুরু করল। কনের মা এবং আরও দুইজন বয়স্ক মহিলা বিষ্ণুপ্রিয়াকে হাতজোড় করে ফিরে আসার জন্যে অনুরোধ জানালেন। কিন্তু বিষ্ণুপ্রিয়া ফিরে গেলেন না। তিনি নিজেকে অতিকষ্টে সংযত করে বললেন যে বিয়েবাড়িতে খাওয়া দাওয়া করার অভ্যেস তাঁর নেই তিনি শুধু কনেকে আশীর্বাদ দিতেই এসেছিলেন। কথাগুলি বলে তিনি সংযত ভাবে হেঁটে ঘোড়ার গাড়িতে উঠলেন। ঘোড়ার গাড়ি চলতে শুরু করার পরও তিনি তার হাতের মুঠো আলগা করলেন না। এতক্ষণ ধরে তিনি যে তার হাতখানি জোরে চেপে রেখেছেন একথা তাঁর মনে পড়ল না। হাতে ব্যথা হচ্ছে বলে স্বর্ণর চোখ দিয়ে জল বেরিয়ে এল। কিন্তু ঘোড়ার গাড়ি চলতে শুরু করার সঙ্গে সঙ্গে মায়ের চোখ দিয়ে যে অশ্রুর স্রোত নেমে এল, তা দেখে সে হতভম্ব হয়ে গেল। মাকে এরকমভাবে কাঁদতে সে বহুদিন দেখেনি। ঘটনা কী হল সে কিছুই ধরতে পারল না। কিন্তু সে লোভীর মতো জলপান খাওয়ার বায়না ধরাতেই যে এরকম হল তা সে অনুমান করতে পারে। সে শোকে বিহ্বল হয়ে গেল। মাকে জড়িয়ে ধরে সে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে বলে উঠল,

''আমি আর কখনো বিয়ের জলপান খাওয়ার জন্যে বায়না ধরব না, মা। তুমি আর এরকমভাবে কেঁদো না।''

মেয়ের কথা শুনে বিষ্ণুপ্রিয়া আর নিজেকে সংবরণ করতে পারলেন না। মেয়ের চুলের মাঝখানে মুখখানি ডুবিয়ে তিনি ভাঙা ভাঙা স্বরে বললেন,

''সোনামা, এরকম বিয়েবাড়িতে আমরা আর কখনো যাবো না। আমরা ভালো বিয়ে বাড়িতে যাবো যেখানে কেউ কাউকে ঘৃণা করে না।''

বাড়ির সামনে এসেই বিষ্ণুপ্রিয়ার মনে পড়ে গেল যাবার সময় স্বামী কি বলেছিলেন। তার মানে তিনি আগে থেকেই অনুমান করেছিলেন যে এরকম একটা কিছু ঘটতে পারে। স্বামীকে কাছাকাছি দেখতে পেয়েই বিষ্ণুপ্রিয়া ফুঁপিয়ে বলে উঠলেন ''আপনি জেনেশুনে কেন আমাকে সেখানে যেতে দিলেন?''

স্ত্রীর মুখের দিকে তাকিয়েই গুণাভিরাম সব কথা বুঝতে পারলেন। তাঁর মুখেতে গভীর বেদনার ছাপ ফুটে উঠল। দীর্ঘশ্বাস ফেলে তিনি বললেন, ''ভেবেছিলাম, সমাজের কিছু কিছু পরিবর্তন হয়েছে। পঞ্চানন শর্মা শিক্ষিত লোক। আশা করেছিলাম তাঁর বাড়িতে সংকীর্ণতা কম হবে। তাই তোমাকে সব জেনে শুনেও যেতে দিয়েছিলাম। কিন্তু আমার ধারনা ভুল। ভবিষ্যতে আর কখনো এরকম বিয়েবাড়িতে যাবে না। স্বর্ণকে ও

যেতে দেবে না। সে মনে বড়ো আঘাত পাবে।

"বেচারী আজ কান্নাকাটি করে আকুল হয়ে আছে। সে কিছুই বুঝতে পারেনি। আর কতদিন তার কাছ থেকে এসব কথা লুকিয়ে রাখব?"

"লুকোনোর কোন দরকার নেই। আমরা কোন খারাপ কাজ করিনি। শাস্ত্রের বিধানমতে আমরা বিয়ে করেছি। আমাদের মনে কোন পাপবোধ নেই। সমাজের সংকীর্ণতা আমাদের যত আঘাত দেবে ততই আমাদের মনের জোর আর আত্মবিশ্বাস বাড়বে। ছেলে মেয়েরা বড়ো হলে আমি তাদের সব কথা বুঝিয়ে বলব।"

"তারা আমাদের কথা সঠিক বলে মানবে তো?"

"আমরা যদি তাদের সামনে সৎআদর্শ তুলে ধরতে পারি তাহলেই তারা বুঝতে পারবে সমাজের কি ভালো আর কি খারাপ। সেইজন্যে দরকার তাদের উপযুক্ত শিক্ষা আর উদারমনা লোকের সঙ্গ।"

"আমাদের অসমে সেরকম লোক নেইই। নিজের আত্মীয় স্বজনেরাই আমাদের মেনে নেয়নি। বন্ধু বান্ধবদের মাঝখানে ব্রাহ্মরা ছাড়া আমাদের বুঝতে পারে এমন মানুষই বা আর কে আছে?" বিষ্ণুপ্রিয়া কথাগুলি হতাসার সুরে বলেছিলেন। গুণাভিরাম কিছুক্ষণ চুপচাপ রইলেন। আজ কিছুদিন থেকেই তাঁর মনে একটি নতুন চিন্তা ঢুকেছে। যদিও স্ত্রীর সামনে খোলাখুলিভাবে কথাটা বলতে তিনি সাহস পাননি। তাঁর মতো একজন আশাবাদীর মনে এরকম ভাব আসাটাই যে একরকমের পরাজয় এ ব্যাপারে তিনি সচেতন। তবুও আজ তিনি হঠাৎ বিষ্ণুপ্রিয়ার সামনে নিজের মনের আশঙ্কা প্রকাশ করে ফেললেন,

"আমি ও চিন্তায় আছি। শেষে আমাদের দেশান্তরী হতে হবে নাকি? অসমের ভদ্র এবং ভালো মানুষেরা আমাদের কোনদিনই গ্রহণ করবে না। এখানে আমরা মারা গেলে আমাদের শবদাহ করবার লোক ও হয়ত পাওয়া যাবে না।" গুণাভিরাম হাসতে চেষ্টা করলেন। কিন্তু সেই হাসির মধ্যে বিষ্ণুপ্রিয়া রূঢ় বাস্তবের ছবি স্পষ্ট দেখতে পেলেন। অদূর ভবিষ্যতে অসমীয়া সমাজের পরিবর্তন হওয়ার কোনো লক্ষণই নেই। সেরকম ক্ষেত্রে নিজের জন্যে না হলেও অন্ততঃ ছেলে মেয়েদের কথা বিবেচনা করে সেই জায়গাতেই যেতে হবে যেখানে তাদের কথা চিন্তা করার অনেক লোক আছে। বিষ্ণুপ্রিয়া ও গুণাভিরাম আজকাল প্রায়ই কলিকাতা সম্পর্কে আলোচনা করেন। সেই বিচিত্র মহানগরী যেন তাঁদের হাতছানি দিয়ে ডাকছে। কিন্তু নিজের দেশের মাটির কথা ভুলে এখনো তাঁরা সেই ডাকে সাড়া দিয়ে উঠতে পারেন নি। এখনো এই মাটি থেকে শেকড় ছিঁড়ে নেওয়ার মতো মানসিক দৃঢ়তা তাঁদের গড়ে ওঠেনি।

ষোল

তারা পরীক্ষার খবর পেয়েই বিল্বকুটীরে যাওয়ার জন্যে উৎসুক হয়ে ছিল। সে নগাঁওর সব মেয়েদের মধ্যে দ্বিতীয় হয়েছে। প্রথম হয়েছে বাংলাস্কুলের একজন ছাত্রী। সুখবরটা পেয়েই বিষ্ণুপ্রিয়া তারাকে কাছে ডেকে তার গালে - মাথায় হাত বুলিয়ে আশীর্বাদ করলেন। বিষ্ণুপ্রিয়ার অসাধারণ ব্যক্তিত্ব এবং স্নেহের পরশ লাগা কথাবার্তা তারার খুব ভালো লাগে। মিশনারী সাহেবমেমদের প্রতি ও তারার অগাধ শ্রদ্ধা - ভক্তি আছে। কিন্তু গুণাভিরাম বরুয়া ও বিষ্ণুপ্রিয়াকে তার যেন বেশি আপন মনে হয়। তাঁদের সামনে নিজের আচার ব্যবহার নিয়ে সবসময় সচেতন না থাকলেও চলে। তাঁরা যেন তারই জগতের লোক, সাহেবদের মতো স্বর্গের তারা নয়।

স্বর্ণ দৌড়ে গিয়ে বাবাকে তারার খবরটা দিল। গুণাভিরাম তারাকে নিজের পড়ার ঘরে ডেকে পাঠালেন এবং সে ভবিষ্যতে কি করবে সে সম্বন্ধে দু - একটি কথাও জিজ্ঞেস করলেন। তারা তৎক্ষণাৎ উত্তর দিল, ‘‘আমি নর্ম্যাল স্কুলে পড়ব। তারপরে বালিরামের স্কুলে পড়াতে যাবো।’’

তার সিদ্ধান্ত শুনে গুণাভিরাম প্রশংসা করে বললেন,

‘‘তোমার মতো আমাদের প্রত্যেকটি মেয়েরই জীবনে যদি একটা স্থির লক্ষ্য থাকত তাহলে আমাদের অসমীয়া জাতি হয়ত অনেকদূর এগিয়ে যেতে পারত। কিন্তু আমাদেরই দোষ, আমরা আমাদের মেয়েদের শুধু ঘর সংসারের কাজে উপযুক্ত করে তুলতেই জোর দিই। তাদের মনে অন্য কাজকর্মের চিন্তা আসতে দিই না।’’ এই বলে তিনি বইয়ের আলমারী থেকে একটি বই খুঁজে পেতে বের করে আনলেন। বইটি ছিল ব্রণসনের লেখা ‘‘অসমীয়া অভিধান।’’ বইটি খুলে নিয়ে প্রথম পাতাতে তিনি সুন্দর অক্ষরে লিখলেন, ‘‘কল্যানীয়া তারাকে, উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ কামনায়, গুণাভিরাম বরুয়া।’’ কাগজে বইটি মুড়ে তিনি তারার হাতে দিয়ে বললেন, ‘‘এর চেয়ে ভালো উপহার আর তোমাকে দেবার মতো আমার কিছুই নেই। এই বইখানি যে মহাপুরুষ লিখেছেন তুমিও যেন তাঁর আদর্শে অনুপ্রানিত হয়ে দেশের লোকের জন্য ভালো কাজ করতে পারো।’’

তারা বইটি হাতে নিয়ে শ্রদ্ধার সঙ্গে মাথা নোয়াল। গুণাভিরাম বরুয়ার কথাগুলির অর্থ সে ভালো করে বুঝতে না পারলেও সেই মুহূর্তোটির গোটা পরিবেশটাই তার মনে গভীর রেখাপাত করল। সে যেন আর দশটি মেয়েদের মতো নয়। গুণাভিরাম বরুয়া, ব্রণসন্ সাহেব, মিস্ অরেল কীলার, সকলেই তার কাছে অনেক কিছু আশা করেন। তাকে সেইসব আশা পূরণ করতে হবে। ‘বিল্বকুটীর’ থেকে সেইদিন চলে যাওয়ার সময় এক নতুন দায়িত্বভার তার পদক্ষেপকে গম্ভীর করে তুলল।

নর্ম্যাল স্কুলে ভর্তি হওয়ার পর থেকেই তারার বেশ ভূষার একটু পরিবর্তণ এসেছিল। রঙিন মেখেলা আর ‘জ্যাকেট’ — এর সঙ্গে সে এখন একটি চাদরও নেয়। সুতী কাপড়ের

চাদরটি সে পরিপাটি করে বাহুর ওপরে একটি 'ব্রোচপিন' বসিয়ে দেয়। এরকমভাবে চাদর নেওয়ার নিয়মটি নতুন। সাধারণতঃ স্বর্ণ খ্রিস্টান মেয়েদেরই এরকম ভাবে চাদর নিতে দেখেছে। অসমীয়া যুবতী মেয়েরা সাধারণত রিহা - মেখেলা পরে। বিবাহিত মহিলারা বাইরে বেরোতে হলে একখানি চাদর গায়ে জড়িয়ে নেয়। গরীব ঘরের মেয়েরা জামা পরে না। মেখেলাটি বুকে উঠিয়ে বেঁধে তার ওপর কখনো বা একটি গামছা বা চাদর মেলে দেয়। এই ক্ষেত্রে দুঃখী খ্রিস্টান মেয়েদের বেশভূষা অনেক সুন্দর। বেশিরভাগ মিশনস্কুলের মেয়েরা 'জ্যাকেটের' মতো জামা আর পায়ে স্যান্ডেল পরে। কিন্তু তাদের সবার মধ্যেই তারার বেশ ভূষা সব থেকে পরিপাটি। সে সাধারণ সুতীর কাপড় জোড়াই এত সুন্দর করে পরে যে রাস্তায় যাবার সময় সকলের চোখই একবার হলেও তার দিকে পড়ে। কিন্তু তার সঙ্গে ঠাট্টাইয়ার্কি করার কথা কেউই চিন্তা করে না। হয়তো তার প্রধান কারন তারার হাঁটাচলার মাঝে ফুটে ওঠা আত্মবিশ্বাস। তার মতো মাথা উঁচু করে নগাঁওর 'ভদ্রবাড়ীর' মেয়েই বা কটা যেতে পেরেছিল? আসলে নগাঁওর 'ভালো' পরিবারগুলি মিশনস্কুলের ছাত্রীদের অন্যজগতের প্রাণী বলেই মনে করত। তাঁদের নিজেদের ছায়ায় বড় হওয়া মেয়েরাও যে খ্রিস্টান মেয়েদের মতো ঘুরে বেড়াতে পারে সেটা তাঁদের কল্পনার বাইরে ছিল। গুণাভিরাম বরুয়ার মতো দু একজনের মুখে 'নারীস্বাধীনতার' কথা জানতে পেরে তাঁরা এ ধরণের চিন্তাধারার বিরোধিতা করেছিলেন। তাঁদের ধারণা ছিল যে নীচু জাতের দুঃখী লোকদের ভগবানই হাড়ভাঙা পরিশ্রম করার উপযুক্ত করে দিয়েছেন। সেই কারণে রোদে ঝড়ে জলে তারা সহজভাবেই ঘোরাফেরা করে। তাঁদের নিজেদের বাড়ির মেয়েরা লোকচক্ষুর আড়ালে শুধু গৃহকর্ম পালন করার জন্যেই জন্ম নিয়েছে। সৃষ্টির এই নিয়ম ভাঙা মানেই মহাপ্রলয়। সেইজন্যেতো গাঁয়ের ভদ্রলোকেরা তারার মতো মেয়ের সঙ্গে তাঁদের মেয়ে বৌদের আসা যাওয়া করাটা পছন্দ করেন না।

তারার দিনগুলি বড়ো ব্যস্ততার মধ্যে দিয়ে কেটে যায়। ভোরে নর্ম্যাল স্কুলে যাওয়া, দুপুরে মেমেদের সঙ্গে মহিলা সম্পর্কিত কাজে বেরনো, আবার কখনো বা মিশন স্কুলের কাজকর্মে মিস্ কীলারকে সাহায্য করা, দুঃখী মেয়েদের জন্যে কাপড় জামা বানানো বা উলবোনা ইত্যাদি কাজেই তার দিনগুলি পার হয়ে যায়। মাঝে মধ্যে সে মিশনারী সাহেব মেমদের অসমীয়া ভাষার বই অনুবাদ করার কাজে ও সাহায্য করে। সাহেব মেমদের অন্যের ভাষা শিখে সেই ভাষায় বই লেখার চেষ্টা তারাকে অনুপ্রাণিত করে। সে নিজেও যখন ছোট্টবই একটি অসমীয়া ভাষায় অনুবাদ করতে আরম্ভ করল তখন সাহেব মেমেরাও তাকে উৎসাহিত করলেন।

এদিকে দ্বিতীয়া পত্নী আর যুবতী মেয়ে মেরিয়ার করুণ মৃত্যুর পরে ব্রণসন্ সাহেবের শরীর দিনকে দিন ভেঙ্গে পড়ছিল। তিনি ভগ্ন হৃদয় আর অসুস্থ শরীরে মিশনের সব কাজকর্ম চালিয়ে যাওয়ার যে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিলেন তা দেখে নগাঁও এর খ্রিস্টানরা অভিভূত হয়ে পড়লেন। প্রত্যেকে চেয়েছিলেন তাঁর কষ্টের লাঘব করে তাঁর জীবনে একটু

আনন্দ এনে দেবার। গোলাপী সেই উদ্দেশ্যে একদিন প্রস্তাব দিল যে, যেহেতু ব্রণসন সাহেবের পরিচর্যা এবং গৃহকর্মের জন্যে একজনকে প্রয়োজন এবং যেহেতু সেই সব সাহেব মেমদের পক্ষে সুন্দরভাবে করা সম্ভব নয়; অতএব তারাই হবে এসবের জন্যে একমাত্র উপযুক্ত। ব্রণসন্ সাহেব প্রথমে ভীষন আপত্তি করেছিলেন। গোলাপীকে একলা রেখে তারাকে নিয়ে আসবার পক্ষপাতী তিনি কখনই ছিলেন না। কিন্তু তাঁর স্বাস্থ্য দিনের পর দিন এত খারাপ হয়ে পড়ল, যে মিশনারী সাহেব মেমেরা গোলাপীর প্রস্তাবটি মেনে নেবার জন্যে তাঁকে বিশেষ অনুরোধ জানাল। ব্রণ্সন্ সাহেবের কাগজপত্র থেকে আরম্ভ করে ওষুধপত্র সবকিছু ঠিক করে রাখবার জন্যে তারার মতো বুদ্ধিমতী আর কর্মী মেয়ের সত্যিই প্রয়োজন ছিল। অবশেষে শুভানুধ্যায়ীদের কথা মেনে নিয়ে তিনি তারাকে তাঁর বাড়িতে থাকবার অনুমতি দিলেন। জীবনে সর্বপ্রথম মাকে ছেড়ে এসে তারার খুবই খারাপ লাগছিল। কিন্তু গোলাপী প্রায় প্রত্যেকদিন তার খোঁজখবর নেওয়ার ফলে নতুন পরিস্থিতি সে খুব সহজেই সামলে নিল। এত বড়ো একটি দায়িত্ব তাকে সমর্পন করাতে সে যথেষ্ট গৌরব অনুভব করল।

দুদিনেই সে সাহেবী বাংলোর সমস্ত নিয়মকানুন শিখে নিয়ে আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে সাহেবের ঘরের সব কর্মের ওপরে লক্ষ রাখতে শুরু করল। এমন কমবয়সী একটি মেয়ের কর্তব্য নিষ্ঠা আর দায়িত্ববোধ দেখে পাদরীরা অবাক হয়ে গেলেন। ব্রনসন্ তারাকে নিজের মেয়ের মতো স্নেহ করতে শুরু করলেন আর নিজের মেয়ের করুনস্মৃতিতে ভরে থাকা ঘরটিতে তারাকে থাকবার অনুমতি দিলেন। তারার প্রথমে একলা সেই ঘরটাতে ভয় লাগত। কিন্তু মা তাকে অভয় দিয়ে বললেন যে যেখানে ব্রন্সন্ সাহেবের মতো একজন সাক্ষাৎ ভগবানের দূত আছেন সেখানে ভয় করার কিছুই নেই। তবুও মেরিয়ার বিছানাতে শুতে তার সংকোচ হওয়ার জন্যে মেঝেতে বিছানা পেতে সে শোয়ার ব্যবস্থা করল।

সতের

নগাঁওর সরকারী ইংরেজী বিদ্যালয়টিতে পড়ার জন্যে কাছাকাছি এবং দূর দূর থেকে অনেক ছেলে আসত। স্কুলটিতে বোর্ডিং ছিল না তাই দূর থেকে আসা ছেলেরা লোকের বাড়িতে থেকেই পড়াশুনো করত। গুণাভিরাম নিজের বাড়ির মধ্যে স্কুলের ছেলেদের থাকবার জন্যে খড় আর বাঁশ দিয়ে কয়েকটি ঘর বানিয়ে দিয়েছিলেন। দশ - বারোটা ছেলে সেখানে থেকে পড়ত। ছেলেগুলি যদিও নিজেরাই রান্না করে খেত তবুও - প্রায়ই হাকিমের ঘর থেকে তাদের জন্যে শাক সব্জী, জলখাবারের জন্যে চাল, দুধ ইত্যাদি জিনিস পাঠানো হত। ছেলেগুলি হাকিম পত্নীর কাছে আদর - যত্ন পেত বলে তাঁকে

সেরকম ভয় করত না। পক্ষান্তরে হাকিম সাহেব কে তারা ভয় এবং সম্ভ্রমের দৃষ্টিতে দেখত। সাধারণতঃ তাঁকে দেখলেই তারা মাথানিচু করে পালিয়ে যেত। তাঁর আসা যাওয়ার রাস্তায় তারা যাতায়াত করত না। বাড়ির একদিকে অন্য একটা রাস্তা তারা বেছে নিয়েছিল যাতায়াতের জন্য। গুণাভিরাম কিন্তু ছেলেদের গতিবিধির খবর রাখতেন। তিনি নিজেকে ছেলেগুলির অভিভাবক বলে মনে করতেন।

ছাত্রদের মধ্যে 'লক্ষেশ্বর কটকী' নামের ছেলেটি একটু অন্যধরনের। তার বাড়ি কালিয়াবর, ঘরের অবস্থা খুব একটা ভালো নয়। বাবা যজমানী করে কোনোমতে সংসার চালান। সে বাড়ির বড় ছেলে। পড়াশুনোতে ভালো বলে বাবা তাকে কষ্ট করে হাইস্কুলে পড়াচ্ছেন। তাঁর আশা যে এনট্রান্স (Entrance) পরীক্ষা পাশ করে যদি লক্ষেশ্বর সরকারী চাকরিতে ঢুকতে পারে, তাহলে বাড়ির সবাই সুখের মুখ দেখবে।

লক্ষেশ্বর অন্যদের মতো হাকিম সাহেবকে দেখলে পালিয়ে যেত না। এগিয়ে এসে সব সময় সম্ভ্রমের সঙ্গে সম্ভাষণ করত। গুণাভিরাম কিছু জিজ্ঞেস করলে সে খুব বিনয়ের সঙ্গে উত্তর দিত। তার ব্যবহারের জন্যে সে হাকিমের প্রিয়পাত্র হয়ে উঠেছিল। আস্তে আস্তে তাঁর প্রাতর্ভ্রমনের সঙ্গীও হয়ে উঠল। এইজন্যে সঙ্গের অন্যান্য ছেলেগুলির তার প্রতি যে ঈর্ষার ভাব জেগে উঠেছল সে কথা বুঝতে পেরে লক্ষেশ্বর আনন্দ পেত। তাকে তারা "হাকিমের জামাই" বলে ঠাট্টা করলে সে মুখে প্রতিবাদ করলেও ভেতরে ভেতরে তার ভালোই লাগত। জীবনে তার অনেক উঁচুতে ওঠার স্বপ্ন। সহপাঠীরা যেন তাকে এক ধাক্কায় মইয়ের একেবারে ওপরের দিকে তুলে দিয়েছে।

একদিন প্রাতর্ভ্রমনের সময় গুণাভিরাম লক্ষেশ্বরকে আনন্দরাম ঢেকিয়াল ফুকনের কথা বলতে বলতে যাচ্ছিলেন। নগাঁওতে থাকার সময়ে তিনি কেমন করে গুণাভিরামের সঙ্গে মিলিতভাবে, 'জ্ঞানসভা'র প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এবং তাতে কি কি জ্ঞানগর্ভ কথা আলোচনা হত। লক্ষেশ্বর কিছুক্ষণ কথাবার্তা শোনার পরে বলে উঠল,

"এখন তো আমরাও সেরকম একটা সভার আয়োজন করতে পারি। আপনি আমাদের পথ নির্দেশ করলেই আমরা ছাত্ররাই এই কাজে অগ্রণী হতে পারি,"

গুণাভিরাম অনেকদিন থেকেই এরকম একটা কথা ভাবছিলেন। এখন লক্ষেশ্বর যেন তাঁর মনের ভাবটাই প্রকাশ করল। নতুন উৎসাহে তিনি জ্ঞান - সভার পরিকল্পনা করতে লাগলেন। সরকারী স্কুলবাড়ির একটি ঘরে এই সভার আয়োজন করা যেতে পারে। হেডমাস্টার মশাইয়ের অনুমতির ব্যবস্থা তিনি নিজেই করবেন। সবকিছু সাজানো, অতিথিদের নিমন্ত্রণ ইত্যাদির ভার লক্ষেশ্বর নিল। প্রথম সভা আগামী বুধবারে করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হল। নিমন্ত্রিতদের তালিকা গুণাভিরাম নিজেই প্রস্তুত করে ছিলেন। তারমধ্যে ছিলেন মাইলস্ ব্রন্‌সন্, রুদ্ররাম বরদলৈ, পদ্মহাস গোস্বামী, রাতিরা কোচ, ফটিকবন্দ বরুয়া, জানকীনাথ সেন, রামলোচন সেন এবং আরও কিছু নগাঁওর শিক্ষিত গণমান্য ব্যক্তি।

বুধবার দিন বেলা তিনটের সময় সভার কাজ আরম্ভ হ'ল। স্কুলের সভা ঘরখানিতে ছাত্র আর নিমন্ত্রিত অতিথিদের ভিড় যেন উপচে পড়ছে। লক্ষেশ্বরেরা যতদূর সম্ভব সুন্দর করে ঘরখানি সাজিয়ে ছিল। মেঝেতে পাতা হয়েছিল বিল্বকুটীর থেকে আনা একটি সুন্দর চাদর, তারওপর ছিল একটি ফুলেভরা ফুলদানী। ছেলেরা দুয়ার থেকেই নিমন্ত্রিত দের সাদরে এনে সভাঘরে বসাল। সর্বসম্মতিক্রমে গুণাভিরাম বরুয়া সভাপতি নির্বাচিত হলেন। স্কুলের একজন ছাত্র 'বরগীত' গেয়ে সভার উদ্বোধন করল। তারপরে রুদ্ররাম বরদলৈ, পদ্মহাস গোস্বামী প্রমুখেরা সভার গুরুত্ব ব্যাখ্যা করে একেকটি বক্তৃতা দিলেন। লক্ষেশ্বর ''শিক্ষার প্রয়োজনে'' নামে নিজের লেখা একটি রচনা পাঠ করে শোনাল। এরপর মাইলস্ ব্রনসন্ সাহেবকে অনুরোধ করা হল দু একটি কথা বলার জন্যে কিন্তু তাঁর শরীর খুব অসুস্থ থাকায় তিনি বলতে চাইলেন না। শুধু জ্ঞান সভার দীর্ঘায়ু কামনা করে আশীর্বাদ জানালেন। এত অসুস্থতা সত্ত্বেও তাঁর উপস্থিতির জন্যে সভাঘরের সকলেরই মন তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতায় ভরে গেল। সবশেষে গুণাভিরাম বরুয়া সভার তাৎপর্য সম্বিলিত দু চারটি কথা বলে সকলকে মুগ্ধ করলেন। আনন্দ ঢেকিয়াল ফুকনের মহান্ আদর্শের উল্লেখ করে তিনি নগাঁওর লোকেদের অসমীয়া ভাষা সংস্কৃতির প্রতি সশ্রদ্ধ থাকার পবিত্র কর্তব্যের কথা আবার ও স্মরণ করিয়ে দিলেন। স্বয়ং শ্রীমন্ত শংকরদেবের জন্মস্থান নগাঁও জেলাতেই। সেক্ষেত্রে আরও অধিক প্রেরণার প্রয়োজন আছে কি? গুণাভিরামের বক্তৃতা সেইদিন সভার সকলকেই যথেষ্ট উৎসাহিত করল। সভার উদ্দেশ্য সফল করতে সবাই দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হলেন।

প্রাথমিক উচ্ছ্বাসে লক্ষেশ্বর জ্ঞান সভাটি প্রত্যেক বুধবারে করবে বলে মনে করেছিল। কিন্তু দুটি বুধবার কেটে যাবার পরে সভাটিকে পাক্ষিক করা হল। পরের দিকে সেটিকে মাসিক করা হয়েছিল। তবুও জ্ঞানসভার মধ্য দিয়ে ছাত্রদের নানারকম অভিজ্ঞতা হ'ল। এই সভায় নিয়মিতভাবে উপস্থিত থাকা কয়েকজন ছাত্র পরে নামকরা সাহিত্যিক হয়েছিলেন। লক্ষেশ্বর সাহিত্যিক হতে না পারলেও 'জ্ঞান সভার' মধ্যে দিয়ে সে কাজ কর্মে কৃতিত্ব অর্জনের পথের সন্ধান পেল। গুণাভিরাম বরুয়া লক্ষেশ্বরকে নিজের বইপত্র, সাপ্তাহিক ও মাসিক পত্র পত্রিকা ইত্যাদি দিয়ে পড়াশুনোর ব্যাপারে সাহায্য করতে লাগলেন। কোন কোন মাসে লক্ষেশ্বরের হাতখরচের পয়সা না থাকলে তাকে তিনি নিজের পকেট থেকে দু - চারটাকা দিতেন। লক্ষেশ্বর অত্যন্ত বিনয়ী বলে বিষ্ণুপ্রিয়াও তাকে স্নেহ করেন। তার খোশামুদের কথাগুলিতে স্বর্ণ খুব মজা পায়। লক্ষেশ্বর তার বইগুলিতে মলাট দিয়ে সুন্দর অক্ষরে নাম লিখে দেয়। তাছাড়াও নানারকম বুদ্ধির খেলা দেখিয়ে তাকে আনন্দ দেয়।

লক্ষেশ্বর তখন হাইস্কুলের 'সেকেন্ড ক্লাসে' পড়ে। 'ফাস্টক্লাস' হলেই এনট্রান্স পরীক্ষা দিতে হবে। তাই এখন থেকেই সে পড়াশুনোয় উঠেপড়ে লেগেছে। এনট্রান্স ভালোভাবে পাশ করতে পারলেই কলিকাতাতে পড়ার বৃত্তি পেতে পারে। কলিকাতায় পড়বার স্বপ্ন লক্ষেশ্বর এখন থেকেই দেখছে। এইবার বাড়িতে গিয়ে সে কথাটা বাবার সামনে বলেছিল।

কিন্তু তার বাবা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলেছিলেন,

''কলিকাতাতে পড়ানোর এত টাকা কোথায় পাবো, বাবা? সরকারী বৃত্তির টাকাতেই কুলোচ্ছে না। তার থেকে এনট্রান্স পাশ করে কাছারীতে কেরানীর কাজে ঢুকে পড়াই ভালো। আমাদের মতো মানুষের তার চেয়ে বেশি আশা করাই মূর্খতার পরিচায়ক।''

লক্ষেশ্বর কিন্তু বাবার কথাটা মেনে নেবার ছেলে নয়। সে মনে মনে অন্য পরিকল্পনা করে রেখেছে। কলিকাতায় যাওয়ার খরচ সে হাকিম সাহেবের কাছ থেকেই নেবে। ইতিমধ্যে তাঁর সহায়তায় সে অন্যদুটি বাঙালি ছেলের সঙ্গে মিশনের সাহেবদের কাছ থেকে ইংরেজী ভাষাটা ভালোভাবে শেখার ব্যবস্থা করে নিয়েছে। পাদরীদের যাতে ভালো লাগে সেজন্য সে খ্রিস্টান ধর্মের প্রতিও আগ্রহ দেখিয়েছে। ফলে তাঁরা তাকে যত্নের সঙ্গে ইংরেজী শেখাচ্ছেন।

আঠের

স্টিমারে গোয়ালন্দ হয়ে গেলে সেই সময়ে কলিকাতা থেকে নগাঁও পর্যন্ত খুব কম করে হলেও ন-দশদিন লেগে যেতো। কিন্তু ভৌগলিক দূরত্ব সত্ত্বেও নগাঁওর ব্রাহ্মদের কাছে কলিকাতা বেশিদূর ছিল না। চিঠিপত্র, কাগজ, পত্র পত্রিকা আর কলিকাতা থেকে আসা যাওয়া বন্ধু বান্ধব, আত্মীয় স্বজন প্রত্যেকের কাছ থেকেই তাঁরা কলিকাতার মোটামুটি সব খবর দেরি করে হলে ও পেয়ে আসছিলেন। কিছু কিছু খবর ব্রাহ্মসমাজের দ্বিমত সম্পর্কিত, যা বহু বাগ্ বিতন্ডার সৃষ্টি করেছিল। ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন আর মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের মধ্যেকার মনোমালিন্য গুনাভিরামের মতো আরও অনেকের মনে দুঃখ দিয়েছিল। হয়তো কলকাতার ব্রাহ্মরা গুরু শিষ্যের এই বিতর্কে জড়িত থাকার জন্যে তাঁরা নিজের নিজের সতীর্থদের আগের থেকে আরও বেশি সংঘবদ্ধ করতে সক্ষম হয়েছিলেন। কিন্তু দূরদূরান্তরে ছড়িয়ে থাকা ব্রাহ্মদের ক্ষেত্রে এই বিতর্ক মূলক যুদ্ধ তাঁদের বিশ্বাসে ভাঙ্গন ধরিয়েছিল। কলিকাতায় কেশবচন্দ্র সেনের তেজস্বী বক্তৃতা আর উদার দৃষ্টিভঙ্গী বেশিরভাগ ব্রাহ্মসমাজের যুবককে তাঁর অনুগামী করে তুলেছিল। তাঁর অনুগামীরা তাঁকে এত বেশি ভক্তি করত যে কেউ কেউ তাঁকে ভগবানের অবতার বলে ও পুজো করত। কেশবচন্দ্রের সেরকম সমর্থক দু একজন নগাঁওতেও ছিল। কিন্তু গুনাভিরাম বা গুরুনাথ দত্ত একজনের পক্ষ নিয়ে অন্যজনকে হেয় প্রতিপন্ন করার পক্ষে যোগ দেন নি। ফলে নগাঁওতে ব্রাহ্ম সমাজ একটিই ছিল। ''আদি'' ব্রাহ্মসমাজ আর ভারতীয় ব্রাহ্ম সমাজ — এই দুভাগে বিভক্ত হয়নি। কলিকাতার ব্রাহ্মসমাজে আর একবার ভাঙন ধরলো যখন খবর বেরুলো যে কেশবচন্দ্র স্ত্রীশিক্ষা প্রসারের ক্ষেত্রে এগিয়ে গিয়েছিলেন, হিন্দুবিবাহের আমূল পরিবর্তন চেয়ে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে যাঁর মতভেদ হয়েছিল, তাঁর মতো একজন বিপ্লবী পুরুষ

ব্রাহ্মদের প্রবর্তন করা 'নেটিভ ম্যারেজ অ্যাক্ট' (Native Marriage Act) উপেক্ষা করে নিজের অল্পবয়সী মেয়ের বাল্যবিবাহের আয়োজন করেছিলেন। শুধু মাত্র তাই নয়, জামাই হিসাবে তিনি বেছে নিয়েছিলেন কোচবিহারের ষোলবছরের একজন রাজকুমারকে। মোটকথা, সব দিক থেকেই এই বিয়েটি হবে ব্রাহ্মআর্দশের পরিপন্থী।

নগাঁওর ব্রাহ্মরা প্রথমে এই খবরটা পেলেন গুরুনাথ দত্তের কাছে তাঁর বন্ধুর প্রেরিত একখানি চিঠিতে। চিঠিখানি পড়েই দত্ত চিন্তান্বিত অবস্থায় গুনাভিরামের কাছে গেলেন। দুজনে পরামর্শ করে ঠিক করলেন যেহেতু কথাটা মিথ্যে হতে পারে, সেই জন্যে এখন চুপচাপ থাকাই শ্রেয়। কিন্তু সত্যকে কতদিন লুকিয়ে রাখা যাবে? দুমাস পরে পুজোর সময় উকিল রাধানাথ সেনের মেয়ে জামাই কলিকাতা থেকে এসে পড়ায় নগাঁওর ব্রাক্ষ্মসমাজে খবরটা প্রচারিত হয়ে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে কেশব চন্দ্রের অনুগামী আর অন্যদের মাঝে বিরাট তর্ক - বিতর্কের সৃষ্টি হ'ল। যেহেতু কেশবচন্দ্রের মতো একজন নেতা নিজের ক্ষুদ্র স্বার্থের জন্যে সব আদর্শ জলাঞ্জলি দিতে কুণ্ঠাবোধ করলেন না, তখন ব্রাক্ষ্মদের মাঝে আদর্শ অটুট রাখা সম্পর্কে প্রতিমুহূর্তে আশঙ্কা জেগে উঠল। ব্যাপারটির গুরুত্ব উপলব্ধি করে গুণাভিরাম বরুয়া আর গুরুনাথ দত্ত পরামর্শ করে ব্রাক্ষ্মদের নিয়ে একটি সভার আয়োজন করলেন। সভা আরম্ভ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই একজন উঠে দাঁড়িয়ে কেশবচন্দ্র সেনের বিরুদ্ধে বিষোদ্গার করতে আরম্ভ করলেন। চারিদিক থেকে সঙ্গে সঙ্গে একটা হৈ - চৈ এর সৃষ্টি হল। কয়েকজন উত্তেজিত হয়ে একসঙ্গে নিজের নিজের মত প্রকাশ করতে লাগলেন। গুনাভিরাম বরুয়া দাঁড়িয়ে সকলকে শান্ত হবার জন্যে বারবার অনুরোধ করলেন। সবাই শান্ত হলে তিনি আস্তে আস্তে বলতে শুরু করলেন,

"ভাইসব, ব্রাক্ষ্মসমাজটি সত্য আর আদর্শের ওপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। একজন ব্রাক্ষ্মর কাছে একমাত্র সত্য হ'ল পরম শক্তিমান পরমপবিত্র জগৎস্রষ্টা পরমেশ্বর। যে দুজন গুরুর নিকট আমি এই পরমেশ্বরের বিষয়ে জানতে পারি সেই দুজন হল প্রকৃতি আর মানব মনে প্রবেশ করা প্রাকৃতিক সত্যের আদর্শগুলি। এই দুই শিক্ষাগুরুর ওপরে যার বিশ্বাস আছে, সেরকম লোককে কোনো সাময়িক ঘটনাই টলাতে পারে না। কোনো একজন বিশেষ ব্যক্তিকে ধর্মগুরু মেনে নিয়ে তাঁকে সব দুর্বলতা আর ভ্রান্তির উর্দ্ধে বলে ভাবার সমান ভুল আর নেই। আমরা সেরকম ভুলই করে থাকি। সেজন্যে মনে আঘাত ও পাই। কিন্তু ব্রাক্ষ্মধর্মের সারমর্ম বুঝতে পারলে হতাশা বা নির্বুদ্ধিতা কখনই আমাদের গ্রাস করবে না।" ব্রাক্ষ্ম ধর্মের মূল আদর্শ সম্পর্কে তিনি আরও অনেক কথা বললেন।

গুণাভিরামের কথাগুলি সভার শান্তি শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনল। তাঁর দীর্ঘ বক্তৃতা শোনবার পরে বেশির ভাগ শ্রোতার মনেই সাহস আর বিশ্বাস ফিরে এল। বিশাল সাগরের মাঝখানে ঝড় এলে ছোট্ট নৌকোর যাত্রীরা যেমন পরস্পর পরস্পরকে জড়িয়ে ধরে বাঁচবার চেষ্টা করে, সেরকমই ব্রাহ্ম সমাজের এই মুষ্টিমেয় মানুষের মধ্যে মিলন - প্রীতি এবং নিজের ধর্মের প্রতি গভীর বিশ্বাসের খুবই প্রয়োজন ছিল। সেই কারণেই এখন

নিজেদের মধ্যে বাগ্‌বিতন্ডা খেয়োখেয়ি, দলাদলি বাদ দিয়ে ভ্রাতৃসুলভ মনোভাবের সাহায্যে নিজস্ব অস্তিত্ব রক্ষার একমাত্র উপায় হয়ে পড়েছে।

গুণাভিরাম সেইদিন সভাতে অনেক কথা বললেন। কিন্তু বাড়িতে ফিরে এসে বারান্দার আরাম কেদারাতে বসে অনেক রাত্রি পর্যন্ত তিনি চিন্তা করতে লাগলেন। বিষ্ণুপ্রিয়া ভাত খাওয়ার জন্যে ডাকতে এসেও তাঁর ওঠার কোনো লক্ষণ দেখলেন না। কাছের চেয়ারে বসে বিষ্ণুপ্রিয়া বল'লেন,

"আজকের সভায় আপনার কথাগুলি সবার মনে সাহস এনে দিয়েছে।"

গুণাভিরাম নিঃশ্বাস ফেলে বল'লেন, "সকলের মনে সাহস দেবার মতো বলবার কথা অনেক আছে। কিন্তু আমার নিজের মনটাকেই সাহস দিতে পারছিনে। ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের মতো একজন জ্ঞানী পুরুষই যদি লোকাচারের কাছে মাথা নোয়ায়, আমি কি একলা সেই সবের বিরুদ্ধে লড়তে পারব? তার পরে কলকাতার পরিবেশ আমাদের অসম থেকে অনেক ভালো। কিন্তু সেখানেই যদি জ্ঞানীগুনী মানুষেরা নিজেদের দুর্বলতা বশ করতে না পারেন আমাদের মত পিছিয়ে পড়া জায়গার অবস্থা কি হবে?"

বিষ্ণুপ্রিয়া কিছুক্ষণ নীরব হয়ে থাকলেন। স্বামীকে হতাশায় ভুগতে দেখলে তিনি তৎক্ষনাৎ তাঁর নিজের মনকে কঠিন করে দেখানোর চেষ্টা করেন। তাঁর মনে সবসময় ভয় হয় যে তাঁকে দুর্বল দেখলে স্বামীর মন একেবারে ভেঙে পড়ে। অন্যদিনের চেয়ে সেইকারণেই বেশি দৃঢ় হয়ে তিনি বলে উঠলেন,

"আমাদের স্বর্ণকে কিন্তু চোদ্দ বছর না হলে বিয়ে দেবনা, যে যাই বলুক না কেন। অসমীয়া সমাজ আমাদের এমনিই ত্যাগ করেছে। এখন সমাজের ভয়ে আমি নিজের বিশ্বাস ত্যাগ করলে একূল - ওকূল দুই কূলই যাবে।"

পত্নীর সাহসী কথাবার্তা গুনাভিরামের মানসিক অস্থির তার অনেকখানি অবসান ঘটাল। স্বর্ণর ভবিষ্যৎ নিয়ে দুজনে সেদিন অনেক কথাবার্তা বললেন। তাকে কলিকাতার বেথুন স্কুলে পড়াবেন। তারপরে ভালোঘরের সুশিক্ষিত একটি ছেলের সঙ্গে তার বিয়ে দেবেন। অবশ্যই তাকে ব্রাহ্মন ছেলে হতে হবে। অসমীয়া ব্রাহ্মণ ঘরের ছেলে স্বর্ণকে বিয়ে করবার জন্যে কখনই এগিয়ে আসবে না — এবং এ বিষয়ে বিষ্ণুপ্রিয়া কোনো মিথ্যে আশাও করেন না। আর ব্রাহ্মসমাজে অসমীয়া ঘরই বা কটা আছে? নগাঁওতে দু একটির বেশি তারা দেখেন নি। তথাপি বরুয়া দম্পতি সেইদিন নিজেদের আশ্বাস দেওয়ার চেষ্টা করলেন যে সবদিক থেকে স্বর্ণ যদি একজন আদর্শ ভারতীয় নারী হয়ে উঠতে পারে তাহলে নিশ্চয়ই ভালো ঘরের, কোনো উঁচুজাতে শিক্ষিত, উদারমনা অসমীয়া ছেলে তাকে পত্নী হিসাবে গ্রহন করবার জন্যে উপস্থিত হবেই। অসমীয়া সমাজ তো সবসময় এরকম থাকতে পারবে না — একদিন উন্নততর হবেই।

উনিশ

দেখতে দেখতে একটা বছর পার হয়ে গেল। বড়দিন আবার এল। কিন্তু নগাঁওর খ্রিস্টানদের আনন্দ উৎসবের মাঝে এইবার যেন একটা বিষাদের ছায়া পড়েছে। ব্রণ্‌সণ্‌ সাহেবের শরীর খুব অসুস্থ। অসমে আসবার দিন থেকে বিভিন্ন রকমের অসুখ এবং রোগের হাত থেকে তাঁর পরিবার মুক্তি পায়নি। একের পর এক তাঁর দুই পত্নী, সন্তান সকলকে হারিয়ে এই অসাধারণ উদ্যমী পুরুষটি যেন ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন — মানসিকভাবে না হলেও, শারীরিক ভাবে। দ্বিতীয় পত্নী এবং কন্যা মেরিয়ার মৃত্যুর পরে তাঁর মন একেবারে ভেঙে পড়েছিল আর সেই সুযোগে শারীরিক অসুস্থতা তাঁকে একেবারে দুর্বল করে দিল। মিশনারীদের অশেষ আদর যত্ন আর প্রার্থনাতে যখন কোনো সুফল পাওয়া গেল না তখন সবাই পরামর্শ করে তাঁকে আবার আমেরিকায় পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিলেন। ব্রণ্‌সণ্‌ কিন্তু যেতে চাইলেন না। যে জায়গায় তিনি জীবনের বেশির ভাগ সময় কাটালেন, যেখানকার ভাষা সাহিত্য আর মানুষদের তিনি এতদিনে নিজের আপনার করে নিলেন, সেই জায়গা ছেড়ে সাত - সমুদ্র পার হয়ে আমেরিকাতে শুধুমাত্র নিজের অস্থিগুলি ফেলতে যাওয়ার ইচ্ছে তাঁর এক্কেবারে নেই। তথাপি সব শুভাকাঙ্খী তাঁকে বারবার অনুরোধ জানালেন অন্ততঃ একবার আমেরিকায় গিয়ে যেন তিনি স্বাস্থটা পুনরুদ্ধার করে ভালোয় ভালোয় ফিরে আসেন। শেষে সকলের আন্তরিক অনুরোধে তিনি যেতে রাজি হলেন। এইবার তারা জেদ ধরল। সে ব্রণ্‌সণ্‌ সাহেবের সঙ্গে আমেরিকা যাবেই। নাহলে জাহাজে করে এতদূরের পথ যাওয়ার সময় কে তাঁর শুশ্রূষা করবে? গোলাপী মেয়ের দিকে চেয়ে অবিশ্বাসের সুরে বললেন,

"সত্যি করে বলতো তুই সাহেবের স্বাস্থ্যের কথা চিন্তা করে যেতে চাইছিস না নিজের বিদেশ দেখার ইচ্ছে পূরণ করবার জন্যে?"

তারা ছলছল চোখে উত্তর দিল, "সত্যি কথাই বলছি মা, আমি ব্রণ্‌সণ্‌ সাহেবের সেবা শুশ্রূষার জন্যে যেতে চাইছি। আমেরিকা যাওয়ার ইচ্ছে আমার সত্যিই ছিল। কিন্তু সাহেব যদি চিরকাল এখানে থাকেন তাহলে আমিও এখানেই থাকব। তিনি যেন আমার বাবা নন? আমার সত্যিকারের বাবা মারা যাওয়ার সময় তিনি যেন তাঁর কাছে বসে সেবা করেননি? আমার ও একান্ত ইচ্ছে জীবনের অন্তিম সময় পর্যন্ত আমি যেন তাঁর কাছে থেকে তাঁর সেবা করে যেতে পারি।" শেষের কথাগুলি বলতে বলতে তার চোখ দিয়ে জল উপচে পড়ল। সবশুনে গোলাপী আর কিছু বলল না। সাহেব মেমদের সঙ্গে আলোচনা করে মেয়েকে পাঠানোর ব্যবস্থা করতে লাগল।

তারা এরকমভাবে আমেরিকা যেতে হবে কোনদিন ভাবে নি। সেবার নিষ্ঠা এই মেয়েটিকে এমনভাবে অনুপ্রানিত করে ছিল যে তার নিজের কথা ভাববার সময় ছিল না। বড়দিন কেটে যাওয়ার দুমাস পরে যাত্রার দিনটি ঠিক হবার সঙ্গে সঙ্গে সে ব্রণ্‌সণ্‌ সাহেবের

জিনিসপত্র গোছাতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। একটা বড়ো কাঠের বাক্সে সঙ্গে নিয়ে যাবার সমস্ত কাগজপত্র ভাগে ভাগে গুছিয়ে নিল। তারপরে কাপড়চোপড়, ঔষধপত্র, বিছানা, আরামচেয়ার ইত্যাদি জিনিষপত্র সাহেবের নির্দেশ অনুযায়ী গোছগাছ করতে লাগল। তার নিজের কি কি লাগবে সেসবের চিন্তা অবশ্য তার মা করল। অনেক কষ্টে গোলাপি নিজের হাতে লেস লাগানো দুটো জ্যাকেট সেলাই করে দিলেন। সূঁচ সূতো দিয়ে ফুল করা রুমাল, গামছা ইত্যাদির ব্যবস্থাও করলেন। মেমসাহেবরা অবশ্য নিজেরা চিন্তাভাবনা করে তারার প্রয়োজনীয় সব জিনিসের যোগাড় করে দিলেন। বিদেশে অসমীয়া 'মেখেলা চাদর' পরে তারা অসুবিধে পেতে পারে সেকথা চিন্তা করে তার জন্যে স্কার্ট, ব্লাউজ, কোট ইত্যাদি যোগাড় করে দিলেন। তারপরে ও বিদেশের কিছু কিছু আদবকায়দা আর কোন্ কোন্ বিষয়ে সতর্কতা অবলম্বণ করা প্রয়োজন, সেইসব কথা দুমাসের মধ্যে যতটা সম্ভব তাকে বুঝিয়ে দেওয়া হল। এত রকমের সতর্কতায় তারার হয়ত একটু ভয় লাগলে ও লাগতে পারে। কিন্তু ব্রণ্সণ্ সাহেবের তত্ত্বাবধানে যেতে পারবে বলে তার একটু ও ভয় করল না। তার মনে হল সে যেন ধর্মপ্রচারের অভিযানে যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছে।

ব্রণ্সণ্ সাহেবকে বিদায় সম্ভাষণ জানাতে অনেক লোক এল। স্বর্ণ, বিষ্ণুপ্রিয়া আর গুণাভিরাম বরুয়াও তাদের মধ্যে ছিলেন। গুণাভিরাম যদিও হাসিহাসি মুখে বৃদ্ধ পাদরীকে বিদায় জানালেন, তবুও তাঁর মনে মনে এই ধারণা হল যে এই হচ্ছে তাঁদের শেষ দেখা। সেই আনন্দরাম ঢেকিয়াল ফুকণের সময় থেকেই নগাঁওতে গুণাভিরাম এই কর্মব্যস্ত পাদরীসাহেবকে দেখে আসছেন। ব্রণসণ্ সাহেবকে বাদ দিয়ে তিনি নগাঁওর বুদ্ধিজীবী সমাজের কথা ভাবতেই পারেন না। প্রায় চার দশক ধরে মানুষের কল্যানের কাজ করে গেলেন যে মানুষটি তাঁর সেই শূণ্যস্থান পূরণ করার জন্যে আর কারো আবির্ভাব হবে কি? স্থানীয় মানুষের মাঝে ব্রণ্সনে্র মতো একজন সমাজকর্মী গুণাভিরাম আজ পর্যন্ত আর দেখতে পেলেন না। মিশন থেকে ঘুরে আসবার সময় গুণাভিরাম বারবার নিজেকে একটাই প্রশ্ন করতে লাগলেন — এরকম দিন কখনো আসবে কি যখন এখানকার মানুষেরা মিশনারীদের চেয়ে নিষ্ঠার সঙ্গে নিজের দেশের লোকের সেবা করবে?

স্বর্ণ এদিকে তারার সঙ্গে কথাবার্তায় ব্যস্ত ছিল। তারা তার নতুন বাক্সটাতে কি কি জিনিস নিয়েছে খুব আগ্রহের সঙ্গে সব কিছু স্বর্ণকে দেখাল। স্বর্ণ একটু সময় জিনিসগুলি দেখে নীচু গলায় জিজ্ঞেস করল,

"সমুদ্রের ঢেউয়েরা ব্রণ্সণ্ সাহেবের কথা শুনবে তো?" তারা গভীর বিশ্বাসে উত্তর দিল — "হাঁ, শুনবে।"

" তোমার মাকে মনে পড়বে না?" স্বর্ণ আবারও জিজ্ঞেস করল।

এইবার তারার গলার স্বর একটু কেঁপে উঠল, "যীশু ভগবান মাকে দেখবেন। আমিও সবসময় মায়ের জন্য প্রার্থনা করব। তোমার জন্যেও আমি প্রার্থনা করব, বন্ধু আমেরিকা থেকে আমি তোমাকে চিঠি লিখব কিন্তু। তুমি কিন্তু চিঠি লিখবে।"

"অত দূরে চিঠি যাবে তো?" — স্বর্ণ বিস্ময়ের সঙ্গে জিজ্ঞেস করল।

"জাহাজে চিঠি যাবে — আমরা যেরকম ভাবে যাবো," তারা হেসে উত্তর দিল। তারার প্রত্যেকটি কথা স্বর্ণর ধ্রুবসত্য বলে মনে হয়। তার কাছে তারা যেন সত্যিই আকাশের 'তারা' — অন্য সব মেয়ে তার চেয়ে অনেক আলাদা।

কুড়ি

বিয়ের পরে লক্ষ্মীপ্রিয়ার আর স্বর্ণর সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ হয়নি। কিন্তু তার সবসময় স্বর্ণকে মনে পড়ে। বিয়ের দিনটির কথা মনে পড়লেই তার লজ্জায় কানমাথা গরম হয়ে ওঠে। আর নিজের লোকদের ওপরে খুব রাগ হয়। নিমন্ত্রিত অতিথির সঙ্গে যেন কেউ এরকম ব্যবহার করে? তার অল্পবয়সের মগজেও সেদিনের বিষ্ণুপ্রিয়ার অপমানের গুরুত্বটা উপলব্ধি করতে পারে। যে নারী তাকে মায়ের মত স্নেহ করেছিলেন, নিজের মনে করে তাকে সোনার হার উপহার দিয়েছিলেন, সেরকম একজন স্নেহশীলা নারীকে ওরা কি করে অপমান করতে পারল? তার সবচেয়ে খারাপ লাগে যে এরকম একটা অপরাধ করার পরেও কারও মনে কোন অনুশোচনা হল না। অবশ্য পঞ্চানন শর্মা কথাটা জানতে পেরে মা এবং স্ত্রীকে যথেষ্ট কটুভাষায় সমালোচনা করেছিলেন। কারণ, হাকিম পত্নীকে অপমান করার জন্যে তাঁর সম্পর্ক চিরকালের জন্যে নষ্ট হয়ে গেল। যদি এরপরে কারও মনে কোনো অনুশোচনা হয়ে থাকে তাহলে তা কেবল হাকিমের ভয়েই হয়েছিল। বিষ্ণুপ্রিয়ার প্রতি শ্রদ্ধা বা মমতা অনুভব করে নয়। মানুষ যে এত স্বার্থপর আর নির্দয় হতে পারে লক্ষ্মীপ্রিয়া এখনই তা উপলব্ধি করতে পারলেন। তাঁর মাঝে মাঝে খু - উ - ব ইচ্ছে করে স্বর্ণর কাছে গিয়ে সব কথা বলতে আর মনের দুঃখ প্রকাশ করতে। কিন্তু বিয়ের পরে তার বেরোনো কমে গেছে। এখন হয় মা নাহলে মার বয়সী কাউকে সঙ্গী পেলে তবে সে বেরোতে পারে। বেরোতে হলেও মাথায় ঘোমটা আর বাঁশের ছাতার আড়াল নিয়ে বেরোতে হয়। দুর্গাপুজোর চারদিনই সে একটু স্বধীনভাবে ঘোরাঘুরি করতে পেরেছিল। কিন্তু তাও একলা নয়। তার বয়সের বিবাহিত মেয়ে এবং নতুন বৌদের সঙ্গে পূজা মন্দিরে প্রণাম করার জন্যে রোজই গিয়েছিল। সেটুকু স্বাধীনতা পেয়েই লক্ষ্মী আনন্দে আত্মহারা হয়ে পড়েছিল। পূজামন্দিরে স্বর্ণর সঙ্গে দেখা হতে পারে বলে সে আশা করেছিল। কিন্তু তার আশা পূরণ হল না। পরে জানতে পারল যে ব্রাহ্মরা দেবদেবীর মন্দিরে যায় না। লক্ষেশ্বর তাকে এই খবরটা দিয়েছিল।

লক্ষেশ্বর মাঝে মাঝে লক্ষ্মীদের বাড়ি যাওয়া আসা করে। লক্ষ্মীর স্বামী তার দূর সম্পর্কীয় দাদা। সেই সূত্রে সে লক্ষ্মীকে বৌদি বলে ডাকে আর সে উপস্থিত হলে লক্ষ্মীদের বাড়িতে আদর যত্ন ও যথেষ্ট পায়। প্রথম প্রথম লক্ষ্মী লজ্জায় বেরোত না। কিন্তু যখ-

জানতে পারল যে এই দেওরটি স্বর্ণদের বাড়িতে থাকে, তখন থেকে সে আগ্রহ সহকারে কথা বলবার জন্যে উপস্থিত হয়। লক্ষেশ্বর প্রথম প্রথম তাকে তার স্বামীর খবর দিতে চেষ্টা করত। কিন্তু লক্ষ্মীর কাছ থেকে এ বিষয়ে সাড়া না পেয়ে সে 'বিল্বকুটীর' এর কথাই বেশি করে বলে। কাছাকাছি অন্য মানুষ না থাকলেই সে এসব কথা বলত। লক্ষ্মীর চেয়েও এ ব্যাপারে তাকে বেশি সতর্ক মনে হত।

গুণাভিরাম বরুয়া আর তাঁর স্ত্রীর কেমন করে 'জাত গেল' এই কথাটা লক্ষ্মীর কাছে তখন পর্যন্ত এক জটিল তত্ত্বের মতো ছিল। বাড়ির সকলেই এই বিষয়ে ফিস্‌ফিস্ করে কথা বলে। কিন্তু ছেলেমেয়েরা জিজ্ঞেস করলে বলে,

"এসব খারাপ কথা। শুনলেও পাপ হয়।" বিষ্ণুপ্রিয়ার মত একজন স্নেহময়ী নারী আর গুণাভিরামের মত একজন, সৌম্য, গুনী, জ্ঞাণী পুরুষ কি এমন বড়ো পাপ করতে পারেন সে কথা লক্ষ্মী বুঝতে পারে না। একদিন কৌতুহল চাপতে না পেরে লক্ষেশ্বরকে কথাটা জিজ্ঞাসা করে ফেলল।

"এঃ, তুমি এই কথাটা ও জানো না নাকি? বরুয়া মশাই তাঁর প্রথম পত্নীর অকাল মৃত্যুর পরে বিধবা-বিবাহ করার জন্যে ব্রাহ্মধর্ম নিয়েছিলেন। এদিকে হাকিমনী দিদি পরশুরাম বরুয়ার বিধবা পত্নী। প্রথম স্বামীর দিকের তাঁর দুটি কন্যাসন্তানও আছে। বিয়ে হয়ে গেছে। লক্ষেশ্বর অশ্লীল কথা বলার ঢঙে কথাগুলি ফিস্‌ফিস্ করে বলেছিল।

লক্ষ্মী কিছুক্ষণ চুপচাপ থেকে খবরটির গুরুত্ব বুঝতে চেষ্টা করলেন। তারপরে হঠাৎ প্রশ্ন করলেন, "লক্ষঠাকুর পো, হাকিম মহাশয় যদি প্রথম স্ত্রী মারা যাওয়ার পরে অন্য একজন বামুনের মেয়েকে বিয়ে করতেন, তাহলে কি তাঁর জাত যেত? বিধবা বিবাহ করার ফলেই যেন তাঁর জাত চলে যায়নি?"

"হ্যাঁ। এই কথাটা আবার কেউ জিজ্ঞেস করে নাকি? প্রথম পত্নী বেঁচে থাকলেও ইচ্ছে হলে কেউ আরও একজনকে আনতে পারে। আর পত্নী বিয়োগ হওয়ার পরে দ্বিতীয়বার বিয়ে করাটা সমাজের প্রচলিত নিয়ম। হাকিম মহাশয় বিধবা বিবাহ করাতেই সব সমস্যার সৃষ্টি হল" লক্ষেশ্বর বিজ্ঞের মতো কথাগুলি বলে গেল। তার এখনকার কণ্ঠস্বর হাকিম মশায়ের সঙ্গে বিনয়সূচক কথাবার্তা সঙ্গে মেলে না। তাই লক্ষ্মীর দ্বিতীয় প্রশ্নটা শুনে সে চমকে উঠেছিল। এতদিন ধরে তার ধারনা ছিল যে তার মতই গোটা ব্রাহ্মন সমাজের মত।

"পুরুষ মানুষ দুবার বিয়ে করলে যদি দোষ না হয়, নারীরা তা করলে কেন দোষ হয়?" লক্ষ্মী খুব সাধারণ ভাবেই প্রশ্নটা জিজ্ঞেস করল। এই প্রশ্নটির জন্যেই যে বঙ্গসমাজ তোলপাড় হচ্ছে এ সম্বন্ধে তার কোন ধারনাই ছিল না।

লক্ষেস্বর চোখ দুটি বড়ো বড়ো করে ঘৃনার সুরে বলে উঠল "ছিঃ বৌদি, এসব কথা মুখে আনাই পাপ। তুমি সম্ভবত বরুয়া মশায়ের লেখা 'রাম-নবমী' নাটকটি পড়েছ, সত্যি কিনা? এরকম প্রশ্নের কথা তাতেই লেখা আছে, না?"

"সত্যি বলছি, পড়িনি। তাতে কি লেখা আছে?" "তোমার জানার কোনো দরকার

নেই। আমি পড়েছি। বামুনের বিধবারা কেমন করে ভ্রষ্টা হয়, তাতে তাই লেখা আছে। ভালোবাড়ির মেয়েদের সেই সব কথা মগজে স্থান দেবার দরকার নেই। আমার পক্ষে সম্ভব হলে সব বই আমি পুড়িয়ে ফেলতাম!" লক্ষেশ্বর বীরদর্পে কথাগুলি বলল।

লক্ষ্মীর জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছে হচ্ছিল 'ভ্রষ্টা' মানে কি? বিষ্ণুপ্রিয়াও ভ্রষ্টা নাকি? কিন্তু লক্ষেশ্বরের কথা বলার কায়দায় সে ভয় পেয়ে কিছু না বলেই ঘরের ভেতরে ঢুকে গে'ল। কিন্তু সবকথা তার কাছে পরিস্কার হল না। বিষ্ণুপ্রিয়ার মুখখানি তার মনে পড়ল। তাঁর চেহারাতে এবং ব্যবহারে সে বিন্দুমাত্র পাপের চিহ্ন খুঁজে পেল না। আর এক বালবিধবা পিসীর মত সারাজীবন দুঃখ কষ্ট পাওয়ার চেয়ে বিষ্ণুপ্রিয়া একটি সুন্দর সুখের সংসার পেতেছেন। তাতে কি পাপ হতে পারে? হঠাৎ লক্ষ্মীর মনে অন্যভাবের উদয় হল। যদি বিষ্ণুপ্রিয়া আর গুণাভিরামের বিয়ে না হত তাহলে হয়ত স্বর্ণর ও জন্ম হত না। লক্ষ্মীর মনটাতে সব গোলমাল হয়ে গেল। ভালো কোনটা, মন্দই বা কোনটা? কিন্তু বিষ্ণুপ্রিয়া গুণাভিরাম আর স্বর্ণকে সে পাপী বলে ভাবতে ও পারে না।

একুশ

বেলগাছের তলায় আজকাল আর স্বর্ণর খেলনাগুলি ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে থাকে না। লক্ষ্মীর বিয়ের পর থেকে স্বর্ণ বেলগাছের তলায় খেলা বাদ দিয়ে দিয়েছে। একা একা খেলতে তার ভালো লাগে না। ভাই করুণার সঙ্গে কখনো সখনো অবশ্য সে খেলা করে। কিন্তু বেশিক্ষণ তার রান্নাবান্নার খেলা ভালো লাগে না। বাবার হাঁটা নকল করে সে "কাছিরীতে যাচ্ছি রে" বলে চলে যায়। স্বর্ণ সেইজন্যে পড়াশুনো শেষ করে সিঁড়িতে বসে রুমালে ফুল তোলে বা আকাশে মেঘের রূপের যে পরিবর্তন হয় তা লক্ষ্য করে। মেঘ দেখতে তার খুব ভালো লাগে। নীল আকাশটিতে সাদা তুলোর মতো মেঘের টুকরোগুলি রহস্যজনক ভাবে হারিয়ে যায়, আর তার চোখে মুগ্ধতা নেমে আসে। কখনোবা পূর্বদিকের আকাশের সাদা মেঘগুলির খেলা দেখতে দেখতে পশ্চিমের কালো মেঘেরা হঠাৎ গোটা আকাশটা ঢেকে দেয়। তারসঙ্গে মৃদু মন্দ বাতাস মনপ্রাণ ঠান্ডা করে দেয়। কালো মেঘের ওযে কত রকমের রূপও রং আছে — যা তারমনে বিস্ময়ের সৃষ্টি করে। প্রকৃতির নিত্য নতুন রং রূপ দেখে স্বর্ণর একটু ও ক্লান্তি আসে না। সময় যে কেমন করে পার হয়ে যায় সে বুঝতে ও পারে না।

ইতিমধ্যে বিষ্ণুপ্রিয়া আর গুণাভিরামের সংসারে অন্য একজন নতুন অতিথির আবির্ভাব হয়েছে — স্বর্ণর জন্যে নতুন ভাই একটি। জনমাশৌচের সময় মাকে দেখা শুনো করবার জন্যে বিষ্ণুপ্রিয়ার প্রথম পক্ষের স্বামীর বড়ো মেয়ে এসেছে। তার নাম কালীপ্রিয়া। স্বর্ণ তাকে কালীদিদি বলে ডাকে। কিন্তু বয়সে অনেক বড়ো বলে স্বর্ণর তাকে মাতৃতুল্য বলে

মনে হয়। চেহারা ও অনেকটা দেখতে মায়ের মতোই। কেন তার নামটা 'কালী' হল স্বর্ণ বুঝতে পারল না। কালীদিদির একটি বাচ্চাছেলে আছে। ফলে গোটা বাড়ি এখন লোকজনে ভরা। ধাইমা, মিডওয়াইফ, ডাক্তার এদের বাইরেও খোঁজখবরের জন্য আছে কাছাকাছির প্রতিবেশীরা। মায়ের কাছাকাছি থাকতে না পেয়ে স্বর্ণর খুব একলা লাগে। সে ভাই করুণার সঙ্গে ভোরবেলা শিউলি ফুল তুলে বেলগাছের তলায় বসে মালা গাঁথে। বহুদিন পরে এই জায়গাটিতে বসে তার ভালো লাগে। শিউলি ফুলের ছোট ছোট মালাগুলি বেলগাছে ঝুলিয়ে দেয় ভাই বোন দুইজনে।

তাদের এই ছেলেখেলা লক্ষেশ্বর দূর থেকে দেখছিল। টেস্ট পরীক্ষাতে পাশ করে সে এখন এনট্রান্স পরীক্ষার প্রস্তুতি নিচ্ছে। সারাদিন সে নিজের ঘরে বসে পড়াশুনো করে। মাঝে মাঝে ক্লান্তিতে সে বাইরে বেরিয়ে আসে। স্বর্ণদের খেলতে দেখে তাদের কাছাকাছি এসে সে বলে উঠল, "গাছ পুজো করছ নাকি? ভালোই করছ। এই গাছটিতে ব্রহ্মদত্যি দেখা যায়, বুঝেছ?" স্বর্ণ আর করুণার ভয়ে দুচোখ বড়ো বড়ো হয়ে গেল। 'আপী' — র মুখে ব্রহ্মদত্যির গল্প তারা আগে শুনেছে। কিন্তু লক্ষেশ্বরের মতো 'ভালো মানুষ' এইসব কথা বললে অবিশ্বাস করার কোনো মানে হয় না। করুণাই লক্ষেশ্বরের হাতে ঝাঁকুনি দিয়ে ব্রহ্মদত্যির গল্প বলার জন্যে ধরে পড়ল। কিন্তু লক্ষেশ্বরের তখন গল্প বলার ইচ্ছে নেই। সে স্বর্ণকে অন্যকিছু একটা বলবার জন্যে উদগ্রীব হয়ে আছে।

"লক্ষ্মীবৌদি ঋতুমতী হয়ে গেল তো? জানতে পেরেছ?"

স্বর্ণ ভ্যাবলার মতো তার মুখের দিকে চেয়ে জিজ্ঞেস করল, "কি হয়ে গেল?"

স্বর্ণর শিশুর মতো নিষ্পাপ মুখখানি দেখে লক্ষেশ্বরের আর কিছু বলতে সাহস হল না। সে আস্তে করে করে বলল, "মাকে জিজ্ঞেস করো। দুমাসের মধ্যে দাদা এসে নতুন বৌদিকে নিয়ে যাবেন। আমি এবার ঘরে গিয়ে সব শুনে এসেছি।"

লক্ষ্মীর বিয়ের কথা বলতে এসে বেলগাছের তলায় বসে হু হু করে কাঁদার কথাটা মনে পড়ে স্বর্ণর চোখ দুটি ভিজে উঠল। লক্ষ্মীর বিয়ে তার মনে বিষাদের ছায়া ফেলেছে। মেয়েদেরই বা কেন বিয়ে হয়? সব মেয়েরাই কেন তারার মত হয় না? তারা পড়াশুনো করল। নিজের ইচ্ছেতে আমেরিকা গেল। ফিরে এসে স্কুলে পড়াবে! তার বিয়ে দেবার কথা কেউই বলে না।

তারার কথা মনে পড়লে স্বর্ণর ভালো লাগে। দুদিন আগের ডাকে আসা তার চিঠিখানি স্বর্ণ কম করে দশবার পড়েছে। বাবা ডাকঘরের ছাপটা দেখে তাকে বলে দিয়েছেন যে চিঠি খানি আসতে দুমাস সময় লেগেছে। রজনীমাস্টার মশাই পৃথিবীর মানচিত্রে তাকে দেখিয়েছেন চিঠিখানি কোন কোন রাস্তায় এসেছে। খামটা হাতে নিয়ে মানচিত্রের দিকে স্বর্ণ চেয়ে ভাবতে থাকে যে মানচিত্রের নীল আর সবুজের মাঝখান দিয়ে রাস্তা বের করে কেমন ভাবে এই চিঠিটা এসেছে। ডাকটিকিটগুলি যেন কোন এক রহস্যময় জগতের বার্তা বহণ করে এনেছে। তারা চিঠিটিতে সমুদ্রযাত্রার কথাই বেশি করে লিখেছে। বিরাট

ঝড়ে বড় বড় ঢেউগুলির ধাক্কায় একবার তাদের জাহাজ খানি ডুবে যাওয়ার উপক্রম হয়েছিল। তারা বেশ কয়েকদিন অসুস্থ হয়ে বিছানাতে পড়ে ছিল। জাহাজের ডাক্তার ঔষধপত্র দিয়ে ভালো করলেন। এই পর্যন্ত লিখে তারা লিখেছে যে সমুদ্রের ঢেউ কোন রক্ত মাংসের মানুষের হাঁকডাক শোনে না। একমাত্র ভগবানই মানুষকে রক্ষা করতে পারেন। চিঠির শেষে স্বর্ণর মা - বাবার উদ্দেশে শ্রদ্ধা জানিয়ে সে লিখেছে যে বাড়ির কথা তার খুব মনে পড়ছে। ব্রণ্সণ্ সাহেব সুস্থ হলেই সে ফিরে আসবে।

বাইশ

এন্ট্রান্স পরীক্ষা শেষ হওয়ার পরে লক্ষেশ্বর বাড়ি যাবার জন্যে প্রস্তুত হল। যাবার আগে বিদায় নেবার জন্যে সে গুণাভিরাম বরুয়া আর বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর কাছে এল। 'জ্ঞানসভা'র যাতে মৃত্যু না হয় সেজন্য সে বরুয়া মশায়কে বারবার অনুরোধ জানাল। লক্ষেশ্বরের কর্তব্য নিষ্ঠা, নম্রতা আর বিনয়ীভাব গুণাভিরামের হৃদয় স্পর্শ করল। তিনি তাকে আর্শীবাদ করে বললেন যে 'জ্ঞানসভা' বাঁচিয়ে রাখার জন্যে তিনি চেষ্টার ত্রুটি করবেন না। তারপরে কথা উঠল লক্ষেশ্বরের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে। দীর্ঘশ্বাস ফেলে লক্ষেশ্বর বলল যে কলিকাতায় পড়তে যাওয়ার আশা সে ত্যাগ করেছে। সরকারী বৃত্তির দশ টাকায় কলিকাতার বোর্ডিং এ থাকার খরচা কুলো বেনা। ঘর থেকে সাহায্য পাওয়ারও কোনো আশা নেই। কারণ বাবার উপার্জনে গোটা সংসারের দুবেলা দু - মুঠোর ব্যবস্থা কোনোমতে হয়। সুতরাং এনট্রান্স পাশ করার পরে চাকরি করা ছাড়া গত্যন্তর নেই। কথাগুলি শুনেই গুণাভিরাম সজোরে প্রতিবাদ করে উঠলেন, "বাবা লক্ষেশ্বর আমি থাকতে তুমি এরকম কথা মুখে আনবে না। আমি চাই যে আমাদের অসমীয়া ছেলেরা উচ্চশিক্ষা পাক্। ইংরেজীতে দুটি বাক্য লিখতে পারা মানেই শিক্ষা শেষ হল আর চাকরীতে ঢুকলাম — এটাই জীবনের লক্ষ্য হওয়া উচিত নয়। আমি যতদিন বেঁচে আছি তোমাদের মতো ছাত্রদের উচ্চশিক্ষার জন্যে সাহায্য করাটাই আমি আমার কর্তব্য বলে মনে করি। তুমি চিন্তা কোরো না। পরীক্ষার ফল ভালো হলে আমি তোমাকে কলিকাতায় পড়ার ব্যবস্থা করে দেবো। সেখানে আমার পরিচিত লোক আছে। তোমার জন্যে কম খরচে থাকাখাওয়ার বন্দোবস্ত করে দেওয়া যাবে। খরচ যা লাগবে আমি দেবো।"

লক্ষেশ্বরের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হ'ল। হাকিম সাহেব কে অনেকক্ষণ ধরে প্রণাম করে সে বিদায় নি'ল। যাওয়ার সময় তার দুচোখের কোণ একটু ভিজে উঠেছিল। গুণাভিরামের উদার হৃদয়ের পরিচয় পেয়ে সে যেন হঠাৎই একটু বিচলিত বোধ করল।

লক্ষেশ্বর যাওয়ার দিন দুয়েক পরেই পঞ্চানন শর্মার ঘরে একটা সাংসারিক দুর্যোগ নেমে এল। লক্ষ্মীকে শ্বশুরবাড়ি পাঠানোর জন্যে কাপড় - চোপড়, খাট - পালঙ্ক, বাসন-

কোসন সমস্ত কিছুরই যোগাড়যন্ত্র হয়ে গিয়েছিল। যেদিন কলিয়া-বর থেকে লক্ষ্মীর স্বামী গোবিন্দ প্রসাদের আসার কথা সেদিন ভোর থেকেই পঞ্চানন শর্মার ঘরে এক শশব্যস্ত পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছিল। জামাইকে কোথায় বসানো হবে, কি খাওয়ানো হবে, কোথায় তিনি বিশ্রাম করবেন, সঙ্গে আসা লোকজনই বা কোথায় থাকবে এ সবকিছুই চিন্তা করতে হয়েছিল। বিয়ের পরে এই প্রথম জামাই আসছেন। তিনি যাতে কোনো ব্যাপারে ত্রুটি ধরতে না পারেন সেদিকে দৃষ্টি দেওয়া পঞ্চানন শর্মা একান্ত প্রয়োজন বলে মনে করেছিলেন। ফলে ভোর থেকেই তাঁকে বিশেষ ভাবে ঘরের ভেতরের এবং বাইরের কাজ দেখাশোনা করতে হচ্ছিল। জামাই দুপুরের ভাত খাওয়ার পরে এসে পোঁছাবেন। কলিয়াবর থেকে ভোর হওয়ার আগেই রাত্রিতে নৌকাতে তিনি যাত্রা করবেন। লক্ষ্মীকে নতুন কাপড় একজোড়া পরিয়ে রাখা হয়েছে। কিন্তু সিঁদুরের টিপটি এবং সোনার গয়না তার ম্লান মুখখানি উজ্জ্বল করতে পারেনি। অন্যকে দেখিয়ে দেখিয়ে কান্নাকাটির অভ্যেস লক্ষ্মীর নেই। কিন্তু পঞ্চানন শর্মা ও তাঁর স্ত্রী মেয়ের মুখের দিকে তাকাতে পারছিলেন না। বিশেষ করে শর্মার বারবার একথাই মনে হচ্ছিল যে তার প্রতি হয়ত অন্যায়ই করা হচ্ছে। লক্ষ্মীর বিয়ের দিন তাঁর এরকম লাগেনি। তখন শুধু কন্যাদায় থেকে মুক্তির কথাই তিনি ভেবেছিলেন। লক্ষ্মীর করুণ, অসহায় চাউনির প্রতি চোখ পড়লেই তাঁর মন খারাপ হতে লাগল। এই ছোট্ট বারো বছরের মেয়েটি শ্বশুর বাড়িতে যেন বৌয়ের ঝঞ্ঝাট সামলাতে পারবে? পঞ্চানন শর্মা সঙ্গে সঙ্গে নিজের মনকে সান্তনা দিলেন — সব মেয়েরাই পারে। লক্ষ্মীর মত বুদ্ধিমতী মেয়ে নিশ্চয়ই শ্বশুর-শাশুড়ী, স্বামী সবার বাধ্য হয়ে সুখে সংসার করতে পারবে।

এদিকে দুপুরের ভাত খাওয়ার সময় অনেকক্ষণ পার হয়ে গেল। পশ্চিমদিকে সূর্য ঢলে পড়ল। তখনও পর্যন্ত কলিয়াবরের কোনো খবর নেই। ঠিক সন্ধ্যা হওয়ার আগে দুজন লোকে খবর নিয়ে এল। সেইদিন সকালে লক্ষ্মীর স্বামী গোবিন্দ প্রসাদের মৃত্যু হয়েছে। চারদিন ধরে খুব জ্বর হয়েছিল। বৈদ্য কবিরাজের ওষুধে কোনো কাজই দিল না।

লক্ষ্মী নিজে মনখারাপের জন্যে গোটা দিনটা অভুক্ত রইল। বাড়ির লোকজন ইনিয়েবিনিয়ে কান্না শুরু করা মাত্র সে বাইরে দৌড়ে বেরিয়ে যাওয়ার চেষ্টায় ছিল। এই সময়ে তার মা হতভম্ব অবস্থায় তার কাছে এসে তাকে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে শুরু করলেন। লক্ষ্মী কিছু বুঝতে না পেরে "মা, কি হল" বলে চীৎকার করে উঠল। ইতিমধ্যে বেশ কিছু স্ত্রীলোক তাকে অভাগী, পোড়াকপালী বলে বিলাপ করতে লাগল। লক্ষ্মী আস্তে আস্তে কথাগুলো বুঝতে পারল। কিন্তু তার চোখ থেকে একটু ও জল বেরোল না। যে স্বামীকে সে ভালো করে দেখেই নি তার জন্যে সে কেন শোক করবে? আর বৈধব্য যন্ত্রণা বুঝতে তার এখনো অনেক বাকি আছে। লক্ষ্মী স্থির হয়ে মার কাছে বসে রইল। লোকেদের চীৎকার চেঁচামেচি তার খুব অসহ্য মনে হল।

বিষ্ণুপ্রিয়াকে খবরটা দিলেন কৃষ্ণ পন্ডিতের স্ত্রী। তিনি খবরটা পেয়ে একমুহূর্ত ও স্থির

থাকতে পারলেন না। পন্ডিত গিন্নীর সঙ্গে পঞ্চানন শর্মার বাড়ীতে গিয়ে উপস্থিত হলেন। আগের অপমানের কথা সেই মুহূর্তে আর তাঁর মনে এল না। বারবার খালি লক্ষ্মীর মুখ খানি মনে পড়ে তাঁর কান্না পাচ্ছিল। এই ফুলের মত কোমল মেয়েটি এত কষ্ট সহ্য করতে পারবে কি? পঞ্চানন শর্মার বাড়ি ইতিমধ্যেই নিকটস্থ প্রতিবেশী আর আত্মীয়স্বজনে ভরে গিয়েছিল শর্মা মাথায় ও কপালে হাত দিয়ে উঠোনে বসে ছিলেন। ঘরের ভেতরে লক্ষ্মী মার কাছে স্থির হয়ে বসে আছে। তাকে এরই মধ্যে গা ধুইয়ে গয়না গাটি খুলে সাদা থান কাপড় পরিয়ে দেওয়া হয়েছিল। সেইদিকে চেয়েই বিষ্ণুপ্রিয়া মুখ ফিরেয়ে নিলেন। স্ত্রীলোক গুলিকে তাঁর খুব নিষ্ঠুর বলে মনে হল। লক্ষ্মী কান্নাকাটি করেনি বলে সবাই মিলে তাকে তিরস্কার করছিল। দুঃখ করার ছলে তাঁরা তার সামনে ভবিষ্যতের এক ভয়ানক ছবি আঁকার চেষ্টা করছিলেন। কিন্তু লক্ষ্মী নির্বিকার ভাবেই বসে রইলো। বিষ্ণুপ্রিয়া আস্তে আস্তে গিয়ে তার কাছে বসলেন। হাকিম গিন্নী এসেছেন বলে দু-একজন স্ত্রীলোক একটু তৎপরতার সঙ্গে বসতে দেওয়ার আসন আনতে ছুটলেন। বিষ্ণুপ্রিয়া লক্ষ্মীকে জড়িয়ে ধরে বললেন,

"এই সব ব্যাপারে তোমার কোনো দোষ নেই, মা। জন্ম-মৃত্যু জগতের নিয়ম। কেউই এই সব নিয়ম ভাঙতে পারেনা। বিধবা হলেই মেয়েদের জীবন শেষ হয়ে যায় বলে ভাবাও ভুল। আজকাল দিন-কাল পাল্টেছে। তোমাকে সৎভাবে বাঁচার জন্যে রাস্তা একটা বার করে নিতে হ'বে। আমরা আছি তো, তোমার কোন চিন্তা নেই, মা।" বিষ্ণুপ্রিয়া ধৈর্যের সঙ্গে কথাগুলি বললেন যদিও শেষের দিকে তাঁর গলা কেঁপে গেল। তাঁর বেদনা-কাতর মুখখানি দেখে লক্ষ্মী বাঁধভাঙা নদীর মতো হাউ হাউ করে কাঁদতে আরম্ভ করল। যদি ও কেন কাঁদছে তা সে নিজেই জানে না। হয়তো এতক্ষণের কঠোর কথা বার্তা শোনবার পরে বিষ্ণুপ্রিয়ার মর্মস্পর্শী কথাগুলি তাকে এরকম বিচলিত করে তুললো।

তেইশ

পঞ্চানন শর্মা মেয়েকে শ্বশুর বাড়িতে পাঠালেন না। তাঁর হয়তো পাঠাবার ইচ্ছে ছিল। কিন্তু জামাইয়ের মৃত্যুর খবর দিতে আসা লোকের মুখে তিনি জানতে পারলেন যে শ্বশুরবাড়িতে সকলেই লক্ষ্মীকে কুলক্ষণা বলে মনে করছে। সেরকম ক্ষেত্রে মেয়েকে পাঠালে তার কি দুর্গতি হবে তা পঞ্চানন শর্মা অনুমান করতে পারেন। তার চেয়ে চোখের সামনে তার দুঃখ কষ্ট সহ্য করে থাকাটা দেখাই তিনি ভালো বলে বিবেচনা করলেন। কিন্তু সেটাও তাঁর পক্ষে কম কষ্টকর ছিল না। সোমও মেয়েকে বিধবার মাটির পাত্রে ভাত খেতে দিয়ে নিজেদের মাছ মাংস সহ খাওয়াদাওয়া করাটা শর্মা আর শর্মা পত্নীর কাছে

অসহ্য হয়ে উঠল। একদিন শর্মা পাবদা মাছের টক দিয়ে ভাত খেতে শুরু করার সময়েই রান্নাঘরের জানালা দিয়ে লক্ষ্মীর মুখখানি দেখে তৎক্ষণাৎ টকের বাটিটি সরিয়ে রাখলেন। শর্মাপত্নী হাউহাউ করে কেঁদে উঠলেন। লক্ষ্মী আগে মাছের টক না হলে ভাত খেতই না। এখন মাত্র মুগের ডাল দিয়ে ভাত খেতে বাধ্য হয়েছে।

নীতি নিয়ম, ব্রত উপবাসের শৃঙ্খল মেয়েটিকে ক্রমে ক্রমে কেমনভাবে চেপে ধরছে তা পঞ্চানন শর্মা দেখছেন। আগে ও তাঁদের বাড়িতে কয়েকজন বিধবাকে তিনি বৈধব্য ব্রত পালন করতে দেখেছেন, তাতে তিনি এতটুকু ও চিন্তিত হননি। সেগুলি তাঁর কাছে ছিল নিছক দৈনন্দিন জীবনের গতানুগতিক ঘটনামাত্র। কিন্তু এখন লক্ষ্মীকে দেখলেই তাঁর হৃদয় হাহাকার করে ওঠে। তাঁর বার বার গুণাভিরামের কথা মনে পড়ে। বিধবা বিবাহ তিনি কোনদিন সমর্থন করেন নি। কিন্তু ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মশায় লিখিত বিধবাদের বিরুদ্ধে যে সমস্ত সামাজিক অন্যায় এ যাবৎ হয়ে এসেছে, এখন তার তাৎপর্য যেন তিনি বুঝতে পারেন। সাধারণ মানুষ নিজেদের দেখা যে সমস্ত অভিজ্ঞতা উপলব্ধি করতে পারে না, বিদ্যাসাগরের মতো মনীষী সেইসব অভিজ্ঞতা দূর থেকে উপলব্ধি করে সেগুলির সঙ্গে একাত্মবোধ করতে পারেন। গুণাভিরাম এসব কথা তাঁকে আগেও কখনো কখনো বলেছিলেন। সেইকারণে পরিস্থিতি তাঁকে আবার 'বিল্বকুটীরে, টেনে নিয়ে গে'ল। আবারও প্রত্যেকদিন সন্ধ্যেবেলা তিনি হাকিমের বৈঠক খানাতে উপস্থিত হতে লাগলেন।

বরুয়ামশাই আর তাঁর পত্নী তাঁকে আগের মতোই আদর - আপ্যায়ন করলেন, প্রথম দু তিনদিন পঞ্চানন শর্মা দু একটির বেশি কথাবার্তা বলেন নি, চুপচাপ বসে থাকতেন। গুণাভিরাম ও তাঁকে প্রশ্ন করে বিরক্ত করতেন না। কিন্তু শর্মা নিজেই একদিন লক্ষ্মীর কথা বললেন। মেয়ের দুঃখ দেখে তাঁর যে মানসিক কষ্ট হচ্ছে তারও কিছুটা আভাস তিনি গুণাভিরামের সামনে দেওয়ার চেষ্টা করলেন।

"ভাগ্যে যা ছিল, হল। এখন মেয়েটিকে এই নরক যন্ত্রণা থেকে কেমন করে বাঁচানো যায় তার একটা উপায় বাৎলে দিন তো। বিধবা বিবাহ আমাদের সমাজে চলবে না। কখনও বা সেরকম নিয়ম চালু হলেও তাঁর জীবিত কালে হওয়ার আশা তিনি করেন না। আমাদের সমাজে আপনার মতো উদার মানসিকতার লোকই বা কজন? ফলে যদি অন্য কোন উপায় থাকত! মেয়েটি বুদ্ধিমতী। আমার ছেলেদের চেয়েও তার মগজে বুদ্ধি বেশি। যে দুদিন স্বর্ণের সঙ্গে পড়েছিল তখনই দেখেছি।"

গুণাভিরাম কিছুক্ষণ অন্যদিকে তাকিয়ে রইলেন। পঞ্চানন শর্মার মতো লোকাচারের প্রতি আত্মসমর্পন করা মানুষের ওপরে তাঁর মনে একধরনের বিতৃষ্ণার ভাব এসেছিল। কিন্তু একজন অসহায় পিতার দুর্বল কম্পমান কণ্ঠস্বর শুনে তিনি আর কঠোর হতে পারলেন না। যথেষ্ট কোমলস্বরে তিনি বললেন,

"আপনি ইচ্ছে করলেই সব করতে পারেন। কিন্তু তারজন্যে সাহসের দরকার। আজকাল কলিকাতাতে এরকম অল্পবয়সের বহু বিধবা মেয়েকে মা বাবারা স্কুলে পড়াচ্ছেন।

আমার পরিচিত দুজন মানুষ 'ভারতীয় মহিলা বিদ্যালয়' নামে একটি স্কুল ও প্রতিষ্ঠা করেছেন। বেথুন স্কুল তো আছেই। আপনি ইচ্ছে করলেই তার যে কোন একটিতে লক্ষ্মীকে পাঠাতে পারেন। আমি সব ব্যবস্থা করে দেবো। সেখানে থাকলে তার মনও ভালো থাকবে আর ভালো ভালো মানুষের সঙ্গ পেলে অনেক ভালো কথাও লিখতে পারবে।"

পঞ্চানন শর্মা সঙ্গে সঙ্গে কোনো উত্তর দিতে পারলেন না। কলকাতাতে ছেলে পড়ানোই যথেষ্ট বড় কথা। একটি মেয়েকে এতদূরে একলা একলা পাঠানোর কথাটা শর্মার কাছে অসম্ভব ব্যাপার। তারপরেও দুটি ছেলে থাকা সত্ত্বেও একজন মেয়ের পেছনে এত টাকা খরচ করার মানে ছেলে দুটির প্রতি অন্যায় করা হবে। শর্মা সেইজন্যে বলে উঠলেন"বুঝছেন তো, এইসব কথা ভালোভাবে চিন্তা করতে হবে।" এই মন্তব্যের সঙ্গে সঙ্গে তিনি প্রসঙ্গের ইতি টানলেন।

কিন্তু তাঁর ভাববার আগেই অতি শীঘ্র লক্ষ্মীর ভবিষ্যৎ সম্পর্কে একটি সিদ্ধান্ত নিতে হ'ল। একদিন কাছারী থেকে ফিরে তিনি ঘরে বসে চা জলখাবার খেয়ে একটু বিশ্রাম নিচ্ছিলেন। এরকম সময়ে ছায়ার মতো লক্ষ্মী চুপচাপ এসে তাঁর কাছে দাঁড়াল। সে আগের চেয়ে অনেক লম্বা হয়েছে। স্বাদহীন নিরামিষ খাবার খেয়ে ও তার শরীর স্বাভাবিক গতিতেই বিকশিত হচ্ছে। প্রকৃতির নিয়মে বিধবা সধবা সবাই সমান। শর্মা মেয়েকে কাছে বসিয়ে স্নেহের সুরে কি হয়েছে জিজ্ঞেস করলেন? লক্ষ্মীর দুই চোখ জলে ভরা। শর্মা বুঝতে পারলেন যে কোন কথাতে আঘাত পেয়েই সে তাঁর কাছে এসেছে। নাহলে সে সাধারণত তাঁকে এড়িয়েই চলে। বাবার ওপরে তার যেন মারাত্মক কিছু অনুযোগ আছে।

"বাবা, আমাকে সত্যি সত্যিই গোটা জীবন এরকম ভাবে থাকতে হবে? আমিই বা কি দোষ করলাম? তোমরা যা করতে বলেছিলে তাই করেছিলাম। এখন পিসিমা, কাকীমা সবসময় বলেন যে আমি নাকি কুলক্ষণা। আমার নাকি এখনো অনেক নরক যন্ত্রণা ভোগ করা বাকি আছে। বাবা, আমার জন্যে কিছু একটা করো।"

শর্মা অনেকক্ষণ কোন কথা বলতে পারলেন না। তারপর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, "হাকিম সাহেব তোকে কলকাতার স্কুলে পড়ানোর কথা বলেছেন। কিন্তু আমাদের মত মানুষের পক্ষে তা এক্কেবারে অসম্ভব। সমাজ আমাদের একঘরে করবে আর তোর নামে অনেক অপবাদ দেবে।"

বাবার প্রথমের কথাগুলি শুনেই লক্ষ্মীর মুখখানি হঠাৎ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। সে যেন এত অন্ধকারের মধ্যেও একটুখানি আশার আলো দেখতে পেল। পরের কথাগুলি সে ভালোভাবে শুনল না। বাবার হাতখানি খামচে ধরে সে বলে উঠল,

"বাবা তুমি আমাকে পাঠাবে তো? স্বর্ণকে নাকি কলিকাতায় পড়তে পাঠাবে, আমরা দুজনে তাহলে তো একসঙ্গে যেতে পারব।"

শর্মা গম্ভীর হয়ে গেলেন। মেয়ের ইচ্ছেতে জল ঢেলে দিতে তাঁর মন সায় দিচ্ছিল না।

স্বর্ণ বড়লোকের ঘরের মেয়ে। সে পড়াশুনো শেষ করলে ভালো একটি ছেলের সঙ্গে তার বিয়ে হ'বে। তুই পড়াশুনো করে কি করবি মা?"

"আমি শিক্ষয়িত্রী হতে চাই মেম সাহেবদের মতো।" লক্ষ্মী চট্‌পট্‌ উত্তর দিল। "নাহলে ডাক্তারনী হ'ব। খ্রিস্টান পট্টীর সুশীলা নামের মেয়েটি নাকি কলিকাতা থেকে ডাক্তারী পড়ে এসে এখন ধুবড়ীর দিকে সরকারী চাকরী করছে। আমি ও সেরকম চাকরী করব, বাবা।"

লক্ষ্মী অনেক আশা নিয়ে এক নিঃশ্বাসে কথাগুলি বলে বাবার মুখের দিকে চাইল। তার উৎসাহ দেখে বিষাদের মধ্যেও শর্মার মন একটুখানি খুশিতে ভরে উঠল।

"বুঝলাম, কিন্তু মেমসাহেব আর খ্রিস্টান মেয়েদের মতো তুই কেমন করে হবি লক্ষ্মী? আমাদের মতো ব্রাহ্মণ পরিবারের মেয়েকে কলিকাতায় পড়তে যাওয়া তুই যেন দেখেছিস? তাতে ও তোর মতো মেয়ে — " শর্মা 'বিধবা' শব্দটি মুখে আনতে গিয়ে থেমে গেলেন। লক্ষ্মীর কিন্তু সেদিকে ভ্রূক্ষেপই নেই। তার মনটা মুক্ত পক্ষ বিহঙ্গের মতো আকাশের দিকে পাখা মেলল। অনেকদিন বাদে সে আগের মতো অনর্গল কথা বলতে লাগল —

"বামুণদের বেশ কয়েকটি ছেলে তো কলিকাতা গেছে। খ্রিস্টান, ব্রাহ্ম এদের মেয়েরাও গেছে। আমি যাওয়ার পরে বামুণের মেয়েরাও আস্তে আস্তে যেতে আরম্ভ করবে।"

মেয়ের কথাবার্তা সব শর্মার কাছে ঠিক হাকিমের কথার মতোই মনে হল। তিনি তার মুখের দিকে চেয়ে তার আশাভরা কথাবার্তাগুলির প্রতি বিশ্বাস আনার চেষ্টা করলেন। কিন্তু সোনালী ভবিষ্যতের কথা ভেবে তিনি বর্তমানকে অস্বীকার করতে পারেন না। হতাশসুরে তিনি বললেন,

"সমাজের এতখানি পরিবর্তন হবে বলে আমার মনে হয় না। পুরনো নিয়মকানুন এত সহজে কেউই ভেঙে ফেলবে না। কলিকাতাতে দু-একটি লোক চিৎকার চেঁচামেচি করলেও কিছু হবে না। আমাদের এই অসম অপরিবর্তিত অবস্থাতেই থাকবে। তুই যদি এতই পড়াশুনোতে আগ্রহী তাহলে আমি খোঁজ খবর নিই। এখান কার বাংলা স্কুলে যদি সম্ভব হয় তাহলে ভর্তি করে দেবে।"

এত বড় মেয়েকে স্কুলে ভর্তি করানোর কথাটা বলতেই ঘরে যেন হুলস্থূল পড়ে গেল একদিকে বাবা আর মেয়ে আর অন্যদিকে সমস্ত পরিবারের মানুষ। 'পৃথিবীতে অতি অসম্ভব কান্ড' একটা করার চেষ্টা দেখে বাড়ির সকলেই শর্মাকে ধিক্কার দিল। লক্ষ্মী বাবার হয়ে ওকালতি করতে যাওয়াতে তার উপরেও অনেক শাপশাপান্ত বর্ষিত হল। শর্মা কিন্তু এবার নিজের সিদ্ধান্তে অটল অচল রইলেন এবং কারোর কথাই শুনলেন না। মেয়েদের বাংলা স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা চারুশীলা সেনের সঙ্গে কথাবার্ত বলে তিনি লক্ষ্মীকে ভর্তি করানোর ব্যবস্থা করে ফেললেন। লক্ষ্মী বয়সে বড় বলে এল পি (Lower Primary) স্কুলের ওপরের একটি শ্রেণীতে ভর্তির সিদ্ধান্ত নেওয়া হল। লক্ষ্মী নিজের বাড়িতে ও

ভালোমতো পড়াশুনো করেছিল। স্বর্ণের সঙ্গে সে 'বোরে - মতরা' পড়ে শেষ করেছিল। ফলে তার কোনো অসুবিধে হবে না বলে চারুশীলা দেবী রায় দিলেন। অবশ্য বাংলা ভাষাটি নতুন করে শিখতে একটু সময় লাগবে। কিন্তু লক্ষ্মীকে দেখার পরে তিনি মন্তব্য করলেন যে এ খুব তাড়াতাড়ি শিখতে পারবে বলে তাঁর বিশ্বাস হচ্ছে। প্রধান শিক্ষিকা দিদিমনিকে দেখে লক্ষ্মীর ও ভালো লাগল। তাঁর কথাবার্তা অন্য স্ত্রীলোকদের মত নয়। তাঁর মন উদার ও মুক্ত। বাবা তাকে বলেছিলেন যে তিনি স্বর্ণদের মতো ব্রাহ্ম। লক্ষ্মী ব্রাহ্মধর্ম সম্পর্কে কিছুই জানে না। কিন্তু এখনও পর্যন্ত যে কয়েকজন ব্রাহ্মর সঙ্গে মেলামেশা করেছে তাদের তার খুবই ভালো লেগেছে। চারুশীলা সেন প্রথমে তাকে দেখেই বলে উঠেছিলেন, "বাল্যবিবাহের করুণ পরিণতি।" কিন্তু তারপরে আর কোনদিন তাকে বুঝতে দেননি যে সে অন্য মেয়েদের থেকে আলাদা। স্কুলের বেশির ভাগ মেয়েই বাঙালী। কিন্তু লক্ষ্মীর সঙ্গে সবাই অসমীয়াতে কথা বলে। লক্ষ্মী ও কয়েকদিন পরেই দু - একটা ভাঙাভাঙা বাংলা বলতে আরম্ভ করল। খড়ের দুটি ঘরের স্কুলটি লক্ষ্মীর মনে অনেক আশার সঞ্চার করল। হঠাৎই যেন তার জীবনের গন্ডী পরিবর্তিত হ'ল। চারাগাছের মতো তার জীবনটাকে শুরুতেই মেরে ফেলবার চেষ্টা হয়েছিল যদিও সেটাই নতুন অবলম্বন পেয়ে তাড়াতাড়ি বেড়ে উঠতে লাগল।

চব্বিশ

এন্ট্রান্স পরীক্ষার রেজাল্ট বেরোবার দুদিন পরে লক্ষেশ্বর নগাঁও এসে পৌঁছাল। নগাঁও হাইস্কুলে একমাত্র সেইই প্রথম বিভাগে পাশ করেছে। খবরটা জানার পরে গুণাভিরাম বরুয়ার খুব আনন্দ হল। যেন নিজের কোনো আপ্নজন ভালোভাবে পাশ করেছে, তাঁর সেরকমই মনে হল। তাঁর কলকাতার বন্ধু দুর্গামোহন দাসকে তিনি সঙ্গে সঙ্গে চিঠি লিখে দিলেন সে যেন একটি ভালো ব্রাহ্মণ পরিবারে লক্ষেশ্বরের থাকার ব্যবস্থা করে দেয়। খরচা - পাতির সব দায়িত্ব তিনি নিজে নিলেন। দূর্গামোহণ দাসকে তিনি অন্য একটি কথাও লিখলেন, তা হল স্বর্ণর জন্যে বেথুনস্কুলের বোর্ডিং এ যেন একটি সিটের ব্যবস্থা ও করে দেয়।

পঞ্চানন শর্মার বাড়িতে ঘটে যাওয়া দুর্ঘটনাটির জন্যেই গুণাভিরামের মন ভীষণ অশান্ত হয়ে পড়েছিল। শিক্ষিত লোকেরাই যদি সমাজের কুপ্রথাগুলিকে উচ্ছেদ করার চেষ্টা না করে তাহলে অসমীয়া সমাজের দেখছি কোনোদিনই উন্নতি হবে না। এরকম একটি সমাজে তাঁর ছেলেমেয়ে কটি কি করে খাপ খাওয়াবে? স্বর্ণর জন্যে তিনি বিশেষভাবে চিন্তিত। মেয়েছেলে একটু বড় হবার সঙ্গে সঙ্গেই তাকে যদি সমাজের কুসংস্কারগুলি জাপটে ধরে, নগাঁওতে থেকে সে সেগুলির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে পারবে কিনা সন্দেহ।

এইসব কথা ভেবে তিনি ঠিক করলেন যে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তাকে তিনি কলকাতায় পাঠানোর ব্যবস্থাই করবেন। লক্ষেশ্বরকে কলিকাতায় পাঠানোর যোগাড় যন্ত্র করার সময় তাঁর মনে হয়ত আরও কিছু ছিল। কলকাতায় একলা একলা বোর্ডিং এ থাকার সময় লক্ষেশ্বর মাঝে মাঝে তার খবর নিতে পারবে। অবশ্য কলকাতায় তাঁর আরও অনেক বন্ধু বান্ধব এবং শুভাকাঙ্খী আছে। কিন্তু তবুও, লক্ষেশ্বর তাঁর বাড়ির ছেলের মতো। ভগবানের কৃপায় হয়তো কখনো সে তাঁর নিজের ছেলেই হয়ে যাবে। লক্ষেশ্বরের ওপর তাঁর ভীষণ আস্থা। সে পড়াশুনো করে একজন উদার প্রকৃতির বিদ্বান লোক হবে বলে তাঁর বিশ্বাস। আর স্বর্ণর জন্যে তিনি সে রকমই একজন উপযুক্ত পাত্রের আশা করেন।

কলিকাতা যাওয়ার ব্যাপারে লক্ষেশ্বরের বিশেষ কিছুই করতে হল না। তার নিজের কাপড় - চোপড়গুলি গোছানো হলে জ্ঞাতি কুটুম্বের বাড়িতে বাড়িতে ভাত খেয়ে আর বিদায় নিতে নিতেই সময় চলে গেল। তার থাকা - খাওয়ার ব্যবস্থা থেকে আরম্ভ করে স্টিমারের টিকিট কাটা পর্যন্ত সবই গুণাভিরাম করলেন। বরুয়া সবারই প্রথম শ্রেনীর টিকিট কাটতে চাইলেন কিন্তু লক্ষেশ্বরে তার জন্যে দ্বিতীয় শ্রেনীর টিকিট কাটতে অনুরোধ করল। নগাঁওর অন্য একটি পরিচিত ছেলেও কলিকাতা যাবে। অতএব সে দ্বিতীয় শ্রেণীতে যাবে কারণ তানাহলে তার পক্ষে প্রথম শ্রেনীতে যাওয়াটা দেখতে খারাপ লাগবে। যাওয়ার সময় মা বাবা লক্ষেশ্বরের নিকট মাত্র একটিই প্রতিশ্রুতি চাইলেন তা হল সে যেন তাঁদের অমতে কোথাও বিয়ের কথা না দেয়। লক্ষেশ্বর তাঁদের সন্দেহের কারণ বুঝতে পেরে মায়ের গা ছুঁয়ে শপথ করল যে বিয়েথার ক্ষেত্রে সে সবসময় তাঁদের মতে চলবে। লক্ষেশ্বরের কাছ থেকে এই আশ্বাস পেয়ে কটকী আর কটকী গিন্নী নিশ্চিন্তভাবে তাকে বিদায়ী আশীর্বাদ করলেন। বাবা যাওয়ার সময় দশ টাকা তার হাতে দিয়ে নিজের পিতৃত্বের কর্তব্য শেষ করলেন। লক্ষেশ্বরের এর পরে বাড়ির সাহায্য ছাড়া শুধুমাত্র সরকারী বৃত্তিতে কলিকাতায় কেমন করে চলবে সে কথা জানবার কোনো কৌতুহল তাঁরা দেখালেন না। লক্ষেশ্বর খুবই করিত কর্মা ছেলে। সে কিছু একটা ব্যবস্থা করবে এ বিশ্বাস তাঁদের ছিল। হাকিম সাবেরের সঙ্গে অন্য সম্পর্ক না রেখেই তাঁর কাছ থেকে আর্থিক সাহায্য নেওয়াটা তাঁরা দোষের বলে মনে করলেন না।

'বিল্বকুটীরে' কলিকাতা যাত্রার আয়োজন পূর্ণোদ্যমে চলতে লাগল। স্বর্ণকে রেখে আসার জন্যে পুরো বরুয়া পরিবারের কলিকাতা যাওয়া ঠিক হল। বিষ্ণুপ্রিয়া মেয়েকে নিজে কলিকাতায় গিয়ে সব দেখেশুনে এলে তবে তাঁর মন মানবে। ছোট্ট নবছরের মেয়েটিকে দূর দেশে একলা রেখে আসার কথা ভেবেই তাঁর মন কেঁদে উঠল। কিন্তু স্বর্ণের সামনে একবার ও তিনি চোখের জল ফেলেন নি। এদিকে কলিকাতা যাওয়ার প্রস্তুতি দেখে স্বর্ণর মনে হয়েছিল তারা যেন আগের মতই আবারও কোথাও বেড়াতে বেরোবে। বাবার মুখে কলিকাতার কথা শুনে তার মনে হয়েছিল যে কলিকাতা একটি বিচিত্র স্বপ্নপুরী। মা বাবাকে ছেড়ে সেখানে একা থাকলে তার মন খারাপ হবে এই চিন্তা করার বয়স তার তখনো হয়নি।

যাত্রার দিন যত এগিয়ে আসতে লাগল তত বিদায় জানাবার পর্ব আরম্ভ হ'ল। নগাঁওর বেশ কয়েকটি ব্রাহ্ম পরিবারের সঙ্গে বরুয়াদের সুসম্পর্ক ছিল। তাছাড়াও দু - একটি সম্ভ্রান্ত অসমীয়া আর মাড়োয়ারী পরিবারের সঙ্গে ও তাঁদের আসা - যাওয়া ছিল। তাঁদের মধ্যে অনেকেই স্বর্ণকে বিদায় জানাবার উদ্দেশ্যে বরুয়া পরিবারকে চা এবং ভাত খাওয়ার নিমন্ত্রণ করলেন। প্রত্যেকেই স্বর্ণকে আশীর্বাদ সহ নানাধরনের উপদেশ দিলেন। গুরুনাথ দত্তের একটি ভাইঝি কলিকাতায় পড়ার উদ্দেশ্যে দুমাস আগেই সেখানে গিয়ে 'ভারত আশ্রমে' থাকা তার পিসীর বাড়িতে ছিল। কেশবচন্দ্র সেন আর তাঁর অনুগামী সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সভ্যবৃন্দ এক মহান আদর্শের ভিত্তিতে 'ভারত আশ্রম' গড়ে তুলে ছিলেন। এই আশ্রমের ব্রাহ্মরা একটা পরিবারের মতো থাকাখাওয়া, উপাসনা ও অধ্যয়ন ইত্যাদির বাইরেও স্ত্রীশিক্ষার প্রসারের জন্যে নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করতেন। কিন্তু কলিকাতার থেকে আসা কিছুদিন আগের চিঠিখানি পেয়ে গুরুনাথ দত্ত বুঝতে পেরেছিলেন যে 'ভারত আশ্রমের অবস্থা খুব একটা ভালো নয়। ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন আর 'ভারত আশ্রমে'র মহিলাস্কুলের শিক্ষক শিবনাথ শাস্ত্রীর মধ্যে শিক্ষা পদ্ধতি এবং আরও কিছু রীতিনীতি নিয়ে মনোমালিণ্য ঘটেছে, তার ফলে অধিকাংশ উদারপন্থী ব্রাহ্ম 'ভারত আশ্রম' থেকে বেরিয়ে গেছেন। গুরুনাথ দত্তই গুণাভিরামকে আক্ষেপের সঙ্গে কথাকটি বল'লেন। কিন্তু গুণাভিরামের উত্তরে হতাশার সুর ছিল না। তিনি বল'লেন ''যে শিবনাথ শাস্ত্রী আর তাঁর সাঙ্গোপাঙ্গরা যে 'সমাজদর্শী পার্টি' গঠন করেছেন সেইটি ব্রাহ্মদের যুগ সচেতন - তাই প্রকাশ করছে। একটা সময় ছিল যখন কেশবচন্দ্র সেনকে সকলে সমাজসংস্কারকদের একমাত্র নেতা বলে মেনে নিয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর শেষের দিকের কার্যকলাপ একথাই প্রমাণ করল যে মুনিঋষির ও মতিভ্রম হয়। নতুন একশ্রেণীর ব্রাহ্মরাই এখন সমাজখানিকে আধুনিক ভাবধারার মাধ্যমে অগ্রসর করতে চাইছে। এইজন্যে হতাশ হওয়ার কোন কারণ নেই।''

''কিন্তু স্ত্রীশিক্ষা আর নারীমুক্তির বিষয়টা নিয়ে দুটি দলের মাঝে খেয়োখেয়ি ও মতাণৈক্য চলছে। সেটা কি ভালো কথা?''

''স্ত্রী শিক্ষার বিষয়ে দেখছি পৃথিবীর প্রাগ্রসর অনেক দেশেও বহু তর্ক বিতর্ক চলছে। কেশবচন্দ্র সেনের মতো পশ্চিমের অনেক লোকেই বিশ্বাস করে যে স্ত্রী লোকদের পুরুষের সঙ্গে একই ধরনের শিক্ষা দেবার প্রয়োজন নেই। আধুনিক মানসিকতার পুরুষের যোগ্য পত্নী হওয়ার জন্যে যতটুকু শিক্ষার প্রয়োজন ঠিক ততটুকু দিলেই যথেষ্ট। দুবছর আগে আমাদের চোখের সামনেই কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে দুজন মেয়ে ছেলেদের সঙ্গে সমানে পরীক্ষা দিয়ে সুখ্যাতির সঙ্গে এনট্রান্স পাশ করে গেছে। সুতরাং এখন স্ত্রীশিক্ষার বিষয়ে ও নতুন ভাবনাচিন্তার প্রয়োজন আছে। কেশবচন্দ্র সেনের ধারনাগুলি এক্ষেত্রে পুরনো।''

গুণাভিরামের সঙ্গে আলোচনা করে গুরুনাথ দত্ত ঠিক করলেন যে রাণুকে ও বেথুণস্কুলে ভর্তি করলে ভালো হবে। অবশ্য সে হোস্টেলে থাকবে না। পিসির সঙ্গে থেকে পড়বে।

দত্ত স্বর্ণকে রাণুর পিসির ঘরে রাখার কথা বললেন। কিন্তু গুণাভিরাম আর বিষ্ণুপ্রিয়া অন্যের ঘরে মেয়েকে রাখাটা ভালো মনে করলেন না। বোডিং - এ ভালো শিক্ষয়িত্রীর তত্ত্বাবধানে থাকাটাই তাঁরা উপযুক্ত মনে করেন। দত্ত যদিও খাওয়া দাওয়ার কষ্টের কথা বললেন তথাপি সেদিকে তাঁরা বিশেষ গুরুত্ব দিলেন না। মেয়ের মানসিক বিকাশের উপরই তাঁরা বেশি জোর দিলেন মুখের রুচি অনুযায়ী খাওয়াদাওয়ার উপর নয়।

স্বর্ণ নিজের দিক থেকে মাত্র একজনের বাড়িতে যাওয়ারই ইচ্ছে প্রকাশ করল। তারার মাকে সে অনেকদিন দেখেনি। মেয়ে আমেরিকা চলে যাওয়ার পরে গোলাপী বাইরের ঘোরাঘুরির কাজ বেশি করে নিয়েছে। ঘরে থাকলে তার নিজের ভীষণ একলা মনে হয়। সেই কারনে বেশ কয়েকবার সে মেয়েদের সঙ্গে ক্যাম্পে গেছে। রহা আর ফুলগুড়ির হাটে গিয়ে দু - একবার ধর্মপ্রচারও করেছে। হাটের একদিকে বানানো অস্থায়ী চালাঘরের তলায় বসে গোলাপী আর পাদরী মেমেরা যিশুর ছবি আর অসমীয়া ভাষাতে ছোটখাট ধর্মগ্রন্থ লোকেদের মাঝে বিলিয়ে দিয়েছে। দু - একজন মূল্য হিসেবে একটা বা দুটো পয়সা কখনো বা দিয়ে যায়। না দিলেও সমস্যা নেই। লোকজনের সমাবেশ বেশি হলে মেমেরা ছবি দেখিয়ে একটা গল্প বলে বা ছোটখাট একটি বক্তৃতা দেয়। অসমীয়া শব্দগুলি ভুলে গেলে মেমেরা গোলাপীর শরণাপন্ন হন। গোলাপী সেইজন্যে বিষ্ণুপ্রিয়ার কাছে বেশি আসতে সময় পায় না। কিন্তু বিষ্ণুপ্রিয়ার তাকে প্রায়ই মনে পড়ে। স্বর্ণ তাই গোলাপীর বাড়িতে গিয়ে বিদায় নেবার কথা বলতে তিনি তাকে নিয়ে খ্রিস্টান পল্লীতে গোলাপীর ঘরে উপস্থিত হলেন।

সেইদিন ছিল রোববার। রোববার বিকেলে গোলাপী সাধারণত ঘরেই থাকে। ভোরবেলা গীর্জাতে যাওয়ার পরে সে মেয়েকে চিঠি লেখে, আর সেলাইয়ের কাজ - কর্ম করে। যদি অবসর পায় তাহলে এমনি একলা বসে থাকে। হাকিমের ঘোড়ার গাড়িটি তার ঘরের সামনে এসে দাঁড়াবার সঙ্গে সঙ্গে গোলাপী আশ্চর্য হয়ে গেল। স্বর্ণ আর বিষ্ণুপ্রিয়াকে দেখে সে খুব ব্যস্তভাবে এগিয়ে গিয়ে তাঁদের ভেতরে ডেকে আনল। পরিপাটি করে সাজানো বসবার ঘরে সে তাঁদের বসাল। ঘরটি পরিস্কার - পরিচ্ছন্ন। জানালায় সাহেবদের বাংলোতে লাগানো পর্দার মতোই ফ্রিল দেওয়া ছোটখাট পর্দা। বেড়ায় মা মেরীর কোলে শিশুযিশুর একটি ছবি। তার তলায় মেঝেতে মোমবাতি জ্বালা একটি মোমদানী আর একটি অসমীয়া ভাষায় অনুদিত বাইবেল। মেঝের উপর একটি সুন্দরভাবে ফুল তোলা কাপড় পাতা। সেটি তারার নিজের হাতে করা। ঘরটিতে যে দুটি চেয়ার আছে দেখলেই অনুমান করতে পারি যে তা সাহেবদের বাংলো থেকে আনা হয়েছে। ব্রণ্‌সণ্‌ সাহেব যাওয়ার সময় চেয়ার দুটি তাঁকে দিয়ে গেছেন।

গোলাপী খুব আগ্রহ নিয়ে স্বর্ণর কলিকাতায় পড়তে যাওয়ার কথা শুনল। যদিও কলিকাতায় যায়নি, তবু ও সাহেব মেমদের মুখে শোনা কলিকাতার কথার উপর ভরসা করেই তারই দু - একটি কথা উপদেশ হিসেবে সে স্বর্ণ আর বিষ্ণুপ্রিয়াকে বলল। এই

ছোটখাট উপদেশগুলি অভিজ্ঞ লোকের মতো গোলাপীকে বলতে দেখে বিষ্ণুপ্রিয়ার পেট হাসিতে ফুলে উঠছিল। কিন্তু তাঁর ব্যবহারে তা একবার ও বাইরে প্রকাশ করলেন না।

তারার প্রসঙ্গ আসার সঙ্গে সঙ্গে গোলাপীর মুখখানি উজ্জ্বল হয়ে উঠল। তারা নাকি আমেরিকাতে নার্সে'র শিক্ষা নিচ্ছে। ব্রণ্সণ্ সাহেবের শরীর যদিও একটু সুস্থ হয়েছে, তবুও তিনি তাড়াতাড়ি হয়ত আসতে পারবেন না। ফলে অসমের এরকম অন্য একটি মিশনারী পরিবারের সঙ্গে তারা দুমাসের মধ্যে ফিরে আসবে। মেয়েকে দ্রুত দেখতে পাওয়ার আশায় গোলাপী দুবছরের নিঃসঙ্গতা ভুলে গেলেন। বিষ্ণুপ্রিয়া যেন গোলাপীর মনের অবস্থা বুঝতে পারলেন। স্বর্ণর বাড়িতে আসবার সময় হলে তাঁরও মনটা কিজানি এরকমই লাগবে।

একটুখানি বসবার পরে স্বর্ণ যাওয়ার জন্যে প্রস্তুত হল। গোলাপী তাঁদের অপেক্ষা করতে বলে ভিতরে গিয়ে একটা সুন্দর ফুল তোলা বালিশের ঢাকা এনে স্বর্ণর হাতে দিয়ে বললেন, "সোনামা, বোর্ডিংয়ে থাকবার সময় এইটি তুমি তোমার বালিশে লাগিয়ে নেবে। তাহলে তখন আমাদের মনে পড়বে। আমি এটা তারার জন্য করেছিলাম। কিন্তু তুমিও আমার কাছে তারার মতোই।" স্বর্ণ লজ্জার হাসি হেসে উপাহারটি নিল। বিষ্ণুপ্রিয়া তার হয়ে গোলাপীকে ধন্যবাদ জানিয়ে বিদায় নিলেন।

পঁচিশ

নগাঁওর থেকে শিলঘাট প্রায় বত্রিশ মাইলের রাস্তা। ঘোড়ার গাড়িতে যেতে দশ - বারো ঘন্টা সময় লাগে। রাস্তায় দুবার ঘোড়া বদলাতে হয়। বরুয়া হাকিমের পরিবারটি ভোরবেলা যাত্রা করে বিকেল ছটা সাতটার সময়ে শিলঘাট গিয়ে পৌছোলেন। ভাগ্যক্রমে 'রাজমহল' নামের স্টিমারটি তাঁরা গিয়ে পৌছেবার সঙ্গে সঙ্গে কোকিলামুখ থেকে শিলঘাট পৌছেছিল। শিলাঘাটে স্টিমার রাত্রির জন্যে নোঙর ফেলল। অনেক বাঙালি আর অসমীয়া যাত্রী পাড়ে নেমে পরিচিত লোকদের সঙ্গে কথাবার্তা বলাতে এক হূলস্থূল পরিবেশের সৃষ্টির হয়েছে। দু একজন আবার কাছাকাছি আত্মীয় বাড়িতে রাত্রিটা কাটাবার জন্যে গেছেন। কিন্তু বেশির ভাগ লোকই রাত্রিতে স্টিমারে থাকবেন, কারণ রাত্রি প্রভাত হবার সঙ্গে সঙ্গেই স্টিমার ছেড়ে দেবে। যে সব লোক নীতিনিয়মের জন্যে স্টিমারের 'খাবার' খান না, তাঁরা তীরে কাপড়ের আড়াল দিয়ে ভাত রান্নায় ব্যস্ত। বরুয়া পরিবার উপস্থিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই লক্ষেশ্বর এগিয়ে গিয়ে খবর দিল যে বরুয়া দিদির জন্যে রান্নাবান্নার ব্যবস্থা সে করে রেখেছে। কিন্তু বিষ্ণুপ্রিয়া হেসে বললেন যে, "বাবা, তোমরা ছাত্রেরা কজনে একসঙ্গে খাওয়াদাওয়া করো। আমার জন্যে সঙ্গে আসা বামুনটিই রান্না করবে।"

লক্ষেশ্বর গোরুর গাড়িতে আগের দিনই ভোরে শিলঘাট পৌছেছিল। সঙ্গের নগাঁওর

ধরনীকান্ত নামের ছেলেটি একটি সরকারী বৃত্তি পেয়ে কলিকাতা যাওয়ার জন্যে প্রস্তুতি নেওয়াতে ফলে তারা দুজনেই একই সঙ্গে আসছিল। লক্ষেশ্বরদের দ্বিতীয় শ্রেনীর টিকিট। স্টিমারে সিট নেবার সময় শিবসাগর থেকে আসা আরও দুজন অসমীয়া ছাত্রের সঙ্গে তাদের পরিচয় হল। সুতরাং এই স্টিমারে কলকাতা যাওয়া ছাত্রদের সংখ্যা হল চারজন। বরুয়া পরিবারের ছিল প্রথম শ্রেনীর টিকিট। ফলে তাঁরা নিজেদের জন্যে একটি 'কেবিন' পেলেন। 'কেবিণে' বাকি যাত্রীরা সকলেই ছিলেন সাহেব মেম। তাঁদের দু একজনকে চিনতে পেরে গুণাভিরাম কথাবার্তা বললেন। বিষ্ণুপ্রিয়া ছেলেমেয়েদের খাইয়ে - দাইয়ে কেবিনে শুইয়ে রেখে নিজে পারে গিয়ে ভাত টাত খেয়ে স্টিমারে উঠলেন। স্বর্ণ বাবার সঙ্গে স্টিমারে রাত্রের খাবার খেতে গেল। চারিদিকে সাহেব - মেমদের মাঝখানে বসে কাঁটা - চামচেতে করে খাওয়ার সময় স্বর্ণ খুব অস্বস্তি অনুভব করল। কিন্তু গুণাভিরাম বাড়িতে এরকম পরিস্থিতিতে খাপখাওয়ানোর উপযুক্ত করে মেয়েকে এনেছিলেন। কাঁটাচামচে খাওয়ার শিক্ষা তাকে একমাস আগের থেকেই শেখানো হয়েছিল। কলিকাতার যে কোন পরিস্থিতির সঙ্গে যাতে সে খাপ খাইয়ে নিতে পারে তার জন্যেই এই বিশেষ প্রস্তুতি। স্টিমারে 'ডিনার' এর আগেই স্বর্ণ যখন ওপরে ডেকে দাঁড়িয়ে ব্রহ্মপুত্রের বুকে গোধুলির সূর্যাস্তের লালআলোর শোভা মুগ্ধ হয়ে দেখছিল, তখনই একটি আশ্চর্য ঘটনা ঘটেছিল। একজন ইউরোপীয়ান মহিলা স্বর্ণর ফর্সা রঙ মুখের সুন্দর আকৃতি এবং সাজ পোষাক দেখে তাকে ইউরোপীয়ান মেয়ে বলে ভুল করে ইংরেজীতে অনেককিছু জিজ্ঞেস করলেন। স্বর্ণ থতমত খেয়ে সামনাসামনি বাবার দিকে দৌড় দিল। ঠিক সেইসময়ে মহিলাটি বরুয়াকে চিনতে পেরে নিজের ভুল বুঝতে পারলেন। খাওয়ার সময় স্বর্ণরা যখন টেবিলে যাচ্ছিল তখন তিনি বরুয়াকে ডেকে বললেন,

''আপনার মেয়েটি খুব সুন্দর। আমার মেয়েটিও তারই বয়সের। ইংলান্ডে পড়ছে।''

গুণাভিরাম মহিলাটিকে জানালেন যে স্বর্ণও কলিকাতার বেথুন স্কুলে পড়তে যাচ্ছে। কথাটা শুনে ভদ্রমহিলা আগ্রহের সঙ্গে জানালেন যে তাঁর বান্ধবী মিস্ নিকলস্ সেই স্কুলের শিক্ষয়িত্রী। তাঁদের আপত্তি না হলে তিনি মিস্ নিকলস্কে স্বর্ণর পরিচয় দিয়ে একটি চিঠি লিখে দিতে পারেন। ভদ্রমহিলার স্বর্ণের প্রতি এরকম স্নেহ দেখে গুণাভিরাম অভিভূত হলেন আর চিঠিখানি লিখে দিতে অনুরোধ জানালেন। গোয়ালন্দ পর্যন্ত সমস্তপথ ভ্রমণ করার সময় মিসেস্ স্পেন্সার নামের সেই ইংরেজ মহিলাটি স্বর্ণ আর করুণাকে ভালোবেসে বিস্কুট, লজেন্স ইত্যাদি খেতে দিয়েছিলেন।

শিলাঘাট থেকে পরেরদিন ভোরবেলা স্টিমার ছাড়ল, স্বর্ণ ভাই করুণার সঙ্গে দিনের বেশিরভাগ সময় ডেকে বসে ব্রহ্মপুত্রের বুকের আর তীরের মনোরম দৃশ্যাবলী দেখতে দেখতে কাটিয়ে দিল। তেজপুরের কাছাকাছি পৌঁছে গুণাভিরাম আর বিষ্ণুপ্রিয়াই আগ্রহের সঙ্গে তীরের দৃশ্যাবলী তাদের আঙ্গুল দিয়ে দেখাতে লাগলেন। কলিয়াভোমরা শিল, অগ্নিপাহাড়, মহাভৈরব এইগুলির কথা স্বর্ণ মায়ের মুখে অনেক শুনেছে। তেজপুরের সঙ্গে

মা - বাবার কতোস্মৃতি জড়িয়ে আছে স্বর্ণ জানেই না। কিন্তু তার কাছে প্রতিটি নামের মধ্যেই যেন কোন না কোন পরীর দেশের গল্প আছে। মায়ের মুখে শোনা উষা - অনিরুদ্ধর গল্পটির সঙ্গে সে পাড়ের দৃশ্যগুলি মিলিয়ে দেখতে আরম্ভ করল।

স্টিমার তেজপুরে একটু বেশি বেলা পর্যন্ত থাকল। যাত্রীরা সেখানে দুপুরের ভাতটাত রেঁধে খেল। তারপরে স্টিমার আবার গুয়াহাটি অভিমুখে রওণা হল। সূর্যাস্তের পরে গোধুলির সময় গুয়াহাটির শুক্রেশ্বর ঘাটে স্টিমার লাগল। গুয়াহাটি পৌঁছোনোর আগে যাত্রীরা ব্রহ্মপুত্রের বুকে সূর্যাস্তের যে অপরূপ শোভা দেখতে পেলেন তা নিজে চোখে না দেখলে অকল্পনীয়ই থেকে যাবে। সামনে উমানন্দ আর তার পেছন দিকে নীল আকাশের দিকে চেয়ে শুয়ে থাকা নীলাচল পাহাড়। তার পায়ে মাথা রেখেছে কালাপাহাড় আর নরকাসুর। দেখে চোখে ধাঁধা লেগে যাবে এরকম একটি লালস্তম্ভের মতো ব্রহ্মপুত্রের বুকে সূর্য অস্ত গেছে আর চারিদিকে সৃষ্টি হয়েছে নানারঙের অপূর্ব খেলা। স্টিমারের পেছনদিকে সপ্তরঙা রামধনুর মতো ঢেউগুলি একটার পর একটা গিয়ে দূরে কলকল শব্দে নানারকমের রং ছড়িয়ে দিচ্ছে। এরকম দৃশ্য যে আগে দেখেনি তার কাছে সত্যিসত্যিই এ এক অপূর্ব অভিজ্ঞতা। 'রাজমহলে'র দেশী - বিদেশী সব যাত্রীই প্রকৃতির এই অপূর্ব খেলা দেখে তন্ময় হয়ে গিয়েছিল।

গুয়াহাটিতে কলিকাতায় যাওয়ার বেশিরভাগ যাত্রীই পাড়ে নেমে আত্মীয় স্বজনের বাড়িতে গেল। গুণাভিরাম বরুয়া আগেই খবর পাঠিয়েছিলেন বলে ভরলু মুখের ফুকনের বাড়ি থেকে তাঁদের নিতে ঘোড়ার গাড়ি পাঠানো হয়েছিল। বিয়ের পরে বিষ্ণুপ্রিয়া এই প্রথম ভরলুমুখের বাড়িতে আসছেন। এই বাড়িতেই বাবার মৃত্যুর পরে গুণাভিরাম বড় হয়েছিলেন। সৎমা আর সৎদাদার অনাদর অবহেলার বিপরীতে আনন্দরাম ঢেকিয়াল ফুকনের পাওয়া আদর যত্নের কথা গুণাভিরাম কখনই ভুলতে পারবেন না। ফুকনের বাড়িতে পা দিতেই তাঁর পুরনো কথাগুলি মনে পড়ে গেল। আনন্দরামের আদর যত্ন না পেলে তিনি হয়ত জীবনে এতদূর উন্নতি করতে কখনই পারতেন না। আনন্দরামের শ্যালিকা, তাঁর প্রথমা পত্নী ব্রজসুন্দরীকে নিয়ে এই বাড়িতে এসে ওঠার কথা গুণাভিরামের মনে পড়ে। বেচারীকে তিনি জীবনে কোনো সুখই দিতে পারলেন না। অথচ স্বামী হিসাবে সবরকমের কর্তব্য পালনের চেষ্টা তিনি করেছিলেন। হয়ত ব্রজসুন্দরীর ভাগ্যে সুখ ছিল না। পরিচিত দৃশ্যাবলীর মধ্যে গুণাভিরামের মন নানারকম হর্ষ - বিষাদের স্মৃতিতে ভরে গেল। কিন্তু বিষ্ণুপ্রিয়া স্বর্ণ আর করুণার কাছে সবই নতুন। আনন্দরামের ছোটছেলে অন্নদা আদর যত্নের সঙ্গে তাঁদের নিজের বাড়িতে ডেকে নিলেন।

বাড়ির লোকজনদের মধ্যে স্বর্ণর সবচেয়ে ভালো লাগল পদ্মাবতী দেবীকে। তিনি আনন্দরাম ফুকনের বড়োমেয়ে আর নন্দেশ্বর কটকীর পত্নী। তাঁর সুন্দর চেহারা, স্নেহভরা কথাবার্তা আর লেখাপড়ার প্রতি উৎসাহ দেখে স্বর্ণ অবাক হয়ে গেল। গুণাভিরাম আর অন্নদা ফুকনের সঙ্গে বসে তিনি ধর্ম, সাহিত্য আর দেশবিদেশের নানাকথা আলোচনা করলেন। সুস্বাদু বাঙালী রান্না করেও তিনি সেদিন স্বর্ণদের খাওয়ালেন। রাত্রিটা আনন্দের

সঙ্গে গুয়াহাটিতে কাটিয়ে পরদিন ভোরবেলা স্বর্ণরা আবার স্টিমারে ফিরে গেল।

গুয়াহাটিতে অনেক নতুন যাত্রীও স্টিমারে উঠল কলিকাতা যাওয়ার জন্যে। অবশ্য তাদের মধ্যে বেশিরভাগই ছিল ব্যবসায়ী। তাঁরা কলকাতা থেকে মালপত্র এনে অসমের বিভিন্ন জেলায় ব্যবসা করেন। কিছু যাত্রী ছিলেন যাঁরা কামাখ্যা দর্শণের জন্যে এসেছিলেন। বেশিরভাগই বাঙালি। দু - একজন ওড়িয়াও ছিলেন। অসমীয় যাত্রীর সংখ্যা সাধারণতঃ বেশি হয় না। কিন্তু সেইদিন পুরীর জগন্নাথ দর্শন করার জন্যে একদল অসমীয়া তীর্থযাত্রী গুয়াহাটিতে স্টিমারে ওঠার জন্যে সংখ্যাটা বেশি হয়ে গেল। স্টিমার ছাড়বার সঙ্গে সঙ্গে তীর্থযাত্রীরা খোল - মৃদঙ্গ বাজিয়ে নাম - কীর্তন গাইতে লাগলেন। নীচ থেকে ভেসে আসা সেই সুর শুনে স্বর্ণলতার খুব ভালো লাগছিল। কিন্তু ওপরের ডেকে বসে থাকা দু একজন সাহেব মেম্ বিরক্তি প্রকাশ করলেন। তারা একজন খালাসীকে ডেকে এনে কারা এত গন্ডগোল করছে জিজ্ঞেস করাতে সে বলল যে লোকেরা ভগবানের নাম করছে। সুতরাং যদি তাঁদের বাধা দেওয়া হয়, তাহলে অমঙ্গল হবে। ‘‘ভগবানের নাম মনে মনে নেওয়া যায় না কি’’ বলে গজর গজর করতে করতে সাহেবরা সেখানেই ক্ষান্ত হলেন। স্বর্ণলতা বুঝতে পারল যে স্টিমারের যাত্রীদের রুচি বিভিন্ন ধরনের। একজনের ভালোলাগা গান - বাজনা অন্যজনের কাছে ‘‘গন্ডগোল’’।

গুয়াহাটি থেকে ছেড়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দুইদিকের দৃশ্যাবলী পাল্টে যেতে লাগল। পাহাড় - পর্বতের পরিবর্তে অনেক দূর পর্যন্ত নল - খাগড়ায় ঢাকা বিস্তৃত অঞ্চল। নদীর মাঝে মাঝে অসংখ্য ছোট বড় বালির চড়া। সেইগুলির মাঝখানের গভীর জায়গা দিয়ে আঁকা - বাঁকা পথ ধরে স্টিমার এগোচ্ছিল। ভরা বর্ষাতে অনেক বালির চড়া ঢাকা পড়ে যায়। তখন চলাচলের সুবিধা হয়। কিন্তু কমজলে স্টিমার আটকে যাওয়ার ও ভয় থাকে। গোয়ালপাড়া পাওয়ার আগে এপারের হাদীরাচকীর পুরনো পাকা গুদাম ঘরের একটি অংশ অল্প অল্প দেখতে পাওয়া যাচ্ছিল। গুণাভিরাম স্ত্রী আর স্বর্ণকে সেইগুলি আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বললেন, ‘‘একসময় এই চক থেকেই বাংলার সঙ্গে আমাদের ব্যবসা - বানিজ্য চলেছিল। তখন এর জম জমাট অবস্থা। হাদীরা চকীর তত্ত্বাবধানে একসময় আমার পূর্বপুরুষ লক্ষীনারায়ণ ব্রহ্মচারী ছিলেন। আমার ঠাকুরদাদা পরশুরাম বরুয়া তাঁর সঙ্গে থেকে সব কাজ - কর্ম শিখে পরে হাদীরা চকীর দায়িত্বভার সুন্দরভাবে পালন করেছিলেন।’’

আনন্দরাম ঢেকিয়াল ফুকনের মুখে শোনা এই বংশ - বৃত্তান্ত গুণাভিরাম বিষ্ণুপ্রিয়ার কাছে অনেকবার বলেছিলেন। কিন্তু সেইদিন স্টিমারের রেলিং ধরে তিনি যখন হাদীরা চকীর অতীত ইতিহাস রোমন্থন করছিলেন তখন বিষ্ণপ্রিয়ার মনে হচ্ছিল তিনি যেন সত্যি সত্যিই অতীতে যাত্রা করেছেন। গুণাভিরাম যখন চাক্ষুষ বর্ননা দেওয়ার মতো হাদীরা চকীর যুদ্ধ, কাপ্টেন স্কটের অসম অভিযান, ব্রহ্মদের আক্রমনে অসমীয়া মানুষের দুরবস্থা ইত্যাদি ঘটনার বিষয়ে বলে যাচ্ছিলেন, তখন স্বর্ণ একবার জিজ্ঞেস করে ফেলল,

"বাবা, হাদীরা চকীর যুদ্ধ তুমি নিজের চোখে দেখেছিলে।"

উত্তরে গুণাভিরাম হেসে হেসে বললেন, "আমর বয়স আরও কুড়ি বছর বেশি হলে দেখতে পেতাম হয়ত।"

গোয়ালপাড়াতে সেইদিন রাতের জন্যে স্টিমার নোঙর ফেলল। বরুয়া পরিবার তীরে নামবার সঙ্গে সঙ্গে একজন মাড়োয়ারী ভদ্রলোককে দেখতে পেলেন। তিনি বরুয়াকে নিজের বাড়িতে নিয়ে যেতে চাইলেন যদিও গুণাভিরামের ইচ্ছে করল না। পরে লোকটি বাড়ির তৈরী খাঁটি দুধের মিষ্টি স্বর্ণদের পাঠিয়ে দিলেন। সেরকম সুস্বাদু মিষ্টি স্বর্ণরা নগাঁওতে কখনো খায়নি।

রাত্রে যাত্রীরা স্টিমারে শুতে যাওয়ার মুহূর্তে বাইরে একটা কোলাহল শুনতে পেল। কাছাকাছি অন্য একটি স্টিমার নোঙর ফেলল বলে সবাই বুঝতে পারল। কিন্তু রাত্রির অন্ধকারে কেউই কিছু দেখতে পেল না। পরেরদিন ভোরবেলা দেখা গেল সেই স্টিমারে চা - বাগিচাতে কাজ করবার জন্যে "চুক্তিবদ্ধ" কুলি আনা হয়েছে। "রাজমহলে"র যাত্রীরা কৌতুহলের সঙ্গে অন্য স্টিমারের লোকদের দেখতে লাগলেন। দেখে মনে হল স্টিমারে মানুষ একদম ভর্তি। বেশির ভাগ মানুষই ভীল, সাঁওতাল, মুন্ডা ইত্যাদি উপজাতির বলে মনে হল। পুরুষ, স্ত্রীলোক, ছেলে - মেয়ে সবই আছে। মানুষগুলিকে বোধ হয় স্টিমার থেকে নামতে দেওয়া হয়নি। ফলে তারা রেলিং এ ভর দিয়ে অসহায় দৃষ্টিতে অন্য স্টিমারটির দিকে তাকিয়ে রয়েছে। "রাজমহল" ছাড়ার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে অন্য স্টিমার থেকে একজন ঝাঁপিয়ে জলে পড়ল। চারদিকে হুলস্থুল লেগে গেল। দুটো স্টিমারের তলার ডেকের যাত্রীরা চীৎকার চেঁচামেচি করতে লাগল। জলে ঝাঁপিয়ে পড়া মানুষটি সাঁতার কেটে "রাজমহলে"র পেছন পেছন আসতে লাগল। অবশেষে কোন একজন স্টিমার থেকে একগাছি দড়ি ফেলে দেওয়াতে লোকটি দড়ি ধরে অনেক কষ্টে "রাজমহলে"র গা বেয়ে উপরে উঠে এল। দ্বিতীয় শ্রেণীর যাত্রীরা আর স্টিমারে খালাসীরা লোকটিকে ঘিরে ধরে নানারকম প্রশ্ন জিজ্ঞেস করতে লাগল। কিন্তু তার ফুঁপিয়ে বলা অস্পষ্ট কথা কেউই বুঝতে পারল না। শেষ একজন বাঙালী ভদ্রলোক ভাঙা ভাঙা সাঁওতালী ভাষায় তাকে দু একটি কথা জিজ্ঞেস করলেন। মানুষটি কেঁদে কেটে কথার উত্তর দিল। এবার সে ভদ্রলোকটির পায়ে ধরে অনুনয় বিনয় করে তাকে অনেক কথা বলল। ইতিমধ্যে স্টিমারটি আবারও নোঙর ফেলেছিল। ওপরের ডেক থেকে চা বাগানের এক ইউরোপীয়ান সাহেব সিঁড়ির ওপর থেকে চীৎকার করে আদেশ দিলেন যে লোকটাকে তৎক্ষণাৎ পারে নামিয়ে দিতে হবে। বাঙালি ভদ্রলোকটি একটু বেগে গিয়ে বললেন যে মানুষটি বিপদে পড়ে আশ্রয় চাইছে। তার স্ত্রী, ছেলেমেয়েরা সকলেই অসুস্থ হয়ে স্টিমারে মারা গেছে। সে আগের দিন থেকে কিচ্ছু খেতে পায়নি। সেইদিন ভোরবেলা স্টিমার থেকে নেমে যেতে চাইলে সর্দার তাকে মার - ধর করেছে। সে বাগানে কাজ করতে চায় না। নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে জোর করে নিয়ে গেলে তা মহাপাপ হবে। সুতরাং তাকে আশ্রয় দিয়ে কলিকাতায়

নিয়ে যাওয়াই উপযুক্ত কাজ হবে।

কথাগুলি শুনে চা-বাগানের সাহেব মালিক গর্জন করে উঠলেন, ''এই অলস ভিখারীদের আশ্রয় দেওয়া আমাদের কাজ নয়। তারা নিজেদের ইচ্ছেয় চুক্তি স্বাক্ষর করে এসেছে। এখন মাঝ-পথে ঠগবাজি করলে চলবে না। এটি ইংরেজ সরকারের আইন। আইন ভঙ্গ করার সাহস কার আছে, দেখছি''। সাহেবটি ভারতীয়দের উদ্দেশ করে বিদ্রুপের সুরে এসব বলে গেলেন। কেউই তাঁর বিরুদ্ধে যাওয়ার সাহস করল না। ইতিমধ্যে গুণাভিরাম বরুয়া এসে সাহেবের কাছে দাঁড়িয়েছেন। তিনি সমঝোতা করার জন্যে ইংরেজীতে বললেন, ''আইন ভঙ্গ না করে ও মানুষ মানুষের প্রতি দয়া-মমতা দেখাতে পারে। কুলিটিকে সর্দারের হাতে দেওয়ার আগে আমাদের তার কাছ থেকে আশ্বাস পেতে হবে যে সে যেন মানুষটির সঙ্গে খারাপ ব্যবহার না করে।''

সমস্যাসঙ্কুল পরিস্থিতিতে প্রত্যেকে কোনো মতে নিজের বিবেককে দূরে রেখে নিজেরা বাঁচতে চাইছিল। ফলে বরুয়ার কথা শুনে সাহেব - ভারতীয় সকলেই স্টিমার থেকেই সর্দারকে সাবধান করতে সম্মত হল। ইতিমধ্যে সর্দারটি মার মুখী ভঙ্গিতে হাতে লাঠি ঝাঁকিয়ে ঝাঁকিয়ে নদীর পাড়ে পাড়ে দৌড়ে আসছিল। ''রাজমহলে''র যাত্রীরা, বিশেষ করে সাহেবরা তাকে সাবধান করাতে সে একটু ঠান্ডা হল। বিড়বিড় করতে করতে তাদের কথা মানতে সম্মত হল। লোকটাকে এক রকম টেনে হিঁচড়েই সর্দারটি পাড়ে নিয়ে গেল। প্রতিটি যাত্রীই বুঝতে পেরেছিল যে সর্দারের মুখের কথা মূল্যহীন। কিন্তু মুখ ফুটে কেউই কিছু বলল না। বাঙালি ভদ্রলোক অবশ্য তাঁর ডায়েরীতে কিছু কথা লিকে রাখলেন। তিনি নাকি কলিকাতার সংবাদপত্রে অসমের চা বাগানের কুলীদের দুরবস্থার কথা লিখবেন। লক্ষেশ্বররা জিজ্ঞেস করে জানতে পারল যে এই ভদ্রলোকটি ''সঞ্জীবনী'' নামে বাংলা সংবাদপত্রের খবর সংগ্রহ করার জন্যে অসমে এসেছিলেন।

স্টিমার ছেড়ে দেবার পর ও অনেকক্ষণ স্বর্ণ ডেকের রেলিংয়ের কাছে দাঁড়িয়ে পারের নিষ্ঠুর দৃশ্যটি দেখছিল। স্টিমারের এতগুলো ছোট বড়ো মানুষ কেউই যে একজন দুঃখী মানুষকে বিপদ থেকে রক্ষা করতে পারল না সেই কথাটা তার মনে নির্মম আঘাত দিল। বড়ো বড়ো মানুষের প্রতি তার যেন শ্রদ্ধা কমে গেল। বাবাকে সে একবার জিজ্ঞেস করল,''বাবা, আমরা চলে যাবার পর সেই ভয়ংকর মানুযটি একে আবার মারবে নাকি?'' বাবা কোন উত্তর না দিলে না দেখে স্বর্ণ চুপ করে গেল।

ছাব্বিশ

ধুবড়ী, চিলামারী আর সিরাজগঞ্জ হয়ে কোন বিঘ্ন না ঘটিয়ে শেষে স্টিমার গোয়ালন্দ পৌঁছাল। ওখান থেকে কলকাতা রেলে একরাত্রির রাস্তা। গোয়ালন্দে হাতে যথেষ্ট সময় থাকায় ভারতীয় যাত্রীরা বাঙালী হোটেলে ভাত, সুস্বাদু মাছের চর্চরি আর মাছের ঝোল পেটভরে খেয়ে ট্রেনে চাপল। গুণাভিরামের পরিবার অবশ্য সঙ্গে নিয়ে যাওয়া রাধুনী বামুনের নদীর বালিতে উনুনের রান্না ভাত আর সঙ্গে কেনা মাছের ঝোল তৃপ্তির সঙ্গে খেলেন। গোয়ালন্দে স্বর্ণ আর তার ছোট ভাই করুণা জীবনে প্রথম রেলগাড়ি দেখল। বিস্ময় আর আনন্দে তারা আজ আত্মহারা। একটি প্রথম শ্রেণীর কামরায় বরুয়ার পরিবারটি উঠল। সেই কামরাতে আর অন্যযাত্রীর সিট ছিল না। ছোট- খাট একটি সু-সজ্জিত ঘরের মতো কামরাটির জানালা দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে স্বর্ণর এরকম অনুভূতি হল যে তাদের ঘরটি সচল হয়ে চলে যাচ্ছে। নগাঁও-এর 'বিল্বকুটীর' থেকে বেরোনোর পর তার জীবনটা যেন বিচিত্রগতিতে এগিয়ে চলেছে। এই যাত্রার শেষ কোথায় তা ভাববার সময় স্বর্ণ একবারও পায়নি। কেবল যাত্রা আর যাত্রাই যেন এখন তার জীবনের লক্ষ্য। অবশেষে সেই ট্রেন গিয়ে শিয়ালদহ স্টেশনে থামল। অসমের যাত্রীদের সঙ্গে দেখা করবার জন্যে সেখানে অনেক লোক অপেক্ষা করে আছে। তাদের মধ্যে গুণাভিরামের সঙ্গে দেখা করবার জন্যে বেশ কয়েকজন ছিলেন। লক্ষেশ্বরকে নিয়ে যাওয়ার জন্যে রজনীনাথ রায়ের পাঠিয়ে দেওয়া লোকটিও ছিলেন এদের মধ্যে। তিনি লক্ষেশ্বরকে আগের থেকে বন্দোবস্ত করে রাখা কলেজ-স্কোয়ারের এক ব্রাহ্মণের বাড়িতে থাকার জন্যে নিয়ে গেলেন। লক্ষেশ্বর অবশ্য রাস্তাতেই অসমীয়া ছাত্রদের সঙ্গে কথাবার্তা বলে অন্য এক জায়গায় থাকার বন্দোবস্ত করে ফেলেছিল। তবে প্রথমে ও গেল গুণাভিরাম বরুয়ার ব্যবস্থা করে দেওয়া জায়গাটিতে।

স্বর্ণদের নেবার জন্যে ব্যারিস্টার আনন্দ মোহন বসুর বাড়ি থেকে ঘোড়ার গাড়ি পাঠানো হয়েছিল। বসু পরিবারের সঙ্গে গুণাভিরামের বহুদিনের পুরনো বন্ধুত্ব। কলিকাতা গেলে সবসময়ই গুণাভিরাম তাঁদের বাড়িতে থাকেন। আনন্দ মোহন ও তাঁর ভাই ডাঃ মোহিনী মোহন বসু সেই সময়ের বাংলার প্রসিদ্ধ পণ্ডিত। সুতরাং তাঁদের বাড়িতে কলকাতার প্রথম শারির পণ্ডিত এবং বুদ্ধি জীবীদের সমাগম হয়ে থাকে।

ঘোড়ার গাড়িতে শিয়ালদহ থেকে বসু বাড়ি যাবার পথে স্বর্ণ আর করুণার কোন এক স্বপ্নপুরীতে ঘুরে বেড়ানোর কথা মনে হল। বড়ো বড়ো দালান, দোকান-দামী, যান - বাহন আর অগুনতি মানুষের স্রোত দেখে ছেলে - মেয়েদুটি অবাক বিস্ময়ে চারিদিকে দেখতে দেখতে যাচ্ছিল। তাদের কাছে মহানগরীর সব কিছুই অদ্ভুত। পথের ধারে পাকা চৌবাচ্চাতে পড়তে থাকা কলের জল হতে আরম্ভ করে রাজপথের চলন্ত ট্রাম গাড়ি — সবই যেন যাদুর খেলা। এদিক থেকে ওদিকে যাওয়া পথচারীদের দিকে চেয়ে চেয়ে স্বর্ণ

ভাবতে চেষ্টা করল যে লোকেরা কোনদিক থেকে আসছে এবং কোনদিকেই বা যাচ্ছে। নগাঁওতে সে এত তাড়াহুড়ো করে কাউকে যাতায়াত করতে দেখেনি। সেখানে যেন সকলেরই অফুরন্ত সময়। পথচারীরা একজন আর একজনকে কুশল জিজ্ঞেস না করে বা কৌতুহলের দৃষ্টিতে আপাদমস্তক না দেখে কখনই পেরিয়ে চলে যায়না। কিন্তু এখানে কারোরই কারোর দিকে চাইবার সময় নেই কিসের জন্যে এত ব্যস্ততা?

বসুবাড়ির সামনে গাড়ি গিয়ে পৌছানোর সঙ্গে সঙ্গে আনন্দ মোহন বসু এগিয়ে এসে গুণাভিরামকে জড়িয়ে ধরে আন্তরিক সম্ভাষণ জানালেন। ইতিমধ্যে বাড়ির মেয়েরাও বেরিয়ে এসেছিলেন। সাধারণ বাঙালি গৃহিণীদের মতো তাঁদের মাথায় লম্বা ঘোমটা ছিল না। বিষ্ণুপ্রিয়া দেখে অবাক হলেন যে ঘোমটা বিহীন অবস্থায় তাঁরা স্বামী ও বড়ো ভাসুরের সামনে হেসে হেসে কথা বলছেন এবং পায়ে তাঁদের স্যান্ডেল ও আছে। বিষ্ণুপ্রিয়াকে তাঁরা আগে দেখেননি। তাই নতুন কণের বরণ করার রীতিতে কৃত্রিম গাম্ভীর্যের সঙ্গে একটি থালায় প্রদীপ জ্বালিয়ে তাঁর মুখের সামনে সেটি ঘুরিয়ে তাঁরা তাঁকে বরণ করলেন। আনন্দ মোহনের পত্নী তাঁর মুখে একটি সন্দেশ গুঁজে দিয়ে তাকে জড়িয়ে ধরে একটি চুমু খেলেন। যদিও পুরো অনুষ্ঠানটিই হাসিতামাশার মধ্যে দিয়ে অনুষ্ঠিত হয়েছিল তথাপি বিষ্ণুপ্রিয়ার দুই গাল বেয়ে আনন্দাশ্রু ঝরে পড়ল। হয়ত বহুদিন আগে নতুন কণের বেশে পরশুরাম বরুয়ার বাড়িতে প্রথম পা দেবার কথাটা তাঁর মনে পড়ছিল। গুণাভিরামের সঙ্গে দ্বিতীয়বার বিবাহ হওয়ার পরে এই প্রথম তিনি এত আদর পেলেন। কিন্তু বিষ্ণুপ্রিয়া এইসব চিন্তার বেশি সময় পেলেন না। বসুপরিবারের আগ্রহ আর স্নেহের উৎপাত তাঁকে পুরনো কথা সব ভুলিয়ে দিল। স্বর্ণ, করুণা এবং শিশু কমলাও সকলের মনোযোগ আকর্ষণ করেছিল। স্বর্ণর গায়ের রং, নাক, চোখমুখ ও চুলের অনেক প্রশংসা হ'ল। আনন্দমোহণের স্ত্রী রসিকতা করে বললেন,

"গুণাভিবাবু, আমরা এতদিনে বুঝলাম যে অসমে গেলে আমাদের পুরুষেরা কেন কামাখ্যাতে ভেড়া হয়ে থেকে যায়।"

আর একজন ও তার সঙ্গে সুর মিলিয়ে বল'লেন,

"এখন কিন্তু আমাদের আরও বিপদ আসছে। স্বর্ণলতা কলকাতায় থাকলে আগামী পাঁচবছরে এই মহানগরীতে ভেড়ার ভিড়ে থাকার মতো আর অবস্থা থাকবে না।"

সবাই হোহো করে অট্টহাসি হেসে উঠলেন। স্বর্ণর গালদুটি টিপে দেওয়ায় গোলাপী হয়ে উঠেছিল। এখন এত লোককে তার সম্পর্কে আলোচনা করতে শুনে সে লজ্জায় লাল হয়ে মায়ের আঁচলে মুখ লুকোল। ভাই করুণাও এমন এক আশ্চর্য পরিস্থিতির সামনা সামনি হয়ে মায়ের আঁচল ধরে রইল। শিশু কমলাকে প্রত্যেকে একেক বার কোলে নেওয়ার জন্যে টানা হ্যাঁচড়া করাতে সে ডাক ছেড়ে কাঁদতে লাগল। শেষকালে ছেলেমেয়ে কটির অবস্থা দেখে সকলে ঠিক করলেন যে তাদের কিছুক্ষণ বিরক্ত না করাই ভালো।

এরপর এল ভোজন পর্ব। এতকিছু সুস্বাদ খাবার একসঙ্গে অতিথিদের সামনে রাখা

হল যে তারা কোন্‌টা খাবে আর কোন্‌টা খাবে না এটাই একটা সমস্যা হয়ে দাঁড়াল। খাবো না, করা সত্ত্বে ও গৃহিনীরা গুণাভিরাম আর বিষ্ণুপ্রিয়ার পাতে সবরকম ব্যঞ্জনই বেশি বেশি করে দিতে লাগলেন। স্বর্ণ আর করুণা প্রায় সব জিনিসেই বেশি করে ঝাল দেওয়া বলে খেতে না পারায় তাদের জন্যে মিষ্টি আনানো হল, আবার মিষ্টি ও এতো বড়ো যে সেরকম মিষ্টি স্বর্ণরা জীবনে দেখেনি। একটা খেলেই পেট ভরে যায়। দুটো মিষ্টি খাওয়ার জন্যে পীড়াপিড়ি করাতে করুণা কেঁদে কেটে অস্থির। তাদের অবস্থা দেখে বিষ্ণুপ্রিয়া, গুণাভিরাম আর বড়োরা সকলে খুব মজা পেলেন।

অতিথিদের ওপরে থাকবার ব্যবস্থা করে দেওয়া হল। সামনের চওড়া বারান্দার সঙ্গে দক্ষিণ মুখী ঘর কটিতে সুন্দর হাওয়া চলাচল করে। এরকম সুন্দর হাওয়া যে কলিকাতার মত কোলাহল পূর্ণ শহরের মাঝখানে বসেও পাওয়া যেতে পারে তা যেন অবিশ্বাস্য। বিশাল জগৎ ছেড়ে স্বর্ণ আর করুণা বারান্দার রেলিং ধরে অনেকক্ষণ মহানগরীর নানাছবি উপভোগ করে। দক্ষিণের হাওয়ার সুগন্ধ তাদের সমস্ত ক্লান্তির অবসান ঘটিয়ে দেয়। স্বর্ণর খুব বেশি করে ঘরের কথা মনে পড়ছিল। তার চিন্তার প্রকাশ হঠাৎ যেন করুণার কথায় ফুটে উঠল,

“দিদি, তোর এখানে থাকতে ভালো লাগবে?”

এই প্রশ্নটাই স্বর্ণ বারবার নিজেকে করতে চাইছিল। কলিকাতাতে মা বাবার সঙ্গে কিছুদিন থাকতে তার নিশ্চয়ই ভালো লাগবে। কিন্তু এরকম অচেনা জায়গায় অজানা লোকজনের সঙ্গে থাকার কথা ভেবেই তার পেট যেন ভয়ে সেঁধিয়ে যাচ্ছে। তবুও ভাইয়ের সামনে সে ভয় প্রকাশ করল না। তাই গম্ভীরভাবে সে উত্তর দিল,

“থাকতে থাকতে ভালো লাগবে নিশ্চয়ই। বাবা মাঝে মাঝে এসে তো থাকবেনই। কিছুদিন পরে পরে আমাকে বন্ধ হলে বাড়িতেও নিয়ে যাবেন।”

“তোর বাড়ির কথা মনে পড়বে না?” সে অবাক্ হয়ে দিদির দিকে চেয়ে জিজ্ঞেস করল।

স্বর্ণ এ কথায় উত্তর দিতে পারল না। ‘বিল্বকুটীরের’ দিনগুলির কথা মনে পড়ে। সে শোকে মূহ্যমান হয়ে পড়ল। দুচোখের জল বেরিয়ে রেলিংয়ের ওপর ঝরে পড়ল। করুণা কিংকর্তব্য বিমূঢ় হয়ে তার হাতখানি ধরে চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে। পরিস্থিতিটা যে বড়ো দুঃখজনক একথা সে বুঝতে পারছে।

সাতাশ

স্বর্ণকে বোর্ডিং এ রাখবার আগে গুণাভিরাম এক সপ্তাহ স্ত্রী আর ছেলেমেয়েদের কলিকাতা মহানগরী দেখালেন। এশিয়াটিক মিউজিয়াম, ফোর্ট উইলিয়াম, ইডেন উদ্যান, কালিঘাট ইত্যাদি দ্রষ্টব্য প্রায় সবজায়গাতেই তিনি তাদের নিয়ে গেলেন। চাঁদনীচক, বৌবাজার আর সাহেবমেমের বাজার নিউমার্কেটে গুণাভিরাম বাজার করলেন। স্বর্ণর জন্যে যাবতীয় জিনিষপত্র আর কাপড় - চোপড় কিনে দেওয়া হল। স্বর্ণ কিন্তু নতুন কেনা জিনিসের প্রতি তেমন আকর্ষণ বোধ করল না। বোর্ডিং এ যাওয়ার দিনটি যতই কাছাকাছি আসতে লাগল ততই ওর জন্যে কেনা নতুন জিনিসপত্রের দিকে তাকিয়ে তার মনখারাপ হতে লাগল। সে যদ্দুর সম্ভব এসবকে এড়িয়ে চলতে লাগল। তাকে অবশ্য মনমরা হয়ে ঘুরে বেড়াতে দেখলেই বসু পরিবারের কেউ না কেউ ডেকে নিয়ে যায় পিয়ানো বাজনা শোনবার জন্যে বা তাস খেলবার জন্যে। আনন্দমোহনের তিন তরুণী শ্যালিকা লাবণ্যপ্রভা, হেমপ্রভা আর চারুপ্রভা স্বর্ণকে এর মধ্যেই আপন করে নিয়েছিলেন। তাঁদের কাছে স্বর্ণ প্রথম শিখল যে তার নামটার উচ্চারণ 'স্বর্ণলতা'। অসমীয়াদের করা উচ্চারণ 'চর্ণলতা' নয়। স্বর্ণ স্বভাবে লাজুক, এখন নিজের ভুল উচ্চারণ সম্পর্কে সচেতন হয়ে কথা বলা পারত পক্ষে প্রায় বন্ধ করে দিল।

সেই কয়েকটাদিন সন্ধ্যেবেলা বসুপরিবারের বৈঠক খানাটিতে অনেক ব্রাহ্ম পরিবারের লোকের সমাগম হয়েছিল। সেই আড্ডাগুলিতে অনেক গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা, তর্ক - বিতর্ক এবং রসিকতাপূর্ণ কথাবার্তা হতো। ব্রাহ্মদের এইসব ঘরোয়া বৈঠকের এটাই বিশেষত্ব ছিল যে নারীপুরুষ সবাই এখানে সমানভাবে অংশগ্রহণ করতেন। বসুদের বৈঠকখানায় অন্যান্য মহিলাদের সঙ্গে বসে বিষ্ণুপ্রিয়া ও সমানভাবে কথা - বার্তা বলতেন। তিনি অবশ্য কথা কমই বলতেন। কিন্তু সকলের কথা মন দিয়ে শুনতেন। স্বর্ণ ও মায়ের কাছে বসত। বড়োদের মধ্যে বসে থাকা সে পছন্দ করত না, কিন্তু বিষ্ণুপ্রিয়া ও গুণাভিরাম চাইতেন যে সে বড়োদের মধ্যে থাকুক। আসন্ন বিদায়ের কথা ভেবে তাঁরা যতটা সময় তাকে কাছে রাখা যায় সে চেষ্টা করতেন।

একদিন সন্ধ্যেবেলা অতিথি হয়ে এসেছিলেন স্বপরিবারে দুর্গামোহন দাস, শিবনাথ শাস্ত্রী আর মনোমোহন ঘোষ। এই তিনজনই একসময়ে কেশবচন্দ্র সেনের প্রধান শিষ্য ছিলেন, যদিও এখন তিনজনেই তাঁর মতের ঘোর বিরোধিতা করেন। মনোমোহণ ঘোষের স্ত্রীর সম্পর্কে অনেক কথা বিষ্ণুপ্রিয়া শুনেছেন। বিয়ের পরে নতুন কনেবৌ থাকা অবস্থায় তাঁকে তাঁর স্বামী কলিকাতার লরেটো স্কুলের বোর্ডিংয়ে রেখে পড়িয়েছিলেন। সেইজন্যে তাঁর সাজপোষাক ও রুচি অনেকখানিই পশ্চিমী ধাঁচের। বোম্বাইয়ের পার্শী মহিলাদের স্টাইলে তিনি শাড়ি পড়েন। তাঁকে দেখে কয়েকজন ব্রাহ্মমহিলা ও শাড়ির আঁচল বাঁ কাঁধের ওপর দিয়ে পেছনে ফেলে পরছেন। এরকমভাবে শাড়ি পরলে পশ্চিমী পোষাকের মত লাগে। শাড়ীর সঙ্গে মেলানো লেস লাগানো ব্লাউজ আর মুক্তোর হার ও পশ্চিমীরুচির

অঙ্গ। মনোমোহন ঘোষের কথাবার্তা ও আদবকায়দা এক্কেবারে সাহেবের মতো। অথচ তাঁর ভদ্র ব্যবহার ও মার্জিত রুচি এবং প্রতিটি মন্তব্য প্রখর ধীশক্তির পরিয়ে দেয়। বিষ্ণুপ্রিয়ার কিন্তু এই দম্পতিকে ভালো লাগেনি। ব্রাহ্মসমাজের লোকজনদের এমনিই সকলে 'খ্রিস্টান' বলে মনে করে, কারণ তাঁদের ধ্যান-ধারণা, উপাসনার পদ্ধতি ইত্যাদি অনেক কিছুই খ্রিস্টানদের সঙ্গে মেলে। বিষ্ণুপ্রিয়া আর তাঁর স্বামী দুজনেই সচেতনভাবে ভারতীয় পরম্পরার কিছু দিক তাঁদের আচার ব্যবহারের মধ্য দিয়ে বাঁচিয়ে রাখবার চেষ্টা করছেন। পশ্চিমী সভ্যতার ভালো দিকগুলি গ্রহণ করতে অবশ্য তাঁদের কোনো আপত্তি নেই। ব্রাহ্মসমাজের আদর্শের মধ্যে তাঁরা ভারতীয় পরম্পরা আর পাশ্চাত্ত্য ধ্যান-ধারণার যে সুন্দর সমন্বয় দেখতে পেয়েছেন তাতেই তাঁরা বেশি আকৃষ্ট হয়েছেন। কিন্তু মনোমোহন ঘোষের মত বিলেতফেরৎ অনেক ব্রাহ্মেরই আদব - কায়দার প্রায় ষোলআনাই সাহেবী হয়ে গেছে। বিষ্ণুপ্রিয়া আর গুণাভিরাম সেইজন্যেই তাঁদের সহজভাবে গ্রহণ করতে পারেন নি। কলিকাতার অন্যান্য নেতৃস্থানীয় ব্রাহ্মদের মতো এঁদের নিজের ভাই-বোন বলে ভাবতে পারলেন না।

সেইদিনের সান্ধ্য আসরের আলোচনার প্রধান বিষয়বস্তু ছিল স্ত্রী-শিক্ষা। স্বর্ণকে বেথুনে রাখার কথাটা নিয়েই আলোচনার সূত্রপাত হয়েছিল। বেথুন স্কুলের পাঠক্রম সম্পর্কে মন্তব্য করে শিবনাথ শাস্ত্রী আর দুর্গামোহন দাস দুজনেই বললেন যে ছেলেদের স্কুলগুলির তুলনায় বেথুনের পাঠদান ব্যবস্থা এক্কেবারে আধুনিক। মনোমোহন ঘোষ বেথুনের সেক্রেটারী ছিলেন। ফলে স্কুলের সমালোচনাটি নিজের গায়ে মেখে নিয়ে তিনি বললেন "অভিভাবকদের অসন্তুষ্ট না করে যতদূর সম্ভব পাঠক্রম আধুনিকীকরণ করার চেষ্টা করা হচ্ছে। কিন্তু হঠাৎ কিছু একটা করতে চাইলে হয়ত অনেক অভিভাবক মেয়েদের স্কুল ছাড়িয়ে নিয়ে যাবেন। আসলে আমাদের ভারতবাসীরা এখনও ভেবে নিচ্ছেন যে স্ত্রী - শিক্ষার একমাত্র লক্ষ্য হওয়া উচিত আদর্শ গৃহিনী তৈরী করা যে কিনা পুরুষের মুখের রুচি অনুযায়ী রান্না করতে পারবে আবার সময় পেলে স্বামীকে কবিতা আবৃত্তি করেও শোনাবে। বিজ্ঞান বা গনিতশাস্ত্রের জটিল অধ্যয়নে নারীর কি প্রয়োজন?" ঘোষ ঠাট্টার সুরে বললেন, "এই বছর থেকে অবশ্য আমরা কিছু কিছু নতুন পদক্ষেপ নিতে যাচ্ছি কারণ এখন বেথুন কলেজও শুরু হয়েছে যেহেতু কলেজটিকে বিশ্ববিদ্যালয়কে দিয়ে অনুমোদন করাতে হবে। সেক্ষেত্রে তার আগে আগেই ছেলেদের কলেজের পাঠক্রম বেথুনস্কুল এবং কলেজ দুটিতেই ঢোকাতে হবে।"

শিবনাথ শাস্ত্রী ঘোষের প্রথম কথাগুলির সঙ্গে একমত হয়ে উত্তেজিত সুরে বলে উঠলেন, "আপনি ঠিকই বলেছেন, মিষ্টার ঘোষ। স্ত্রী-শিক্ষার ব্যাপারে আমাদের মধ্যেই কিছু শিক্ষিত লোক সবথেকে বেশি কন্‌জারভেটিভ্ হয়ে পড়েন। আপনার নিশ্চয়ই মনে পড়ছে কেশববাবুর আমাকে বলা কথা গুলি — 'মেয়েরা জ্যামিতি পড়ে কি করবে? সায়েন্সের কিছু কিছু এলিমেন্টারী কথা মুখে মুখে শিখলেই যথেষ্ট? তাঁর এই সমস্ত প্রাচীন

দৃষ্টিভঙ্গীর জন্যেই তো আমি 'ভারত আশ্রম' ত্যাগ করলাম।''

''কেশববাবুর কথা আর বলবেন না,'' শ্রীমতী ঘোষ বলে উঠলেন,''মিস্ এক্ক্রইদে আমাকে বলেছিলেন যে এত বড়ো একজন সমাজ বিপ্লবী নিজের স্ত্রীকে কিন্তু একজন নির্বাক, অশিক্ষিতা, অলঙ্কারে সজ্জিতা কনে বৌ করে রেখেছেন। নিজের ঘরে যদি তাঁর আদর্শের কোন প্রভাবই না পড়ল, অন্যকে তিনি আর কেমন করে প্রেরণা দেবেন।''

মিসেস্ ঘোষ যেন বিষপাত্রের ঢাকনাটা খুলে দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে কেশববাবুর মেয়ের বিয়ের আলোচনায় সভা জমে উঠল। প্রত্যেকে কেশবসেনের আদর্শহীনতাকে যতদূর পারলেন কঠোর ভাষায় ধিক্কার দিলেন। গুণাভিরাম আর বিষ্ণুপ্রিয়া এই আলোচনাতে বিশেষ ভাগ নেননি। একসময়ে তাঁদের সরলেরই পরমপূজ্য ব্যক্তি একজনের বিরুদ্ধে এত কঠোর ভাষা প্রয়োগ করার মানসিকতা তাঁদের ছিল না। সকলের উত্তেজনা কিছুটা কমলে গুণাভিরাম আবার স্ত্রী-শিক্ষার বিষয়ে পুনরালোচনার অবতারনা করলেন,

''স্ত্রী-শিক্ষার ক্ষেত্রে কেশববাবুর ধারনা কিন্তু ইংল্যাণ্ডের অনেকের ধারনার সঙ্গে মেলে। ইংরেজরা শিক্ষা-দীক্ষার ক্ষেত্রে আমাদের থেকে এত এগিয়ে, যদিও মহিলারা এখনো পুরনো পরম্পরা মতোই চলে আসছেন। আমাদের দেশের মতো অজ্ঞানতার অন্ধকারে থাকা মহিলাদের প্রথম পর্যায়েই ভিক্টোরিয়ান যুগের মহিলাদের স্তরে আসাটাই হয়ত একটা বড়ো পদক্ষেপ হবে নাকি?''

''বরুয়া মশাই, আপনি দেখছি একেবারে আদি ব্রাহ্মসমাজের মতো কথাটা বললেন। ইংরেজদের মধ্যে ভালো খারাপ দুইই আছে। আমরা ভালোদিকটি বাদ দিয়ে মন্দদিকটিতে চোখ দেবো নাকি? মেরী কার্পেন্টার, এনেট্ এক্করইদ্ এদের আদর্শ আমার সামনে থাকতে আমরা ভিক্টোরীয় যুগের পিউরিটান লেডিদের আদর্শ কেন গ্রহণ করব? আপনি আপনার মেয়েকে এতদূরের বোর্ডিং স্কুলে রাখতে এসেছেন। তাকে তো ঘরে রেখেই ছবি আঁকা, এমব্রয়ডারী করা, ডাইনিং টেবিলে খাদ্য পরিবেশন করা, ফুল সাজানো ইত্যাদি শিখিয়ে ভিক্টোরীয়ান যুগের লেডি করলেই হত।''

মনোমোহন ঘোষ ব্যঙ্গের সুরে কথাগুলি বললেন আর বলবার সময় এমন অঙ্গ - ভঙ্গী করে কার্য - কলাপ গুলো দেখাচ্ছিলেন যে বরুয়া হাসি সম্বরন করতে না পেরে সকলের সঙ্গে হাসিতে যোগ দিয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর খুঁতখুঁতনি থেকেই গেল। আধুনিক শিক্ষা আর জাতীয় পরম্পরার মাঝখানে সমন্বয় রাখা অসম্ভব নাকি? মনোমোহন ঘোষের 'হিন্দু মহিলা বিদ্যালয়' টিতে মেয়েদের সম্পূর্ণভাবে পশ্চিমী সংস্কৃতি অনুকরণ করতে শেখানো হচ্ছিল বলে তিনি শুনেছেন। সেখানে নাকি যুবতী মেয়েরা ও স্কার্ট পরে আর কাঁটাচামচ দিয়ে খায়। মেয়েদের বিজ্ঞান বা জ্যামিতি পড়াতে গুণাভিরামের একটুও আপত্তি নেই। কিন্তু আচার আচরণের ক্ষেত্রে স্ত্রী - পুরুষ উভয়েই নিজেদের ভারতীয় সংস্কৃতি রক্ষা করে চলবে এটাই তাঁর ভালো লাগে।

সেইদিন অনেক রাত পর্যন্ত বসু পরিবারের বসবার ঘরটিতে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে

আলাপ - আলোচনা হল। আলোচনার অনেককিছুই গুণাভিরাম হয়ত নগাঁওতে শুনেছিলেন এবং কখনোসখনো নিজের দু-একজন বন্ধুর সঙ্গে আলোচনাও করেছিলেন। কিন্তু সেইদিনের বিকেলের মতো একটি জীবন্ত পরিবেশ, তিনি অসমে কোনোদিন পাননি। 'বিল্বকুটীরে'র বৈঠক খানাতে তাঁর সঙ্গে কথা বলার জন্যে যেসমস্ত মানুষ আসেন, তাঁদের বেশির ভাগই শুধুমাত্র শ্রোতা হয়ে তাঁর কথা শোনেন। তাঁর সঙ্গে সমানভাবে তর্ক করবার বা তাঁর ধ্যান- ধারনাগুলির খোলাখুলিভাবে কটু সমালোচনা করবার লোক তিনি অসমে খুব কমই পেয়েছেন। সেখানে তিনি হয়ে পড়েন একজন "জ্ঞানী লোক," কিন্তু এখানে তিনি একজন জ্ঞানপিপাসু। সেইজন্যেই গুণাভিরামের কলকাতা এত ভালো লাগে। এখানে একবার এলে তিনি যেন বেঁচে থাকার নতুন প্রেরণা পান।

স্বর্ণকে স্কুলে রাখবার জন্যে গুণাভিরাম আর বিষ্ণুপ্রিয়া ছাড়াও জগদীশবসুর ভগিনী হেমপ্রভা আর দুর্গামোহন দাস গিয়েছিলেন। দুর্গামোহন বেথুন কলেজটি স্থাপন করার সময় পুরোভাগে ছিলেন এবং স্কুলটির সবরকম কাজ কর্মের সঙ্গে সক্রিয়ভাবে জড়িত ছিলেন। স্কুলের ইংরেজ হেডমিস্ট্রেস এবং অন্যান্য শিক্ষিকাদের সঙ্গে বরুয়া দম্পতির চেনা - পরিচয় করিয়ে দিলেন। সুদূর অসম থেকে এসে কলিকাতায় মেয়েকে পড়ানোর চেষ্টা দেখে সকলেই খুব আশ্চর্য এবং আনন্দিত হলেন। স্বর্ণলতা আর বিষ্ণুপ্রিয়া দুজনের মুখের দিকে বারবার তাকিয়ে তাঁরা প্রশ্ন করলেন, "তোমরা সত্যি সত্যিই অসমের বাসিন্দা না অন্যজায়গা থেকে ওখানে গিয়ে বসবাস করছ?" তাঁদের প্রশ্ন করবার ধরন ধারন দেখে দুর্গামোহন হেসে হেসে বললেন, "এখন নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ যে অসমবর্বরদের দেশ নয়। অসমীয়া মহিলাদের রূপ-লাবণ্যের প্রশংসা আমরা ইংরেজ লেখকদের বইতে পড়তে পাই।"

বেথুন স্কুলের ছাত্রী, শিক্ষয়িত্রীরা সকলেই স্বর্ণকে খুব আদর অভ্যর্থনা জানালেন। বোডিংয়ের বেশিরভাগ ছাত্রীই বঙ্গ এবং বিহারের বিভিন্ন জেলা থেকে আসা। কলিকাতার মেয়েরা সাধারণত বাড়ি থেকে আসা যাওয়া করে পড়ে। বোর্ডিংয়ের বেশিরভাগ মেয়েই মফস্বল বা গ্রাম্য পরিবেশের। কলিকাতা তাদের কাছে একটি অপরিচিত নগরী। দু - একজন বিবাহিতা মেয়ে ও আছে। হয়ত তাদের উদারচেতা স্বামী বা শ্বশুর তাদের স্কুলে পড়তে পাঠিয়েছেন। বোর্ডিংয়ের বেশিরভাগ মেয়েই খ্রিষ্টান বা ব্রাহ্ম। স্বর্ণকে তারা খুব সহজেই নিজেদের একজন বলে গ্রহণ করল। অসমের নাম বেশিরভাগ মেয়েরাই আগে শোনেনি। বঙ্গদেশেরই কোন একটি দূরবর্তী জেলা বলে তারা ধরে নিল।

বিষ্ণুপ্রিয়া মেয়ের কাছ থেকে বিদায় নেবার সময় প্রায় বাক্‌রোধ করে রইলেন। কারণ কথা বললেই তাঁর কথা জড়িয়ে যাবে আর তাঁর দুর্বলতা প্রকাশ পেলে মেয়ে কাঁদবে। গুণাভিরাম স্বর্ণকে আশীর্বাদ করে শুধু বললেন, " মা, ভালোভাবে পড়াশুনো করে দেশের মুখ উজ্জ্বল করো। ব্রহ্মকৃপাহিকেবলন্।"

স্বর্ণ ফোঁপাতে ফোঁপাতে চোখের আড়াল হওয়ার আগে পর্যন্ত মা বাবার দিকে তাকিয়ে রইল। তারপরে মিস্ নিকলস্ তাকে আদর করে হাত ধরে ভেতরে নিয়ে গেলেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়

এক

লক্ষ্মীপ্রিয়া যেদিন জেলার মধ্যে প্রথম হয়ে নিম্নপ্রাইমারী পরীক্ষায় পাশ করল সেদিন পঞ্চানন শর্মার বাড়ি উৎসবমুখর। বাংলাস্কুলের সব শিক্ষয়িত্রী সুখবরসহ শর্মার বাড়িতে হাজির। লক্ষ্মীকে আশীর্বাদ করার পর তাঁরা আনন্দ করে চা জলখাবার খেলেন। কিন্তু শর্মা আর শর্মাগিন্নীর কাছ থেকে যতখানি উচ্ছ্বাস আশা করেছিলেন তাঁরা যেন তা দেখলেন না। কারন বুঝতে পেরেও না বোঝার ভান করে হেডমিস্ট্রেস চারুশীলা সেন শর্মাকে জিজ্ঞেস করলেন—

"তা শর্মাবাবু, এখন লক্ষ্মীকে পড়াবেন কি পড়াবেন না?"

শর্মা ম্লান হেসে বললেন,

"আজ আমার ছেলে এত ভালোকরে পাশ করলে তাকে আমরা সাধ্যমত শিক্ষা দিতাম হয়ত। কিন্তু আমাদের কপালমন্দ, সে মেয়ে হয়ে জন্মেছে। আমাদের এখানে মেয়েদের তো এর বেশি পড়াশুনো করার ব্যবস্থা নেই। তাই এখানেই তার পড়া শেষ বলে ধরে নিতে হবে।"

চারুশীলা সেন এ প্রশ্নের উত্তর ভেবেই এসে ছিলেন। মুখের পান চিবোতে চিবোতে বল'লেন,

"আমি একটা কথা ভাবছি। লক্ষ্মীর মতো এরকম একজন তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমতী মেয়েকে আমরা এভাবে পড়ে থাকতে দিতে পারিনে। কারণ হয়তো এর পরিণাম পরে কখনো খারাপ হতেও পারে। তাই ছেলেদের এম-ই স্কুলেই তাকে ভর্তি করে দিন। অন্ততএম-ই পর্যন্ত পড়ুক্।"

"ছেলেদের স্কুলে?" শর্মা বিস্ময়ে চোখ বড় বড় করে বললেন।

"হ্যাঁ। তার বাইরে অন্য উপায় তো নেই। সরকার মেয়েদের জন্যে এখনো এম-ই স্কুল করেন নি। অবশ্য মিশনস্কুলে পড়াতে পারেন। কিন্তু আপনি কি সেখানে মেয়ে পড়াতে রাজি হবেন?"

"না, না। আমাদের মেয়েকে ওখানে পাঠাতে পারব না"— শর্মা দৃঢ়ভাবে বললেন।

"তাহলে ছেলেদের স্কুলে দিন। আমি এম-ই স্কুলের হেডমাস্টারের সঙ্গে কথা বলেই এসেছি। তাঁর কোনো আপত্তি নেই। সরকারের কাছ থেকে অনুমতি পাওয়া যাবে।

আপনি বরুয়া হাকিমকে দিয়ে একবার কথাটা কইয়ে দিলেই হবে। তারপরে ....,'' একটুখানি থেমে চারুশীলা সেন যেন পঞ্চানন শর্মার মন থেকে শেষ চিন্তাও মুছে দেবার জন্যে বলে উঠলেন, ''বয়সে লক্ষ্মী ক্লাসের অন্য ছেলেদের থেকে বড়ই হবে। ফলে ব্যাপারটা তার নিজের ছোট ছোট ভাইদের সঙ্গে পড়ার মতই হ'বে।

শর্মা একটি ও উত্তর না দিয়ে মাথাটা নীচু করে কথাগুলো চিন্তা করতে লাগলেন। চারুশীলা সেনের বলা সহজ কথাগুলি যে সমাজের চোখে এক একটি কামানদাগার মতো ভয়ঙ্কর ব্যাপার সেটা শর্মার পক্ষে ভোলা সম্ভব নয়। ব্রাহ্মরা হিন্দুসমাজের লোকাচারগুলো মানেন না। সেইজন্যে তাঁদের পক্ষে উপদেশ দেওয়া খুব সহজ। কিন্তু তাঁর মতো সামাজিক রীতিনীতির পক্ষে থাকা একজন মানুষের পক্ষে সংসার নামক জায়গাটি যে কিরকম জটিল সেকথা তাঁরা কেমন করে বুঝবেন? নিজের সমাজকে বাদ দিয়ে কেউই বাঁচতে পারে না। ব্রাহ্মদের ও একটি নিজস্ব সমাজ আছে। খ্রিস্টানদেরও আছে। তাঁরা কি নিজের নিজের সমাজ ত্যাগ করতে পারেন? শর্মা এসব ভাবতে ভাবতে একবার মাথা তুলতেই পর্দার ফাঁক দিয়ে তাঁদের দেখতে থাকা দুটি চোখের দিকে তাকিয়ে হঠাৎই যেন ভীষণ অপ্রস্তুত হয়ে গেলেন। লক্ষ্মী যে খুবই উৎকণ্ঠিত হয়ে তাঁর সিদ্ধান্তের জন্যে অপেক্ষা করে আছে সে সম্পর্কে তিনি সচেতন হলেন। সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে সামলে তিনি চারশীলা সেনকে বললেন,

''আমি ভাবনাচিন্তা করে দেখছি। মেয়েটিকে পড়ানোর জন্যে আপনাদের এত আগ্রহ দেখে আমার মনেও সাহস জাগছে। বাড়ির অন্য সকলের মত পেলে আমার আর কোনো আপত্তি থাকবে না।''

পঞ্চানন শর্মা ভালোভাবেই জানতেন ''বাড়ির অন্যরা'' কি বল'বেন। তবুও একেবারে কথা দিয়ে, পরে কথা রাখতে না পারার চেয়ে এরকম মধ্য পন্থা অবলম্বন করা তাঁর এক ধরণের অভ্যেস হয়ে গেছে। শিক্ষয়িত্রীরা চলে যাওয়ার পর শর্মা অনেকক্ষণ চিন্তা করলেন। লক্ষ্মীকে প্রথম স্কুলে দেবার সময় বাড়িতে যে অশান্তির ঝড় বয়ে গিয়েছিল তার পুণরাবৃত্তি যদি আবারও ঘটে তবুও তাঁর একটুও ভয় নেই। বাড়ির সবার মতের ওপর নিজের মত জোর করে চাপানোর মত সাহস আর ক্ষমতা তাঁর আছে। কিন্তু যে পদক্ষেপ তিনি নিতে চাইছেন তা ঠিক না বেঠিক সে ব্যাপারে তাঁর মনে দ্বিধা আর আশংকা রয়েছে। তাঁর বিবেক চায় না যে লক্ষ্মীর ওপর অন্যায় করা হোক্। সে যেন ভীষণ ঝড়ঝাপটার মধ্যে স্থির হয়ে জ্বলতে থাকা জ্বল্‌জ্বলে একটি প্রদীপ। সেই প্রদীপটি জ্বালিয়ে রাখতে পারলে তাঁর অন্তরাত্মা তৃপ্তি পাবে। এ ব্যাপারে কার সঙ্গে তিনি কথা বলবেন? কে তাঁকে উচিত পরামর্শ দেবে? শেষে আবার তিনি বিল্বকুটীরের দিকে পা বাড়ালেন।

গুণাভিরাম আর তাঁর পরিবার কলকাতা থেকে প্রায় দুমাস হল ঘুরে এসেছেন। ইতিমধ্যে বোডিং থেকে লেখা স্বর্ণর প্রথম চিঠি তাঁদের হাতে এসেছে। সে লিখেছে যে সে ভালোই আছে। তাঁদের কথা তার খুব মনে পড়ে। সেখানে সকলেই তাকে ভালোবাসে আর সে

মনদিয়ে পড়াশুনো করছে। চিঠিটি ছোট্ট। চিঠিতে মনের ভাব প্রকাশ করবার মতো বড় সে এখনো হয়নি। তবুও তার গোটাগোটা বড় হরফে লেখা চিঠি খানি পেয়ে গুণাভিরাম আর বিষ্ণুপ্রিয়ার চোখ ছল্‌ছল্‌ করে উঠল। বাইরে থেকে দেখতে যেমনই মনে হোক্ না, ভেতরে ভেতরে দুজনেই উপলব্ধি করছিলেন যে স্বর্ণ চলে যাওয়ার পর গোটাবাড়িটা নিস্তব্ধ নিঝুম হয়ে গেছে। ছেলেদুটি থাকা সত্ত্বে ও মেয়ের অভাব তাঁরা প্রতিমুহূর্তে অনুভব করতেন। গুণাভিরাম বেশির ভাগ সময় সরকারী কাজকর্ম আর নিজস্ব পড়া শুনো নিয়ে ব্যস্ত থাকেন। বিষ্ণুপ্রিয়ার খেতে শুতে সবসময় মেয়ের কথা মনে পড়ে।

পঞ্চানন শর্মাকে বহুদিন পরে দেখে বরুয়া এবং বরুয়াগিন্নী দুজনেই খুব আনন্দ পেলেন। স্বর্ণর সঙ্গে তাঁর এবং লক্ষ্মীর সম্পর্কের জন্যে তাঁকে তাঁদের খুবই আপন যেন লাগে। শর্মাকে আন্তরিক অভিনন্দন জানিয়ে বরুয়া দম্পতি লক্ষ্মীর উন্নত ভবিষ্যত কামনা করলেন। গুণাভিরাম তাঁর প্রিয় বিষয় "স্ত্রী শিক্ষা" সম্পর্কে দু একটি কথা বলার সুযোগ ছাড়লেন না।

"আজকের যুগে স্ত্রীজাতিকে শিক্ষার আলো দেখানো সভ্যজাতির একটা লক্ষণ। লক্ষ্মীর মতো সব অসমীয়া মেয়েরা লেখাপড়া শিখে এগিয়ে যেতে পারলে আমাদের দেশের উন্নতি হ'বে।"

"কিন্তু শুধুমাত্র পড়ার ইচ্ছা থাকলেই কি সব মেয়েরা পড়তে পারে? আমাদের লক্ষ্মীর পড়ার জন্যে এখানে কি কোনো মেয়েদের মধ্যইংরেজী বা হাইস্কুল আছে? তাকে ছেলেদের স্কুলে নাম লেখানো ছাড়া আমি তো এখন অন্য উপায় দেখছিনে।"

গুণাভিরাম কিছুক্ষণ চুপচাপ রইলেন। শর্মার কথাগুলি তাঁর মনে যেন একটু খোঁচা মারল। কিছুদিন আগে নগাঁওতে মেয়েদের জন্যে মধ্যইংরেজী স্কুল স্থাপন করার কথা অন্যান্য কথার মাঝে জেলার বড় সাহেবের সামনে তিনি তুলেছিলেন। কিন্তু স্বর্ণকে কলিকাতা পাঠানোর ব্যাপারে ব্যস্ত থাকার ফলে আবার আলোচনা করার কথাটা তিনি ভুলেই গিয়েছিলেন। নিজের মেয়ের ভবিষ্যতের কথা ভাবতে গিয়ে তিনি কি অন্যের কথা ভুলে গেছেন? বরুয়া মনে মনে ঠিক করলেন, পরেরদিনই কাছারীতে গিয়েই তিনি এপ্রসঙ্গে কথা বলবেন। কিন্তু এসব কাজে সময় লাগে। সেইজন্যে শর্মার সমস্যার তিনি নতুন কোনো সমাধান দিতে পারলেন না। শর্মা ঠিকই বলেছেন। ছেলেদের স্কুলে পড়ানো ছাড়া অন্য উপায় নেই। তাঁর কথাটা খুব একটা ভালো লাগল না। তবুও বললেন,

"ছেলেদের স্কুলে মেয়েদের পড়ানোর ব্যবস্থা অন্য অনেক জায়গাতে হয়েছে বলে শুণছি। মেয়েদের জন্যে আলাদা স্কুল হওয়া বাঞ্ছনীয়। কিন্তু আমাদের এখানে এখনো যখন হয়নি, তখন ছেলেদের স্কুলেই পাঠাতে হবে। স্কুল নেই বলে শিক্ষা বন্ধ করাটা অনুচিত। আপনি চিন্তা করবেন না। অনুমতির জন্যে আমি সরকারকে লিখব। লক্ষ্মীর জন্যে আপনার চিন্তা করবার দরকার নেই। সে শান্ত শিষ্ট মেয়ে। বোঝবার মতো বয়সও হয়েছে। সে নিজেকে সামলে চলতে পারবে।"

"আমারও তাই বিশ্বাস," শর্মা বললেন,"কিন্তু লোকে কি বলবে সে ব্যাপারে একটু চিন্তা হচ্ছে।"

"মানুষের অপবাদের ভয়ে আপনি সোজা পথে চলবেন না? আজ লোকে আপনাকে মন্দ বলতে পারে। কিন্তু কাল যখন গোটা দেশ এগিয়ে যাবে, তখন আপনার সাহসকে সকলে প্রশংসা করবে।"

"আমার দুর্বলতা সেইখানেই, হাকিম মশাই। সবাইকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাওয়ার সাহস আপনার মতো আমার নেই। আমি অন্যের পেছনে পেছনে যাওয়া মানুষ," শর্মা ম্লান হাসি হেসে বললেন।

"একবার এগিয়ে দেখুন তো দেখি। পা পিছলে গেলে আমরা তো আছিই।" বরুয়া হাসতে, হাসতে বললেন। শর্মা নিজের মন একরকম ঠিকই করে নিয়েছিলেন। আশ্চর্য কথা। এই মানুষদুটির কাছে এলে পঞ্চানন শর্মার সবসময় এরকম লাগে যেন এক নতুন যুগের দ্বারে এসে দাঁড়িয়েছেন। কিন্তু বাড়ি ফিরে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সেই ভাবটা হারিয়ে যায়। আজ কিন্তু তিনি দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। দৃঢ় সংকল্প। নিজের সংকল্পকে বাস্তবে রূপ দেওয়ার জন্যে তিনি আর দেরি না করে "বিল্বকুটির" থেকে এম. ই স্কুলের হেডমাস্টারের কাছে গিয়ে লক্ষ্মীকে ভর্তি করানোর ব্যাপারে সব ঠিকঠাক করে ফেললেন। সরকারের কাছ থেকে অনুমোদন এলেই হয়ে যাবে। কাজটি শেষ হওয়ার পরে শর্মার বিবেক থেকে যেন ভারি একটি বোঝা নেমে গেল। মেয়েকে খবর দেবার জন্যে তিনি আগ্রহ নিয়ে বাড়ি ফিরলেন।

দুই

ভদাই নামে বাড়ির একজন বড়ো কাজের লোককে লক্ষ্মীকে স্কুলে আনা নেওয়ার ভার দেওয়া হল। এল্. - পি্. স্কুলটি ঘরের কাছে ছিল। লক্ষ্মী ছোট ভাইয়ের সঙ্গে সেখানে যেত। এখন বুড়ো ভদাই তার পেছনে পেছনে এম - ই স্কুলের গেট অব্দি যায়। লক্ষ্মী ছাতাটা বন্ধ করে তার হাতে দিয়ে স্কুলের ভেতরে যায়। স্কুল ছুটি হওয়ার একটু আগেই ভদাই গিয়ে হাজির হয়। এদিক সেদিকে ঘুরে বেড়ানো ছেলে গুলোর উপর তীক্ষ্ণ নজর রেখে লক্ষ্মীর হাতে ছাতাটা দিয়ে সে গম্ভীর মুখে আস্তে আস্তে তার পেছনে আসতে থাকে। প্রথমদিন ছেলেরা অবাক্ হয়ে দৃশ্যটা দেখে। তারা যেন নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারে না। তাদের একচেটিয়া অধিকারের এই স্কুলটিতে কোনো মেয়ের অনাধিকার প্রবেশ একটা চাঞ্চল্যকর ঘটনাই। প্রথমদিন মাস্টারমশাই লক্ষ্মীকে সঙ্গে নিয়ে গিয়ে ক্লাসের একদিকে আলাদা বেঞ্চে বসিয়ে দিলেন। ছেলেরা হেডস্যারের ভয়ে কেউই কিছু বলতে সাহস করল না। তার পরের দিন কিন্তু তাদের সাহস বেড়ে গে'ল। কয়েকটি দুষ্টু ছেলে লক্ষী স্কুলে এসে পৌঁছোনোর সঙ্গে সঙ্গে চীৎকার করে উঠল, "মহারানী ভিক্টোরিয়া

আসছেন।'' বাকি সব ছেলে খিলখিল করে ঠাট্টার হাসি হাসতে লাগল। ভদাই দাঁত কড়মড় করে তাদের দিকে দৌড়ে গেল। কিন্তু লক্ষ্মী তাড়াহুড়ো করে তার হাতে ছাতাটা দিয়ে বলল, ''দাদা, তুমি যাও। আমি এদের কথা হেডস্যারকে বলে দেব।'' শ্রেনীর সামনে এসে লক্ষ্মী বাইরে দাঁড়িয়ে রইল। ছেলেদের তারদিকে ইংগিত করে নানারকম কথা বলতে দেখে তার ক্লাসের ভেতরে যেতে ইচ্ছে করল না। মাস্টারমশাই এসে পৌঁছনোমাত্র সে ক্লাসের ভেতরে ঢুকে তার বসার জায়গায় গেল। তার বেঞ্চের ওপর একটুকরো কাগজ পাথরের টুকরো দিয়ে চাপা দেওয়া। কাগজটি হাতে নিয়ে একবার চোখ বুলিয়ে দেখামাত্রই সঙ্গে সঙ্গে লজ্জায় আর অপমানে তার চোখমুখ কান লাল হয়ে গেল। কাগজের টুকরোটিতে লেখা ছিল, ''দেখাদেখি উঠল গা, বিধবা বাম্‌নী বলে মোর দিকে চা'' (''দেখাক দেখি উঠিলগা, বাঁবী বামুনীয়ে বোলে মোকো চা'')। লক্ষ্মী প্রথমে একহাতে কাগজের টুকরোটি আর অন্য হাতে পাথরের টুকরোটা খামচে ধরে অসহায় অবস্থায় ছেলেদের দিকে একবার তাকাল। ওরাও তার দিকেই তাকিয়ে ছিল। পেছন থেকে চাপা হাসির শব্দ ও শোনা গে'ল। লক্ষ্মী এবার রেগে গেল। ভাইয়ের বয়সী এইছেলেগুলির এত সাহস। সে তো তাদের কোনো ক্ষতি করেনি, তাহলে তারা কেন তাকে এত নিষ্ঠুর ভাষায় অপমান করল? রাগে অসহায় হয়ে সে ঠক্‌ঠক্ করে কাঁপতে লাগল। এতক্ষণ ধরে ইংরেজীর শিক্ষক অজয় গাঙ্গুলী যে তাকে লক্ষ্য করছেন তা লক্ষ্মী বুঝতে পারেনি। তার মুখের ভাব দেখেই তিনি বুঝতে পারলেন যে কিছু একটা ঘটেছে। গম্ভীরস্বরে তিনি লক্ষ্মীর দিকে হাত বাড়িয়ে দিয়ে বল'লেন, ''লক্ষ্মীপ্রিয়া কাগজের টুকরোটা আমাকে দাও।'' লক্ষ্মী উঠে গিয়ে কাগজটি তাঁর হাতে দিল। কাগজটি পড়েই রাগে গাঙ্গুলী স্যার গর্জন করে উঠলেন,''অসভ্য, বর্বরের দল! এটা কে লিখেছে, বল্। না বললে আজ একধার থেকে সবার পিঠের ছাল তুলে নেবো!'' টেবিলের ওপরে সপাং সপাং করে বেত মেরে মেরে তিনি কথাগুলো বললেন। ছেলেরা এত রাগতে গাঙ্গুলী স্যারকে কখনই দেখেনি। তাদের ও এম - ই স্কুলে আসার বেশিদিন হয়নি। ফলে মাস্টার মশাইদের রাগের সঙ্গে এখনো তাদের ভালোকরে পরিচয় ঘটেনি। কাউকে মুখ খুলতে না দেখে গাঙ্গুলীস্যার বসার জায়গা থেকে একলাফ দিয়ে উঠে প্রথম বেঞ্চের ছেলেদের ওপরে বেত চালাতে আরম্ভ করলেন। প্রথম সারির বেঞ্চে সাধারণত পড়া শুণোয় ভাল ছেলেরাই বসে। বেত্রাঘাতের সঙ্গে তারা খুবই কম পরিচিত। তাই বেতের দুঘা খাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে একজন বলে উঠল,

''স্যার, আমি করিনি। গিরীন করেছে।'' মুহূর্তের মধ্যে পেছনের বেঞ্চে বসা গিরীন বলে ছেলেটাকে ছেচঁড়াতে ছেচঁড়াতে টানতে টানতে বেঞ্চের বাইরে বের করে এনে গাঙ্গুলী সপাং সপাং করে তার পিঠে বেত চালাতে লাগলেন। লক্ষ্মী কান্ডকারখানা দেখে ভয়ে কুঁকড়ে গেল। গিরীন পরপর বেত খাওয়ার পরে বলে ফেলল,

''স্যার, ওপরের ক্লাসের একটি ছেলে শিখিয়ে দেওয়াতে লিখেছিলাম। আজকের

থেকে আর কখনো করব না, স্যার্।''

ছেলেটিকে আরও একবার সপাং করে বেত মেরে গাঙ্গুলী নিজের বসার জায়গায় ফিরলেন। খুব বেশি রাগ হওয়ার জন্যে তিনি ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন। এর আগেও ছেলেদের ওপর তাঁর রাগ হয়েছে। কিন্তু ছাত্র পড়া না পারলে বা মিথ্যে কথা ব'ললে শিক্ষকের যে ধরনের রাগ হয় তার থেকে ও এ রাগ অন্যধরনের। ছোট ছোট ছেলেদের মধ্যে গাঙ্গুলী যেন এক ভয়ংকর সামাজিক ব্যাধির লক্ষণ দেখতে পাচ্ছেন। এই রোগ যদি শুরুতেই শেষ করা না যায় তাহলে পরে এইসব ছেলেদের মধ্যে দিয়েই সমগ্র সমাজে তা ছড়িয়ে পড়ার সম্ভাবনা যেন তিনি দেখতে পাচ্ছেন। সেজন্যে প্রথম ওষুধ তিনি বেতের মাধ্যমে দেওয়ার পরে এইবার বাক্যবান ছাড়তে শুরু করলেন।

''তোদের মন এত সংকীর্ণ, এত নীচ হলে জ্ঞানার্জন করার কোনো অর্থ নেই। আজ নিজের দিদির মত লক্ষ্মীপ্রিয়াকে যেরকম নিষ্ঠুরভাবে ঠাট্টা করেছিস্ কাল নিজের দিদি বোনকেও লেখাপড়া করতে দেখলে ইয়ার্কি মারবি। বিদ্যা তোদের একচেটিয়া সম্পত্তি নয়, বুঝলি! তোরা কুয়োর ব্যাঙ্ হয়ে আছিস বলেই এরকম ভাবছিস্। বঙ্গদেশে যা তো। সেখানে দেখবি মেয়েরা আজকাল ছেলেদের সঙ্গে সমানে পাল্লা দিয়ে এনট্রান্স পাশ করে কলেজে পড়তে যাচ্ছে। জগতের সভ্যদেশে নারীজাতির উন্নতির জন্যে সকলেই চেষ্টা করছে। আর তোরা একজন ভাগ্যহীনা মেয়েকে বিদ্যাশিক্ষার থেকে বঞ্চিত করতে চাইছিস। একদিন তোদের পৌত্র - পোত্রীরা তোদের ধিক্কার দেবে, আমি একথাও বলে রাখছি যে বিদ্যার দেবী সরস্বতী ও তোদের ক্ষমা করবেন না।'' মাস্টারমশাইর কথাগুলো ছেলেদের শেল বেঁধার মত বিদ্ধ করল। ছেলেদের মধ্যে বেশিরভাগই ছিল অল্প বয়সের। খারাপ চিন্তা ভাবনা তাদের মধ্যে গভীরভাবে শেকড় গড়তে পারেনি। এরা সবাই অনুতপ্ত হল। স্যারের আদেশ মতো লক্ষ্মীর কাছে ক্ষমা চাইল। তারপর থেকে কেউই আর লক্ষ্মীকে ঠাট্টা করত না। অন্য ক্লাসের ছেলেরাও কথাটা জানতে পেরে তাকে সমীহ্ করতে লাগল। অল্পদিনের মধ্যেই নিজের মেধার পরিচয় দিয়ে লক্ষ্মী শ্রেণীর ভালোছেলেদের মধ্যে নিজের স্থান করে নি'ল।

কিন্তু স্কুলের সমস্যা শেষ হলেও লক্ষ্মীর কাছে বাড়ীর আপনজন ও আত্মীয়ের সঙ্গে যুদ্ধটি এতসহজে শেষ হবার নয়। স্কুলে যাতায়াতের পথে সম্পর্কীয় কাকা হরি শর্মার বাড়ি। শর্মা কাছারিতে পেসকারের কাজ করেন। কিন্তু উপনয়ন, পাঁজি - পুঁথি দেখা, পুজোতে বিধি ব্যবস্থা দেওয়া, কারো বাড়িতে অশৌচ হলে শাল গ্রাম শিলা ধোয়ানো — এই সব কাজে সাধারণত তাঁকে ব্যস্ত দেখা যেত। বড় ছে'লে কৃষ্ণকে হাইস্কুলে ভর্তি করে দিয়েছেন। মেয়ে সুভদ্রা লক্ষ্মীর থেকে দুবছরের ছোট। বিয়ে হয়ে গেছে, ঋতুমতী হয়নি। লিখতে পড়তে জানে না। অবশ্য মুখস্থ বিদ্যায় পারঙ্গম। লক্ষ্মীর পাঁচালী শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত যেমন সে বলে যেতে পারে, তেমনি পঞ্জিকা থেকে নিষেধের তালিকা ও বলে যায় নির্ভুলভাবে। হরি শর্মার বিশ্বাস মেয়ে ছেলেদের এই তালিকা মুখস্থ থাকলে তিথি বার

ব্রতে নিষিদ্ধ বস্তু, যেমন প্রতিপদে আলু - কচু বা অষ্টমীতে নারিকেল তারা খাবে না। ফলে তিনি মেয়েকে এইসব শেখাতে কোনো ত্রুটি রাখেন নি। লক্ষ্মীপ্রিয়া লেখাপড়া করছে জানতে পেয়ে একটাসময় সুভদ্রারও পড়াশুনো করতে ইচ্ছে হল। কিন্তু বাবা শাস্ত্রের বচন আউরে স্ত্রী জাতি লেখা - পড়া করলে কি ধরণের ভয়ঙ্কর পরিণতি হতে পারে সেইবিষয়ে এমনিই একটি ভয়াবহ চিত্র তুলে ধরলেন যে সুভদ্রা দ্বিতীয়বার আর সেকথা তোলার সাহস পেলোনা। লক্ষ্মী অকালে বিধবা হওয়ায় হরিশর্মা যেন নিজের কথার সত্যতার হাতে হাতে প্রমাণ পেলেন। বাড়ির স্ত্রীলোকদের সামনে নিজের ভবিষ্যৎ বাণী ফলে যাওয়ার কথা বেশ কয়েকবার বললেন। তাঁর পান্ডিত্যের ভিতটি শক্ত করার জন্যেই যেন লক্ষ্মী বিধবা হ'ল! আত্মতুষ্টিতে হরি শর্মার মন ভরে গেল।

কিন্তু সেই আত্মতুষ্টিকে প্রবলভাবে নাড়া দিয়ে লক্ষ্মী যখন তাঁর বাড়ির সামনে দিয়ে প্রাইমারী স্কুলে আসা যাওয়া করতে লাগল, তখন নিজের বাড়ির মেয়েদের সেই অশুভ প্রভাব থেকে বাঁচানোর জন্যে হরি শর্মা দাদা পঞ্চানন শর্মার কাছে ছুটে গেলেন। কিন্তু হাজার যুক্তি তর্ক করা সত্ত্বেও যখন পঞ্চানন শর্মা নিজের সিদ্ধান্তে অচল - অটল রইলেন, তখন উপায়ান্তর না দেখে দাদার মস্তিষ্কের সুস্থতা সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করে মুখে অনুচ্চ আওয়াজ করতে করতে তিনি বেরিয়ে গে'লেন। তারপর বেশ কিছুদিন তিনি আর ওদিকে পা মাড়ালেন না। কিন্তু নিজের পিতৃ - শ্রাদ্ধে নিমন্ত্রণ না করলে মৃতব্যক্তির শাপ লাগতে পারে ভেবে শেষে একবার তাঁর বাড়িতে গিয়েছিলেন।

জেলার মধ্যে প্রথম হয়ে লক্ষ্মীর বৃত্তি পাওয়ার খবরটা তিনি পেয়েছিলেন। কিন্তু নিজের ছেলেকে এত পড়িয়েও বৃত্তি পাওয়াতে পারলেন না, অথচ একজন বিধবা মেয়ে বৃত্তি পেয়ে গেলো এ তিনি একেবারেই সহ্য করতে পারলেন না। এরপর একদিন লক্ষ্মীকে ছেলেদের এম - ই স্কুলে যেতে দেখে হরি শর্মাতো হতভম্ব! তিনি যেন নিজের চোখকে ও বিশ্বাস করতে পারলেন না। একদিন কৌতুহল দমন করতে না পেরে তিনি লক্ষ্মীর স্কুল থেকে ফিরে আসার সময় নিজের বাড়ির গেটের সামনে দাঁড়িয়ে রইলেন। লক্ষ্মী দূর থেকে কাকাকে দেখে ছাতায় মুখখানি আড়াল করে তাড়াতাড়ি জায়গাটা পার হয়ে যাওযার চেষ্টায় ছিল। কিন্তু কাকা তাকে ''এদিকে আয়'' বলে ডাকতে আর উপায় কী, সে ভয়ে ভয়ে কাছে গেল।

''আজকাল নাকি তুই এম - ই স্কুলে যাস? ' — শর্মা বিদ্রূপের হাসি হেসে বললেন।

''হ্যাঁ।'' লক্ষ্মী আস্তে আস্তে ব'লল।

''হ্যাঁরে', ছেলেদের মধ্যে পড়তে যেতে তোর লজ্জা করে না? ছিঃ, এরকম কথা কোথাও শুনেছিস? পঞ্চাননদার মাথায় গন্ডগোল হয়েছে বুঝতে পারছি। বিধবা মেয়েকে রাস্তাতে বেরোতে দেওয়াটাই পাপ। তারপরেও সব ছেলেদের মাঝখানে বসে পড়তে দিয়েছে! হ্যাঁ রে, তোদের লজ্জা শরম নেই, কিন্তু দেশের এতগুলো ছেলের মাথা খাওয়ার তোদের কোনো এক্তিয়ার নেই, বুঝেছিস?'' তিনি ''এক্তিয়ার'' শব্দটার ওপর একটু

বেশি জোর দিয়ে বললেন, যেন তিনি কোনো মামলার নিষ্পত্তি করছেন। সাধারণত তিনি সেরকম কথা বলবার পরে ও অপরপক্ষ যেমনই হোক্ না কেন, তর্ক করে না। লক্ষ্মীর কিন্তু ভীষন রাগ হল। প্রথম কথা, বাবার মাথার গন্ডগোল হয়েছে বলে উল্লেখ করেছেন। দ্বিতীয়ত, তার চরিত্রের সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। লক্ষ্মী কাকার চোখের দিকে চেয়ে একটু উষ্মার সঙ্গে উত্তর দিল,

''আমি ছেলেদের একটু ও বিরক্ত করিনাতো। পড়া-শুনোই করছি, কোনো পাপ কাজ করছি না।''

শর্মা ভেঙ্‌চি কেটে বললেন — ''রাখ্, রাখ,'' ''সোমত্ত ওরকম একটি মেয়ে সামনে বসে থাকলে ছেলেদের মাথায় পড়া কি ঢুকবে, না ঢুকবে না?''

হরি শর্মার প্রত্যেকটি কথাই লক্ষ্মীকে শূলে বেঁধার মত বিঁধল। সে আজকাল অনেক কথাই সহ্য করতে শিখছে। পারতপক্ষে সে কারো মুখে মুখেই উত্তর দেয় না। কিন্তু আজ অনেকদিন বাদে কাকার কথাবার্তা যেন তার সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে গেল, অনেকদিনের সঞ্চিত রাগ এবং ক্ষোভ যেন বাঁধ ভেঙ্গে বেরিয়ে আসতে চাইল। কাকাকে যেন তার নিজের প্রধান শত্রু বলে মনে হল। আগাপিছু না ভেবে সে শর্মার মুখের দিকে তাকিয়ে নির্ভীকভাবে বলতে লাগল, ''পড়া যদি তাদের মাথায় না ঢোকে, তাহলে কি ঢুকবে? আমি যদি এতগুলো ছেলের মাঝখানে পড়াশুনো করতে পারি তাহলে ওরাই বা একলা আমি থাকলে কেন পড়াশুনো করতে পারবে না? ছেলেদের মন তাহলে মেয়েদের থেকে দুর্বল। আর আপনি আমাকে বিধবা বলে নিন্দে করছেন। আমি কি জন্ম থেকেই বিধবা নাকি? সবাই মিলে আপনারাই আমার বিয়ে দিয়েছিলেন। আমি কোনদিন স্বামীর বাড়িতে পা ও রাখিনি। তবু ও আমি কুমারী মেয়ের মতো থাকতে পারব না। বিধবা হওয়াটা কি আমার দোষ? আমি লেখাপড়া করবই। আগে সবসময় আপনি বলতেন যে মেয়েরা পড়াশুনো করলে বিধবা হয়। বিধবারা পড়াশুনো করলে পরে কি হয় তা তো দেখছি বললেন না? — নরকে অবিরত জ্বলে থাকা আগুনে পুড়ে পচে - গলে মরতে হবে নিশ্চয়ই? আমি সেইসবে একটু ও ভয় পাই না। নরকে যদি যেতে হয় যাবোই।'' শেষের কথাগুলি বলবার সময় লক্ষ্মীর মুখখানি টক - টকে লাল হয়ে গেল। দুচোখ জলে ভরে উঠল। হরিশর্মা হতভম্ব হয়ে গেলেন। এই ছোটমেয়েটির এত সাহস! তাঁর মুখে মুখে উত্তর দেয়! রাগে হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়ে তিনি চীৎকার করে উঠলেন, ''আর, তোর তেজ বড় বেশি? মা - বাবা তোকে এইসব শিখিয়েছে। কোথায় বিধবা হয়ে স্বামীর আত্মার মুক্তির জন্যে ব্রত - উপবাস করবি, তা না পড়াশুনো ফলাতে এসেছ। কেরানী হবি, না মুহুরী হবি?''

''আমি কেরানী মুহুরী কিচ্ছু হতে চাই না। মানুষ হতে চাই। আমার স্বামী কলেরায় মারা গেছেন। আমার পাপের ফলে মারা যান নি। হাজার হাজার মানুষ রোগে মারা যাচ্ছে। কেউ কারো পাপের জন্যে মরে না। বড়কাকীমা ও কলেরাতে মারা গিয়েছিলেন।

কাকীমা মারা যাওযার কয়েকমাস পরেই তো দেখেছি আপনি নতুন কাকিমাকে আনলেন। বড় কাকিমার আত্মার শান্তির জন্যে আপনি কত ব্রত-উপবাস করলেন?''

হরিশর্মা এবার আর থাকতে পারলেন না। বড় একটা বাঁশের কঞ্চি খামচে ধরে দাঁত কিড়মিড় করে বলে উঠলেন, ''তুই এখান থেকে দূর না'হলে এই কঞ্চির এক ঘা ....'' তাঁর বাক্যটি সম্পূর্ণ হওয়ার আগেই বেচারা ভদাই পরিস্থিতি ভয়ংকর দেখে দুহাত মেলে বাধা দেওয়ার ভঙ্গিতে এগিয়ে গিয়ে হাতজোড় করে বলল,

''ও কাকাবাবু, মায়ের কথায় কিছু দোয ধরবেন না। মনের দুঃখে তার মাথার ঠিক নেই। মা, চ'ল চ'ল,'' বলে সে লক্ষ্মীকে তাড়াতাড়ি সরিয়ে নিয়ে চলে গে'ল।

লক্ষ্মী বাড়ি ফিরেই বাবার কাছে গিয়ে ফুঁপিয়ে - ফুঁপিয়ে সব কথা বলে দিল। মেয়ের কথা শুনে পঞ্চানন শর্মার ও মনে জেদ চেপে গেল। লক্ষ্মীকে তিনি যেভাবেই হোক পড়াবেনই। হরির মতো চুকলিখোর মানুষকে তিনি পরোয়াই করেন না। পঞ্চানন শর্মা মানসিকভাবে নিজেকে সবসময়ই হরির মতো মানুষদের চেয়ে উপরের বলে ভেবে এসেছেন। গুণাভিরাম বরুয়ার সঙ্গে চেনা পরিচয় হওয়ার পর থেকে তিনি নিজেকে একজন উদার দৃষ্টিভঙ্গীর লোক বলেই ভাবতে চেষ্টা করেন। ফলে মেয়েকে গালমন্দ করেছে শুনে তাঁর নিজেকে যেন একজন সমাজ সংস্কারক বলে মনে হল। লক্ষ্মীর মতো নির্যাতিতা মেয়েদের রক্ষার দায়িত্ব যেন তাঁর। মেয়েকে সান্ত্বনা দিয়ে তিনি বললেন, ''মা, তুই কোনো চিন্তা করবি না। দেবী সরস্বতীকে স্মরণ করে নিজের পড়াশুনো করে যা। তোকে কেউ কিচ্ছু করতে পারবে না। হরিকে আজই আমি দু - কথা শুনিয়ে আসব। সে আমার মেয়েকে রাস্তার মধ্যে ধমক দেবার কে? তুই কাল থেকে আর সেই রাস্তায় যাবি না। পুকুরের ধারের পথ দিয়ে যাবি। রাস্তায় কারো সঙ্গে কথা বলার প্রয়োজন নেই। কেউ কিছু বললে ও চুপ থাকবি। শুধু শুধু কথা বাড়াবি নে।

তিন

দেখতে দেখতে কলিকাতায় স্বর্ণর একটি বছর পার হয়ে গেল। বন্ধের আগে আগে গুণাভিরাম কলিকাতায় গেলেন তাকে নিয়ে আসার জন্যে। এবার আর বিষ্ণুপ্রিয়া সঙ্গে যেতে পারলেন না। তিনি এর মধ্যেই আরও একটি পুত্রসন্তানের মা হয়েছেন। শিশুপুত্রটির নাম দেওয়া হল 'জ্ঞানদাভিরাম।' কিন্তু এত ছোট শিশুর এত বড় একটি নাম কেউই মেলাতে পারল না। ফলে অতিআদরে তাকে 'ছোট্টবাবা', 'বাচ্চাবাবা', 'মণিভাই', বলে ডাকা হত।

স্বর্ণ আসবে বলে গোটাবাড়িতে একটা আনন্দের সাড়া পড়ে গেল। যে যেমনভাবে পারে তাকে আদর আপ্যায়ন করার ব্যবস্থা করল। বিষ্ণুপ্রিয়া বাড়িতে জোহাধানের চিঁড়ে,

খৈ এসব তৈরি করলেন। যেদিন স্বর্ণর এসে পৌঁছানোর কথা সেদিন তিনি নিজের হাতে ওর প্রিয় 'মাছের টক' রেঁধে রাখলেন। সন্ধ্যেবেলায় ঘোড়ার গাড়ীটি গেটের মুখে আসার সঙ্গে সঙ্গে 'কমলা', 'করুণা', 'আপী', ঘরের রাঁধুণী, কাজের লোক সকলে গেটের বাইরে বেরিয়ে এল। কোলে শিশুপুত্রটিকে নিয়ে বিষ্ণুপ্রিয়া বারান্দায় এসে দাঁড়ালেন। স্বর্ণ গাড়ি থেকে নেমে এদিক ওদিক তাকিয়ে দ্যাখে। সামনের বকুলগাছ ও বেলগাছটি সমেত বাড়িটি আগের মতোই আছে। কিন্তু তার নিজেরই যেন কেমন অচেনা অচেনা লাগল। ভাই করুণা আর কমলা আগের থেকে অনেক বড়ো হয়েছে। তারা ওকে দেখে লজ্জায় মাথা নুইয়ে রাখে। মায়ের কাছে গিয়ে নতুন ভাইটির মুখখানির কাপড় সরিয়ে সে তার গালে চুমু খেল। ফর্সা, হৃষ্টপুষ্ট চেহারার ভাইটিকে দেখে তার ভীষন ভালো লাগল।

স্বর্ণর চেহারার চোখে পড়ার মতো বিশেষ পরিবর্তন হয়নি। কিন্তু বিষ্ণুপ্রিয়া লক্ষ্য করলেন যে সে একটু রোগা হয়ে গেছে। লম্বা ও হয়েছে। স্বর্ণর কথা - বার্তার অবশ্য যথেষ্ট পরিবর্তন হয়েছে। একবছর অসমীয়া ভাষা বলতে না পারার জন্যে প্রথম প্রথম তার কথার মাঝে মাঝে বাংলা শব্দ বলব না বলব করেও আপনি আপনি বেরিয়ে আসছিল। ভাইয়েরা হেসে উঠলে সতর্ক হয়ে সে শুধরে নিল। সে এখন সুন্দর বাংলা বলতে পারে। বোডিং এ থাকা মেয়েদের সঙ্গে সে বেশির ভাগ সময় বাংলাতেই কথা বলে। ক্লাসে অবশ্য ইংরেজ শিক্ষায়িত্রীরা ইংরেজীতেই কথা বলেন আর সেই জন্যে মেয়েরাও ইংরেজীতে কথা বলতে চেষ্টা করে। স্বর্ণ প্রথম দুদিন স্কুল আর বোর্ডিং এর কথা অনর্গল বলে গেল। মাঝে মাঝে মজার ঘটনা বলে সকলকে হাসাল। সে বাংলা জানে না বলে প্রথম প্রথম হাস্যকর কিছু কিছু ভুল করছিল সেই কথাগুলোও বারবার সবার সামনে বলার মত পরিস্থিতি হল। একদিন একটা সূঁচকে (অসমীয়াতে 'বেজী' বলে) মেয়েদের কাছে খুঁজতে যাওয়ার জন্যে গোটাদিন হাভাতের মত ঘুরতে হয়েছিল, এবং সবাই তাকে পাগলী বলে ভেবেছিল। পরে সে বুঝতে পারল যে বাংলাতে 'বেজী' মানে 'নেউল।'

সবসময়ই ভাতের থালার সামনে বসে স্বর্ণ হোস্টেলের রান্নাবান্নার কথা বলে। তাতে সব তরিতরকারীতেই এত ঝাল দেওয়া হয় যে স্বর্ণ প্রথম প্রথম কিছুই খেতে পারত না। পরে বোর্ডিং এর মহিলা সুপরিনটেন্ডেন্ট কথাটি জানতে পেরে তার জন্যে "ঝাল না দেওয়া" তরকারী, ঝোল আর নিজের ভাগ থেকে সরু চালের ভাত পাঠাতে লাগলেন। বাঙালী মেয়েরা সেদ্ধ চালের ভাত আর ঝাল - ঝাল ঝোল জিবে টকাস্ টকাস্ শব্দ তুলে খায় আর স্বর্ণর থালার সাদা ভাত টুকু দেখে "বিধবা বামনী" বলে ঠাট্টার ছলে হাসে। স্বর্ণ মিস লিপ্‌স্ কম্ব আর মিস মিটারের কথা প্রায়ই বলে। ওঁরা তাকে নিজেদের ঘরে নিয়ে গিয়ে কেক - বিস্কুট খেতে দেন। রোববার রোববার বসুপরিবারের কেউনা কেউ এসে ওকে বাড়িতে নিয়ে যান, ভালো ভালো খাবার খেতে দেন। সঙ্গে আবার বেশ কিছু খাবারের প্যাকেট বা পুঁটলিও দিয়ে দেন। বোর্ডিংয়ের মেয়েগুলি সেসব খাবারের ভাগ নেবার জন্যে অপেক্ষা করে থাকে।

স্বর্ণর কথা - বার্তা শুনে বিষ্ণুপ্রিয়ার মনে কষ্ট হয়। মেয়ের খাওয়ার কষ্ট হচ্ছে বলে তাঁর বিশ্বাস। কিন্তু এতদূর থেকে তাঁরই বা করার কি আছে? কখনো বা যদি কলকাতায় গিয়ে থাকতে পারতেন তাহলে হয়তো মেয়েকে সঙ্গে রাখতে পারতেন। কিন্তু এখন এসব কথা ভাবতে পারেন না। স্বামীর চাকরী, ছেলেকটিকে বড়ো করার চিন্তা এসবই তাঁকে ভাবতে হয়। তাই স্বর্ণ যে কদিন বাড়িতে থাকবে সেই কয়েকটা দিন তাকে ভালো ভাবে খাইয়ে - দাইয়ে স্বাস্থ্য ভালো করার চেষ্টা করা ছাড়া উপায় নেই।

বাড়িতে আসার পর থেকেই স্বর্ণর মনটা ছট্‌ফট্ করছে তারার সঙ্গে দেখা করার জন্যে। তারার আমেরিকা থেকে ফিরে আসার খবরটা মা তাকে দিয়েছেন। প্রায় তিনবছর সে তারাকে দেখেনি, মায়ের বক্তব্য অনুযায়ী তারা অনেক বড়ো হয়ে গেছে। কথা - বার্তা, কাজ - কর্মে তাকে কেউ হারাতে পারবে না। নর্ম্যাল স্কুলের পড়া মাঝপথে অসমাপ্ত করে চলে যাওয়ার জন্যে সে এখন আবার পড়া শুরু করেছে। এদিকে আবার অবসর মুহূর্তে সে হাসপাতালে নার্সের কাজও করে। আমেরিকায় সে নার্সের কাজে ট্রেনিং নিয়েছিল।

স্বর্ণ এসেছে জানতে পেরে তারা দু - চারদিন পরে এসে উপস্থিত হল। স্বর্ণ লক্ষ্য করল যে তার সাজ - গোজ আগের চেয়ে একটু আলাদা। সবসময় পরবার সূতির রিহামেখলার পরিবর্তে সে এখন নীলরঙের পাড়ওলা সাদা শাড়ি পরছে। পায়ে মোজা আর বক্‌লস্ দেওয়া স্যান্ডেল। ঠান্ডার দিন বলে আমেরিকা থেকে আনা ছোট একটি গরম কোট শাড়ির ওপরে পড়েছে। সে একলাই খ্রিস্টানপট্টির থেকে হেঁটে 'বিল্বকুটীরে' এল। স্বর্ণ তাকে দেখে সেই আগের মতোই অবাক্ হয়ে চেয়ে রইল। সে ভেবেছিল যে তার অভিজ্ঞতা তারার চাইতে একধাপ বেশি না হলেও অন্তত তারার সমান সমান হবে। কিন্তু তারা যে দেখতে এত বড় হয়ে যাবে সে কথা স্বর্ণ কল্পনাও করতে পারেনি। তারা এখন দেখতে এক ভদ্রমহিলার মতো। জীবনসম্পর্কে ও যেন তার অনেক গভীর জ্ঞান হয়েছে, স্বর্ণর এমনি মনে হল। ভাবতে ভাবতে স্বর্ণর মন হঠাৎই খারাপ হয়ে গেল। তারমানে সে কোনদিনই তারার সমান হতে পারবে না। কিন্তু মুহূর্তের মধ্যে তারা স্বর্ণর মনের সব আশঙ্কা দূর করে দিল। সেই আগের মতোই ও স্বর্ণর গালটিপে ভালোবেসে বলে উঠল,

"তুমি অনেক বড়ো হয়ে গেলে, স্বর্ণ। কলিকাতার মিষ্টি খেয়েও তুমি কিন্তু মোটা - সোটা হতে পারো নি। বোর্ডিং এর খাওয়াতে কষ্ট হচ্ছে হয়ত — ঈস্! স্বর্ণ জানো, মায়ের হাতের রান্নার স্বাদ তুমি কোথাও পাবে না। আমি সেই স্বাদ পৃথিবীর কোথাও পেলাম না।"

দুজনে বসে সেদিন অনেক কথা বলল। তারা তাকে আমেরিকা ভ্রমণের কথা বলল। কিন্তু স্বর্ণ দেখল যে বিদেশ ভ্রমণ সম্পর্কে তারার সেই আগের উচ্ছ্বাস নেই। সাহেব মেমের কথা বলবার সময় সে যেন আর আগের মতো তাদের প্রশংসাতে পঞ্চমুখ হয় না। শেষে স্বর্ণ যখন জিজ্ঞেস করল, "তোমার কোথায় বেশি ভালো লাগল, সেখানে না এখানে," তখন হঠাৎই তারা নিজের আসল মনোভাব খোলাখুলি প্রকাশ করল।

"সেখানে থাকার ব্যবস্থা সত্যিই খুব ভালো। রাস্তা-ঘাট, যান-বাহন, যন্ত্র-পাতি আরও কত যে সুন্দর সুন্দর জিনিষ। আমাদের এই জায়গা তার তুলনায় গহন অরণ্যের মতো। আমাদের মতো মানুষকে তারা ভিখারী বলেই ভাবে। কিন্তু তাহলেও আমার এখানেই ভালো লাগে। এখানে সব মানুষই আমার মতো। ধনী-গরীব, জাত-পাত আছে ঠিকই; কিন্তু মানুষ সব একই। সেখানে গিয়ে আমার নিজেকে বোকার মত লাগত। রাস্তায় গেলে ছোটছোট ছেলেমেয়েরাও তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে। কেউ কেউ হাততালি দিয়ে "নিগার, নিগার" বলে ঠাট্টা ও করে। পরে অবশ্য জানলাম যে 'নিগার' মানে হল 'নিগ্রো' — আফ্রিকার কালো মানুষেরা। আমরা তাদের চেয়ে অনেক ফর্সা। তবুও সাহেবদের চোখে আমরা 'নিগার'।

"কিন্তু পাদরীরা তো সেরকম নয়? তাঁরা তো দেখি তোমাকে খুবই স্নেহ করেন।" স্বর্ণ আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞেস করল।

"করে, করে। সেখানে ও সবাই আমাকে স্নেহ করত। কিন্তু আমার মনে হত যেন আসলে তাঁরা আমাকে অনুগ্রহ করেন। একদিন কি হল জানো! তুমি কিন্তু এই কথাটা মিশনের কাউকে বলো না, কেমন — " স্বর্ণ মাথা নেড়ে সম্মতি জানাল। তারা বলে যায়—

"একদিন বোষ্টন শহরের একটা গীর্জায় রোববারের সকালে প্রার্থনার পরে ছোট ছোট ছেলে মেয়েদের নিয়ে একটি সভা হল। তাতে একজন পাদরী সাহেব আমাকে সবার সামনে দাঁড় করিয়ে পরিচয় করিয়ে দিয়ে বললেন, এই মেয়েটি ভারতের একটি গ্রাম থেকে এসেছে। সেই গ্রামটি বন-জঙ্গলে ভরা একটি ভয়ঙ্কর জায়গা। তাতে আমাদের পাদরীরা গিয়ে অনেক কষ্টে সেখানকার বর্বর মানুষগুলোকে ঈশ্বরে বিশ্বাসী করে তুলেছেন। এই মেয়েটিকে দেখো। একে আমরাই তো সভ্যতার আলোক দেখিয়ে এরকম করেছি।" কথাগুলো শুনে আমার খুব রাগ হল। আমি মনে মনে চুপ করে থাকতে না পেরে সবার সামনে দাঁড়িয়ে ব'ললাম, "স্নেহের ভাই-বোনেরা, আমাকে এতদূরে আনার জন্যে পাদরী সাহেবদের ধন্যবাদ জানাচ্ছি, কিন্তু তোমরা একথা ভেবোনা যে নগাঁওতে সভ্য মানুষ নেই। সেখানে আরও অনেক হিন্দু মুসলমান এবং অন্যধর্মের লোক আছে যাদের ছেলে - মেয়েরা শিক্ষা - দীক্ষাতে অনেক এগিয়ে গেছে'। স্বর্ণ, আমি তাদের তোমার কথাও বল'লাম। তুমি যে কলকাতায় স্কুল বোর্ডিং - এ থেকে পড়তে গেছ, তা-ও বললাম। কিন্তু আমার কথাগুলি শুনে পাদরীসাহেব পরে আমাকে অনেক কড়া কড়া কথা শোনালেন। আমি নাকি তাঁদের কাজ-কর্মের নিন্দা করলাম। এই সব কথা-বার্তা আমাকে খুব কষ্ট দিয়েছিল।"

তারার কথাগুলি শুনে শুনে স্বর্ণর মুখে আনন্দের হাসি ফুটে উঠল। তারা বিদেশের ছেলেমেয়েদের সামনে তার কথা বলেছে শুনে সে মনে মনে খুব আনন্দ অনুভব করল। সে তারার সামনে নিজেরও দু একটি অভিজ্ঞতার কথা বলে শোনাল,

"আসলে বিদেশের লোকেরা আমাদের অসমের কথা কিছুই জানে না। সেইজন্যে আমাদের বর্বর বলে মনে করে। আমাদের স্কুলের মেয়েরাও আমাকে জিজ্ঞেস করে, অসম জেলাটি কোনদিকে? কলিকাতার পূর্বে না পশ্চিমে?" স্বর্ণ মেয়েদের কথা বলার সুরটি নকল করার চেষ্টা করে হেসে ফেলল।

"আর কি বলল বলত?" তারা জানতে আগ্রহী হয়ে ওঠে।

"একদিন কি হ'ল জানো, একটি বড় মেয়ে এসে আর সব মেয়ের সামনে আমাকে বলল যে আসামের লোকেরা কাপড় চোপড় পরতে জানে না। কাঁচা মাংস খায়। আমি রাগে কেঁদে ফেললাম। পরে মিস্ লিপ্‌স্ কম্বে মেয়েটিকে খুব ধমক দিলেন।"

সেইদিন কথা বলতে বলতে স্বর্ণ আর তারার মাঝে এক নতুন ধরনের বন্ধুত্ব গড়ে উঠল। শৈশবের স্বপ্নের জগৎ থেকে তারা যেন দুজনেই একসঙ্গে বাস্তবে বেরিয়ে এল। জীবনের মাত্র এই কয়েকটি দিনের টুকরো টুকরো অভিজ্ঞতাগুলিকে একসঙ্গে জোড়া লাগিয়ে দুজনে বুঝেছিল যে বাস্তব জগৎ অনেক কঠিন আর কঠোর। কিন্তু তার মাঝে স্বপ্নরচনার ও অনেক জায়গা আছে। স্বর্ণ শিশু সুলভ উৎসাহে বলেছিল,

"জানো, আমি বড় হ'লে একটি বই লিখব, তাতে আমি অসমের সম্পর্কে খুব ভালো করে লিখব যাতে কেউ আমাদের বর্বর ব'লতে না পারে। তাতে আমি তোমাব কথা, তোমার মায়ের কথা, আমার মায়ের কথা আর লক্ষীর কথাও লিখব। লক্ষ্মী ছে'লেদের স্কুলে এম - ই পড়ছে, জানো? সে খুব সাহসী মেয়ে। কাল আমাদের এখানে এসেছিল।"

"আমিও একদিন রাস্তায় তাকে দেখেছি। সে দেখতে এত সুন্দর হয়েছে, যে কোন একটি ভালো ঘরের ছেলে যদি তাকে বিয়ে করত, কি যে ভালো হত! কিন্তু বামুনেরা আবার বিধবাদের বিয়ে দেয় না যে। লক্ষ্মীর মন ও খুব ভালো। আমি নর্ম্যাল পাশ করে বালিরামের ইস্কুলে পড়াতে যাবো শুনে সে দীর্ঘশ্বাস ফেলে ব'ললে যে সম্ভব হলে সেও সেখানে কাজ করতে যেত। তার খুব শিক্ষিকা হওয়ার ইচ্ছে।

মেয়ে দুটির আলাপচারি চলতে থাকে। এদিকের অন্য একটি ঘর থেকে বিষ্ণুপ্রিয়া তাদের কথা-বার্তা শুনে ভাবেন, অভিজ্ঞতা মানুষকে কতখানি পালটে দেয়। চোখের সামনে বড় হওয়া এই মেয়েদুটি জীবন আর জগতের বিষয়ে কত গভীরভাবে চিন্তা করতে সক্ষম হয়েছে। তাদের বয়সে যে সব কথা তাঁর মনে কখনো আসেনি, সেইসব কথাই এখন তারা নিজেদের জ্ঞান আর যুক্তি দিয়ে বিচার করতে পারছে। এ যেন যুগ পরিবর্তনের চিহ্ন? হঠাৎই তারা আর স্বর্ণকে বিষ্ণুপ্রিয়ার যেন নিজের সঙ্গী বলে মনে হয়। তাদের থেকে যেন তাঁর অনেক কথা শেখার আছে।

চার

কলকাতাতে প্রথম দুবছর লক্ষেশ্বর অন্য দুজন অসমীয়া ছাত্রের সঙ্গে বাঙালি ছেলেদের একটি 'মেস' এ ছিল। কলকাতার অচেনা পরিবেশ, খাওয়া-দাওয়ার পরিবর্তিত রুচি আর ভাষা সমস্যার জন্যে লক্ষেশ্বর প্রথম দুমাস একটু ঘাবড়ে গেল। তারপরে একদিন সে গুণাভিরাম বরুয়ার পাঠানো মণিঅর্ডারের টাকা আর চিঠি পেয়ে স্বর্ণর খবর নেবার জন্যে বেরোল। কলকাতার রাস্তাঘাট তখনো সে ভালো করে চেনে না। তাই মেসের এক বাঙালী ছেলেকে সে সঙ্গী করল। মেয়েদের স্কুলে যেতে পারবে বলে হারাধন ঘোষ নামের ছেলেটি তক্ষুনি রাজি। লক্ষেশ্বরের মতো ছেলেরও যে বেথুন স্কুলে পড়া কেউ থাকতে পারে, সেই কথাই তাকে একটু অবাক্ করল। সে শুনেছিল বেথুনস্কুলে শুধু ধনী অভিজাত ব্রাহ্মদের মেয়েরাই পড়ে। দু-একটি ধনী পরিবারের হিন্দুমেয়েও অবশ্য চারিদিক ঢাকা ঘোড়ার গাড়িতে উঠে স্কুলে যাতা-য়াত করতে আরম্ভ করেছে। কিন্তু বাঙালি সর্বসাধারণের কাছে সেইসব মেয়েরা অন্য জগতের প্রাণীর মতোই তাদের কাছ থেকে দেখার জন্যে অন্য ছেলেদের মতো হারাধনের মনেও বহুদিনের একটি ইচ্ছে ছিল। বেথুন স্কুলে গিয়ে হারাধন আবারও অবাক্ হয়ে গেল। স্বর্ণকে দেখে তার যেন কোন অপ্সরী বলে মনে হল। এত কমবয়সে এত রূপ-লাবণ্য! স্বর্ণলতা অসমের 'ছোট লাটে'র মেয়ে বলে জানবার পরে হারাধনের মত চালবাজ সহজে হার না মানা ছেলে ও গম্ভীর হয়ে গেল। ঠিক এইসময়ে স্কুলের সামনে একটি সুন্দর ঘোড়ার গাড়ি এসে দাঁড়াল। ভেতর থেকে এক ভদ্রলোক ও সুন্দরী এক মহিলা নেমে এলেন। তাঁদের পোযাক-পরিচ্ছদ, হাঁটা-চলা দেখেই লক্ষেশ্বর বুঝতে পারল যে এঁরা নিশ্চয়ই কলকাতার কোনো ধনীপরিবারের। ভদ্রমহিলার আধুনিক ধরনের শাড়ি পরার স্টাইল দেখলেই বোঝা যায় যে, তিনি ব্রাহ্ম। দুজনে এসে ভিজিটার্সবুক' - এ সই করে লক্ষেশ্বরদের বসে থাকা ঘরটিতে এলেন। বোর্ডিং এর মেয়েদের সঙ্গে যদি কেউ দেখা করতে আসেন তাহলে তাঁকে সেই ঘরটিতে বসতে দেওয়া হয়। স্বর্ণ ইতিমধ্যে উজ্জ্বল হেসে তাঁদের কাছে গিয়ে প্রণাম জানাল। লক্ষেশ্বর আর হারাধন একটু অপ্রস্তুতভাবে একদিকে গিয়ে দাঁড়িয়ে রইল। স্বর্ণ ভীষণ উচ্ছ্বাসিত হয়ে ''কাকা কাকীমা'র সঙ্গে তাদের পরিচয় করিয়ে দিল। লক্ষেশ্বর তখন বুঝতে পারল যে এঁরা সকলেই হলেন কলকাতার বিখ্যাত ব্যারিষ্টার আনন্দমোহন বসুর পরিবারের। সেই সময়ে কলকাতার শিক্ষিত সমাজে আনন্দমোহন বসুর নাম শোনেনি এরকম কেউই ছিল না। সেইসময় গোটা ভারতবর্ষে দেশি ব্যারিষ্টার আঙ্গুলে গুনে বলা যায় কজন মাত্র। তার ওপরে বসু ছিলেন কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম ভারতীয় ''র‍্যাংলার।'' গণিতশাস্ত্রে প্রথম বিভাগে ট্রাইপস্ পাওয়া সকলেই ছিল কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ''র‍্যাংলার।'' আনন্দমোহন বসুকে কলকাতার শিক্ষিতসমাজ নারীশিক্ষার উন্নতির ক্ষেত্রে অগ্রগামী একজন ব্রাহ্মসমাজের নেতা বলেও জানতেন। ফলে সেরকম একজন বিশিষ্ট লোকের সঙ্গে

পরিচিত হতে পেরে হারাধন আর লক্ষেশ্বর দুজনেই নিজেদের ধন্যবলে মনে করল। স্বর্ণকে তাঁদের সঙ্গে রেখে ওরা দুজন বিদায় নিয়ে মেসে ফিরল।

রাস্তাতে হারাধন নিজের কৌতুহল দমন করতে না পেরে লক্ষেশ্বরকে স্বর্ণর বিষয়ে অনেক প্রশ্ন জিজ্ঞেস করল। স্বর্ণদের সঙ্গে লক্ষেশ্বরের কী সম্পর্ক? স্বর্ণর বাবা আনন্দমোহন বসুকে কীভাবে চিনলেন? — ইত্যাদি। লক্ষেশ্বর সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে পারল যে এইটেই তার বিজয়ের মুহূর্ত। এই মুহূর্তটি হাতের নাগালের বাইরে যেতে দেওয়া চলবে না। মেসের বাঙালি ছেলেগুলোর মাঝখানে নিজেকে বড়লোকের ছেলে হিসেবে পরিচয় দেবার এইটাই সুবর্ণ সুযোগ। সে নিজের এবং গুণাভিরামের সম্পর্কে বেশ কিছু মিথ্যে কথা বলে ফেলল। তার কথা বলার ধরণ দেখে হারাধনের মনে হ'ল যে লক্ষেশ্বরের বাবা নিশ্চয়ই অসমের একজন বড় জমিদার নাহলে ছোটখাট রাজা। ছোট-লাট, ব্যারিষ্টার এসব তাদের পরিবারে অনেক আছে। লক্ষেশ্বর বলল স্বর্ণর বাবা ছেলেবেলায় তাদের বাড়িতে থেকে পড়েছিলেন। পরে ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ এবং বিধবা-বিবাহ করার জন্যে তাঁকে সবাই একঘরে করে দিল। এখন স্বর্ণদের বাড়িতে তারা এককোঁটা জল গ্রহণ ও করে না। কিন্তু সে নিজে উদারচেতা বলে তাদের সঙ্গে আসা-যাওয়া বজায় রেখেছে।

বেথুন স্কুল থেকে মেসে ঘুরে আসার সময়টুকুতে লক্ষেশ্বর হারাধনকে প্রায় সম্পূর্ণভাবে বশ করে ফেলল। হয়তো অন্য সময় এসব কথা শুনলে হারাধনের মত চালাক ছেলে এত সহজে ভুলতো না। কিন্তু সেই সময়ে বেথুন স্কুল, স্বর্ণলতা, আনন্দমোহন বসু সবকিছু মিলিতভাবে হারাধনকে এমনভাবে মোহাচ্ছন্ন করে ফেলল যে লক্ষেশ্বরের কথা অবিশ্বাস করার মতো সুযোগ সে পেল না। সেইদিন থেকেই মেসে লক্ষেশ্বরের মান-সন্মান সকলের চোখে চর্তুগুন বেড়ে গেল। বাঙালী ছেলেরা তাকে ''বড়লোকের ছেলে'' জেনে সমীহ করতে লাগল। লক্ষেশ্বরও এদিকে গুণাভিরাম বরুয়ার পাঠানো টাকায় সুন্দর মিলের ফিনফিনে ধুতি, নতুন 'পাম্ - শু' আর পাঞ্জাবী কিনে নিয়ে 'বড়লোক' খেতাবটি ভালোমতো প্রমাণ করাতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল।

এফ. এ. (F.A) পাশ করে বি. এ. ক্লাসে ভর্তি হওয়ার সময় লক্ষেশ্বরের চেহারাটেহারার ও চোখে পড়ার মতো পরিবর্তন ঘটল। বামুনের যে টিকিটি ছিল সেটি সে কেটে ফেলে চুল গুলো ছোট করে ছেটে নিল। ধুতিটি দুই কোঁচায় পেছনের দিকে না গুঁজে বাঙালিদের মতো ঢিলেঢালা করে পরতে শুরু করল। ধুতির সামনের কোঁচাটি আজকাল থাকে তার বাঁ হাতের মুঠোয় বা পাঞ্জাবীর পকেটে। মোটকথা লক্ষেশ্বর একজন সভ্য ভব্য 'ভদ্রলোক' হয়ে উঠেছে। বি . এ. ক্লাশে নাম লেখানোর সঙ্গে সঙ্গে সে অন্য একটি মেসে চলে গেল। ওই মেসের সবছেলেরাই অসমীয়া। ফলে উড়িয়া রাঁধুনীর হাতে ইচ্ছেমতো খার, টক ঝোল মুখে জুত করে খাওয়ার সুবিধে হল। তার ওপরে চব্বিশঘন্টা অসমীয়াতে কথা বলতে এবং রাঁধুণী ছেলেটির সঙ্গে ভুলভাল বাংলা বলে রগড় করতে ও কোনধরনের অসুবিধে হল না। মোটকথা সেই মেসের বাসিন্দারা সেখানে একটি ক্ষুদ্র অসমের সৃষ্টি

করে নিয়েছিল। কলেজে থাকার সময়টুকু আর বাস-ট্রামে চলাফেরা করা এবং দোকান - বাজার যাওয়া সময়ের বাইরে অন্যসময় বাঙালিদের সঙ্গে বিশেষ সম্পর্ক না রেখেই এইসব ছাত্রেরা কলকাতায় থাকার দিনগুলি পার করে দিচ্ছিল। অসমের বিভিন্ন জেলার ছাত্রেরা এই মেসে একজন আর একজনকে ঢেকেরী, নলবরীয়া, নগঞা, গড়াগঞা বলে হাসি - ঠাট্টা করত আর নিজের নিজের জাতের, প্রতিবেশী, গাঁয়ের বা জেলার পরিচয় রক্ষা করে চলত। সেই জন্যেই অসমের থেকে আসা নতুন ছেলেগুলি এই মেসেটিতে থাকতে চাইত এবং অন্যমেসে থাকা পুরনো ছেলেরা এই মেসের "ঝাঁকের মধ্যে ঢুকতে" চেষ্টা করত। মেসটাতে শুধু যে ছাত্রদের ভিড় হয়েছিল তাই নয়। অসম থেকে কলকাতায় বেড়াতে যাওয়া লোকেরাও এই মেসের অতিথি হত। প্রতিটি ছাত্রই কোন দূরসম্পর্কীয় অতিথিকে ও কলকাতা ঘুরিয়ে দেখানোটা নিজের কর্তব্য বলে মনে করত। এই অতিথিদের আগমন মেসের পরিবেশকে আরও বেশি ঘরোয়া করে তুলত। অসমের বিভিন্নদিকের নানারকমের মুখরোচক গুজবেরও এখানে আদান - প্রদান হত।

এইসব কারনেও লক্ষেশ্বর এই মেসটিতে চলে এল। এখানে অন্তত তার অস্তিত্ব বিপন্ন হওয়ার সম্ভাবনা কম। আগের মেসে বাঙালি ছেলেদের কথা-বার্তা শুনে সে কখনো কখনো হীনমন্যতায় ভুগত। অন্তত যে কয়েকজন ভদ্রলোকের মেধাবীছেলেকে নিজের সমকক্ষ বলে মনে করত তাদের আলোচনার মধ্যে ও সে প্রায়ই ঢুকতে পারেনি। একদিন মেসে দুজন বাঙালি ছেলের মধ্যে তর্ক আরম্ভ হল শ্রী চৈতন্যকে কেন্দ্র করে। একজন ছিল চৈতন্যদেবের পরমভক্ত, আর অন্যজন ছিল দেবীভক্ত বা শাক্ত। চৈতন্যের ভক্তটি প্রমান করতে চেষ্টা করল যে শ্রীচৈতন্য, নিত্যানন্দ আর অদ্বৈত ছিলেন শ্রীকৃষ্ণের অবতার। অন্যজন যুক্তি দেখাল যে শ্রীচৈতন্য কৃষ্ণভক্ত ছিলেন। ভক্ত নিজে ভগবান হতে পারেণ না। অন্যজন চৈতন্যসংক্রান্ত কীর্তন গানগুলি গেয়ে গেয়ে বোঝাল যে ভগবানের মাঝে যিনি সম্পূর্ণ বিলীন হয়ে যেতে পারেন তিনি ভগবানেরই অঙ্গ। ফলে তিনিই ভগবান। এইভাবে অনেকক্ষণ তর্ক - বিতর্ক চলল। মেসের অন্য ছেলেরাও সেই তর্কে ভাগ নিয়ে দুইপক্ষের হয়ে যুক্তি প্রদর্শন করল। অসমীয়া ছেলেকটিকে চুপচাপ দেখে একজন লক্ষেশ্বরকে উদ্দেশ্য করে বলল —

"কি হে কটকী, আপনাদের ওদিকে বৈষ্ণবধর্ম প্রচার করার প্রধান গুরু কে ছিলেন?"

লক্ষেশ্বর একটু সময় থতমত খেয়ে চুপ করে রইল। তারপরে গম্ভীরসুরে বলল,

"শ্রীমন্ত শঙ্করদেব নামে একজন গুরু আমাদের ওদিকে বৈষ্ণব ধর্মপ্রচার করেছিলেন।"

"বলতো, আমাদের চৈতন্যদেবের সঙ্গে তাঁর মতের কোথায় কোথায় মিল ছিল?"

এইবার লক্ষেশ্বর মহাবিপদে পড়ল। সে শঙ্করদেবের নামই শুনেছে। তাঁর লেখা সে কিছুই পড়েনি, এবং তাঁর জীবনচরিত জানবার ও চেষ্টা করেনি। গুণাভিরাম বরুয়ার মুখে সে দু - একটা কথা শুনেছে। কিন্তু সেই বিষয়ে কখনো গভীরভাবে চিন্তা করেনি। তবু ও বাঙালি ছেলেদের সামনে নিজের অজ্ঞতা প্রকাশ করবে না ভেবে সে এদিকে ওদিকে

চেয়ে হেসে ব'লল,

"দুজনে একই কথা বলেছিলেন। ভাষা দুটোই যা একটু আলাদা - আলাদা।"

একজন ছেলে জিজ্ঞেস করল "তারমানে শঙ্করদেবও রাধার প্রেমের মাধ্যমে কৃষ্ণকে পাওয়ার কথা বলেছিলেন।"

"হ্যাঁ, সে বিষয়ে তাঁর লেখা অনেক বরগীত আছে।" লক্ষেশ্বর আশা করেছিল যে সেই ঘরের মধ্যে থাকা অন্যান্য অসমীয়া ছেলেরাও এবিষয়ে তার মতোই অজ্ঞ। ফলে কেউ প্রতিবাদ করবে না। কিন্তু লক্ষেশ্বরের ভাগ্য খারাপ, সেইদিন ধর্মকান্ত বরুয়া নামে শিবসাগরের একটি ছেলে এক কোনে বসে ছিল। ছেলেটি সাধারণত বেশি কথা বলে না। কিন্তু সত্যকথা বলতে কখনোই চুপ করে থাকে না। লক্ষেশ্বর শঙ্করদেবের বিষয়ে নিজের বক্তব্য শেষ করার সঙ্গে সঙ্গে ধর্মকান্ত প্রতিবাদ করে উঠল,

"কটকী, আপনি বোধহয় শঙ্করদেবের সম্পর্কে কিছুই পড়েন নি। না হলে এরকম উক্তি করতেন না। আমি যেটুকু জানি তা থেকে এইটে স্পষ্ট যে শঙ্করদেব চৈতন্যদেবের মতো শৃংগাররসের ওপরে কোথাও সমান গুরুত্ব দেন নি। তিনি ভক্তকে দাসেরও দাস বলে বলেছেন আর পরমভক্তকে 'মুক্তিতে নিস্পৃহ' বলে উল্লেখ করেছেন। আপনার না জেনে-শুনে একজন মহাপুরুষ সম্পর্কে এরকমভাবে উক্তি করাটা উচিত হয় নি।"

লক্ষেশ্বর ফাঁদে পড়ে ঘটনাটা হালকা করে দেবার ছলে বলল "আরে রাখুনতো বরুয়া, আপনি ও শঙ্করদেব সম্পর্কে জানেন না, আমিও জানিনা। ফলে কে শুদ্ধ আর কে ভুল এর বিচার কে করবে?"

এইবার ধর্মকান্ত রেগে গিয়ে বলে উঠল, "কটকী, নিজের ভাষা, সাহিত্য ও ধর্মের বিষয়ে কিছু নাজানাটা কোন গৌরবের কথা নয়। এখানে উপস্থিত আজ আমাদের সকলের লজ্জা পাওয়া উচিত যে আমরা শঙ্করদেব সম্পর্কে কিছুই জানি না,অসমীয়া সাহিত্যের অতীতের বিষয়েও কিছুই জানিনা, অথচ ইংরেজী সাহিত্য পড়তে এসেছি।" ধর্মকান্তর কথার প্রতিবাদ করতে কেউই সাহস করল না, কারন বরুয়া খুব একরোখা ধরনের। রেগে উঠলে কেউই তার রাগ থামাতে পারে না। তাই লক্ষেশ্বর চুপ করে গেল। কিন্তু সেইদিনই সে ঠিক করল যে এরকমভাবে অপমান সহ্য করে থাকার চেয়ে নির্ভেজাল অসমীয়া মেস একটাতে চলে যাওয়াই সমীচীন হবে।

ধর্মকান্ত বাঙালি ছেলেদের মেসটিতেই থেকে গে'ল। কিন্তু সেই দিনের আলোচনা তার মনে এতই গভীর ছাপ ফেলল যে দুদিন পরে সে বিষয়ে আলোচনা করার উদ্দেশ্যে সে অসমীয়া ছেলেদের মেসে হাজির হল। সকলের সামনে সে মনের ক্ষোভ প্রকাশ করে বলল, "আমরা অসমীয়া ছেলেরা নিজের সাহিত্য - সংস্কৃতির কথা কিছুই জানি না। এটা কি কম লজ্জার কথা? নিজেকেই যারা জানে না, তারা অন্যের কথা কি বুঝবে? যেদেশে বৃক্ষ নেই এরকম দেশে এরন্ড গাছই বৃক্ষ। আমাদের নিজেদের মনে এক ধরনের অহংভাব পোষণ করি যে আমরা নিজের জায়গাতে এক একজন বিখ্যাত ব্যক্তি। আমরা অন্যের

সঙ্গে কথা বলতে চাইনে, কিজানি যদি নিজেদের অজ্ঞতা ধরা পড়ে। আমাদের সহপাঠী বাঙালি ছেলেগুলোকে দেখতো, তারা নিজেদের ভাষাসংস্কৃতিকে নিয়ে কিরকম গৌঁরব করে, কতো তর্ক-বিতর্ক করে। আমরাই নিজেদের লোকজন, সম্পর্কে আলোচনা করি না। অসমের চা বাগানে কুলিদের ওপর কিরকম অত্যাচার চলছে তাও আমরা বাংলা কাগজ থেকেই জানতে পারি। অসমের শঙ্করদেব কে ছিলেন তাও জানবার জন্যে আমাদের এখন কার বাংলা বই পড়ে জানতে পারব সেইভেবে অপেক্ষা করতে হয়।''

উত্তেজিত ধর্মকান্তর কথা শুনে প্রথমে দু - একজন মেসবাসী হাসি ঠাট্টা মস্করা করবার চেষ্টা করেছিল। বেশিভাগ ছেলের মনেই কথাগুলি গভীর ছাপ ফেলল। একজন চিন্তিত ভাবে বলল,

''শঙ্করদেবের কথা জানতে হলে আমাদের সত্র গুলোতে গিয়ে চরিত জাতীয় পুঁথি খুঁজে দেখতে হবে। সহজ অসমীয়া ভাষায় দেখছি তাঁদের জীবনী একটিও নেই।''

ধর্মকান্ত জোর দিয়ে বলল —

''আমাদেরই লেখার দায়িত্ব নিতে হবে।''

''কিন্তু, আমাদের অত সময় কোথায়? ইংরেজী সাহিত্যের বায়রন শেলীর জীবনী পড়তে পড়তেই আমাদের সময় চলে যাচ্ছে। পড়া শুনো শেষ করে তবে কিছু একটা করতে হবে।''

ধর্মকান্ত অধৈর্য হয়ে পড়ল। অসমীয়া ছেলেদের এই হচ্ছে বদ অভ্যাস। সব কিছুই পরে করব বলে ফেলে রাখে।

''না, না, অন্যদের জন্যে কাজ রেখে দিলে হবে না। আমাদের প্রত্যেকেরই এক একটি দায়িত্ব নিয়ে কাজে লেগে যেতে হবে। অসমীয়া সাহিত্যের একটি ইতিহাস লিখতে হবে, অসমীয়া পুরনো লেখকদের একটি তালিকাও করতে হবে। মহাপুরুষদের জীবনচরিত লিখতে হবে। অসমের লোকদের সমস্যা সম্পর্কে লেখবার জন্যে একখানি খবরের কাগজ লাগবে — '' ধর্মকান্ত এক নিঃশ্বাসে কথাগুলো বলে শেষ করার আগেই অন্য একটি ছেলে ঠাট্টা করে বলল ''এই যে বরুয়া, আপনি খিদের চোটে কলার কাঁদি পাকাতে চাইছেন নাকি? এইসব কাজ করতে একযুগ লাগবে। ধীরে ধীরে সবই হবে।''

''আমার এই ধীরে ধীরে কথাটিই ভালো লাগে না, বুঝেছ। এই শব্দটি আমাদের জাতিকে অলস করে তুলেছে। যে কাজই হোক্ না কেন এক রাত্রির মধ্যেই তা হতে হবে, না হলে তা কখনো সম্পূর্ন হয় না।'' ধর্মকান্ত চূড়ান্ত কথা বলার মতো করে বলল।

''আপনি দেখছি লাচিত বরফুকনের মামার কথা বলার মতো বললেন। তারপরে কাজ না হলে কজন মামাকে কাটবেন? জোর - হাটের নকুল গোস্বামী নামে ছেলেটি ধর্মকান্তর মনের ভাব ভালোকরে বুঝতে না পেরে একটু বিদ্রুপ করার চেষ্টা করতেই মুহূর্তের মধ্যে ধর্মকান্ত রাগে অগ্নিশর্মা হয়ে উঠল''। দরকার হলে সব মামাদেরই কেটে ফেলব'' বলে সে দপদপিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। অবশ্য পরে আরও দুজন ছাত্র

পেছন - পেছন গিয়ে তাকে বুঝিয়ে ডেকে আনল চা খাওয়ার জন্যে। সেদিন থেকে অসমীয়া ছেলেদের মধ্যে ধর্মকান্তের একটা গোপন ঠাট্টার নাম প্রচলিত হ'ল — ''লাচিত''।

ধর্মকান্ত একটু অন্যধরনের ছেলে। অসমীয়া ছেলেদের মধ্যে তার কোন অন্তরঙ্গ বন্ধু নেই। প্রায়ই সে একলা একলা কলকাতার রাস্তাঘাটে ঘুরে বেড়ায়। কোথায় যায়তা কেউই ভাল করে বলতে পারে না। নিজের পাঠ্যবইয়ের বাইরেও নানা ধরনের বই এনে আপন মনে পড়ে যায়। কথা বার্তা শুরু করলে সে শাক - ভাত খাওয়ার কথা বলে না — দেশের কথা, জাতির কথা, ইতিহাসের কথা এইসব বলতে বলতে সে উত্তেজিত হয়ে অনেকক্ষন বক্তৃতা দিতে পারে। যখন সে বুঝতে পারে তার কথায় কেউ গুরুত্ব দিচ্ছে না, তখন সে রাগ করে চলে যায়। কিন্তু বাঙালী ছেলেদের মধ্যে ধর্মকান্তর যথেষ্ট আদর। সে না থাকলে তাদের আড্ডা জমে না। ফলে মেসে যে কোন 'গরম' আলোচনা হলেই ধর্মকান্তর ডাক পড়ে। ধর্মকান্তর যে কোন যুক্তির প্রতি ওদের শ্রদ্ধা আছে। কেউ যদি যুক্তিপূর্ণ কথায় তার বক্তব্য খন্ডন করে তাহলে তার খারাপ লাগেনা। কিন্তু সিরিয়াস আলোচনাতে হালকা কথার ছলে ইয়ার্কি করলে তার রাগ হয়। ধর্মকান্ত মেধাবী ছাত্র। প্রেসিডেন্সি কলেজের বি.এ. ক্লাসে এটি তার শেষ বছর। শিক্ষক, সহপাঠী সকলেরই আশা সে সসন্মানে বি.এ.পাশ করবে। ধর্মকান্ত নিজের বাড়ির কথা খুব কম বলে। সঙ্গী ছেলেরা তার সম্পর্কে শুদু এটুকুই জানে যে সে 'শিবসাগরের' ছেলে। ছেলেবেলায় বাবা মারা গেছেন, তাই চা বাগানে মামারবাড়িতে সে বড় হয়েছে। তার বাবা লোকনাথ বরুয়া যে পিয়ালী বরুয়ার অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন আর মনিরাম পিয়ালীর বিচারের সময় রাজদ্রোহের অভিযোগে তাঁকে যাবজ্জীবন কারাবাসের দন্ড দিয়ে কালাপানিতে পাঠানো হয়েছিল সে কথা কোন ছেলেই জানত না। প্রায় দুবছর জেলখাটার পরে লোকনাথ বরুয়া কালাপানিতে অসুস্থ হয়ে মারা যান। ইংরেজের কবল থেকে অসমকে উদ্ধার করে স্বর্গদেব কন্দর্পেশ্বর সিংহকে রাজপাটে বসানোর প্রবল আকাঙ্খায় লোকনাথ এবং আরও অন্যান্য অনেক সম্ভ্রান্তবংশীর ব্যক্তি যখন গুপ্ত সভা করতেন তখন ধর্মকান্তের জন্মই হয়নি। সেই মহান স্বাধীনতা সংগ্রামীদের ফাঁসি আর কারাদন্ডের ছমাস পরে মামারবাড়িতে ধর্মকান্তের জন্ম হল। মামা ছিলেন ইংরেজ মালিকের চা বাগানের বড় বাবু। ভগ্নীপতির রাজদ্রোহের জন্যে বাগানের সাহেবের কোপদৃষ্টির ভয়ে মামা লোকনাথ বরুয়ার নাম বাড়িতে কাউকে উচ্চারণ করতে দিতেন না। ধর্মকান্ত ছেলেবেলা থেকে দেখে এসেছে বাবার কথা জিজ্ঞেস করলেই মা খালি চোখের জল ফেলতেন। সে সমজদার হবার পরে মা একদিন তাকে কাছে বসিয়ে বাবার জীবন বৃক্তান্ত শুনিয়ে ছিলেন। তখন মায়ের মনোভাব দেখে সে অবাক হল। বাবার জীবনের বিরত্বের কাহিনী বলার সময় মায়ের চোখে মুখে একধরনের গৌরবের ভাব ফুটে উঠত। তিনি বলেছিলেন ''দাদা আমাদের আশ্রয় দিয়েছেন। তোকে পড়াশুনো করিয়ে মানুষ করছেন। তাঁর ঋন আমরা কখনো শোধ করতে পারবো না। তাঁর চাকরিতে সমস্যা হতে পারে চিন্তা করে আমি এতদিন চুপ করে আছি। না'হলে আমি

কখনোই তোদের বাবার মতো এরকম একজন বীরের কথা তোদের কাছে লুকোতাম না। তিনি চুরি - ডাকাতি করে জেলে গিয়ে জীবনে কষ্ট পেয়ে প্রান দেননি, নিজের দেশের জন্যে প্রান দিয়েছেন। তুই যেন তাঁরই মতো স্বাধীনচেতা হোস্, আমি তাই চাই। বাবার পরম শত্রু ইংরেজ সরকারের অধীনে তোকে যেন গোলামী করতে না হয়।"

মায়ের কথা শুনে কিশোর ধর্মকান্তর মনে নানারকমের গোলমেলে চিন্তা এসে পড়ল। সে পিতৃ হত্যার প্রতিশোধ নেবার পরিকল্পনা করে। কিন্তু বাবাকে কারাদন্ডে দন্ডিত করা সাহেবকে কোথায় খুঁজে পাওয়া যাবে সে ব্যাপারে তার কোনো স্পষ্ট ধারনা ছিল না। কখনো কখনো সে ভাবল সঙ্গের ছেলেগুলিকে সঙ্গে নিয়ে একটি ফৌজ গঠন করে সে ইংরেজদের সঙ্গে যুদ্ধ করে তাদের তাড়িয়ে দেবে। তার মনের ভেতরে দিনরাত্রি তোলপাড় করা ভাবনা গুলো সে কাউকে বুঝিয়ে বলতে পারত না।

ধর্মকান্তকে কলিকাতায় পড়াতে পাঠানোর মূলে ছিল মায়ের প্রবল আগ্রহ। বাবার আমলের ভিটে - মাটির অল্প যা সরকারের হাতে চলে যায়নি, সেইটুকু বিক্রি করে তিনি ধর্মকান্তকে কলিকাতায় পড়ানোর খরচ যোগাড় করলেন। শিবসাগর হাইস্কুলে পড়বার সময় তৃতীয় শিক্ষক গোপালচন্দ্র ঘোষ ধর্মকান্তকে খুব স্নেহ করতেন। ওখানে পড়বার সময়েই সে রাজা রামমোহণ রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মহান্ ব্যক্তিত্বের কথা শুনেছিল। গোপালবাবু সবসময় বলতেন, "আমরা কুসংস্কার আর অন্ধবিশ্বাসের দাস হয়ে না পড়লে ইংরেজরা কখনই আমাদের দাবিয়ে রাখতে পারত না। আধুনিক শিক্ষা - দীক্ষায় আমাদের মন মুক্ত হলে তবেই ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে দেশের লোক মাথা তুলে দাঁড়াতে পারবেন। অতএব কুসংস্কারের বিরুদ্ধে একটি জনজাগরন গড়ে তুলতে পারলেই আমাদের জাতি শক্তিশালী হয়ে উঠবে।"

গোপালবাবুর কাছেই ধর্মকান্ত ব্রাহ্মসমাজের মূল কথাগুলো শিখেছিল। সেই সময়ে শিবসাগরে নতুন ব্রাহ্ম কয়েকজন বাঙালি শিক্ষিত ব্যক্তি ছিলেন। তাঁরা একজোট হয়ে ধর্মালোচনা, উপাসনা ইত্যাদিতে অংশ নিতেন। ধর্মকান্ত ও গোপালবাবুর সঙ্গে সেরকম দু - একটি সভায় গিয়েছিল। কিন্তু ব্রাহ্মধর্ম তাকে আকর্ষন করতে পারেনি। ধর্মকান্ত সেই বয়স থেকেই কোনো ধরণের সংকীর্ণ মনোবৃত্তি সহ্য করতে পারত না। পরনিন্দা, কুৎসা - রটনা, জাত - পাতের বাছ - বিচার, এই সব যেন তার নিঃশ্বাস - প্রশ্বাস বন্ধ করে দেয়। ব্রাহ্মধর্মের উদার মনোভাবের মধ্যেও ধর্মকান্ত একধরণের সংকীর্ণ মনোভাবই দেখতে পেত। ওদের এরকম একটাভাব যেন তাঁদের বাইরে পৃথিবীর আর কোন মানুষ সৎপথে চলছে না।

কলকাতায় ধর্মকান্তের জীবনে একটি বড় পরিবর্ত্তন দেখা দিল। এতদিন তার মনের ভেতরে ধিকি - ধিকি জ্বলতে থাকা প্রতিশোধের আগুনের স্ফুলিঙ্গ যেন অন্যধরণের আগুনে রূপান্তরিত হল। সে বুঝতে পারল যে একশো বছরের ইংরেজ শাসনে শুধুমাত্র তারমতো দু - একজনকে সর্বহারা করে ছাড়েনি, হাজার হাজার চা বাগানের কুলী,

পাটকলের শ্রমিক আর নীলক্ষেতের চাষীদের ও সর্বস্বান্ত করেছে। তার বাবা এক মহান উদ্দেশ্যে অনুপ্রাণিত হয়ে শহীদ হওয়ার জন্যে এগিয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু এই গরীব শ্রমিকরা বিনাকারনে তিলতিল করে অনাহার অত্যাচারের বলি হয়েছে আর তাদের রক্ত জল করা পরিশ্রমের ফলবেচে ইংরেজ ব্যবসায়ীরা লাখলাখ টাকা উপার্জন করছে। ধর্মকান্ত এসব কথা প্রথম জানতে পারল 'ভারত শ্রমজীবী' নামের একটি বাংলা সংবাদপত্র থেকে। সংবাদ পত্রটির তেজস্বীভাষা আর শ্রমিক জীবনের ওপরে লেখা হৃদয়বিদারক বিবরণ পড়ে ধর্মকান্ত অভিভূত হয়ে গেল। সংবাদ পত্রের সম্পাদক শশিপদ ব্যানার্জীর সঙ্গে দেখা করবার জন্যে সে তখন উদগ্রীব। বহু চেষ্টা করে সে তাঁর ঠিকানার খোঁজ পেল এবং একদিন একলা গিয়ে সে তাঁর সঙ্গে দেখা করল। ব্যানার্জীর ব্যক্তিত্ব আর আদর্শবোধ তার মনে গভীর প্রভাব ফেলল। এই মানুষটি ব্রাহ্মসমাজের অর্ন্তভুক্ত না হয়েও একাকী সমাজ বিপ্লব আনার জন্যে মনেপ্রাণে লেগেছিলেন। কলকাতার বরানগরে নিজের পত্নীর সাহায্যে বিধবা নারীদের জন্যে একটি স্কুল গড়ে তুলছেন আর নিজে অগ্রগামী হয়ে সমাজের প্রচন্ড আপত্তির বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে বেশ কয়েকজন বিধবা মেয়ের বিয়ে দিয়েছেন। কলকাতার দুঃখী শ্রমিকদের জন্যে তিনি এক নৈশবিদ্যালয় স্থাপন করেন, একটা 'ওয়ার্কমেনস্ ক্লাব' ও খোলেন। এইসবের পরে ও তিনি নিজের সম্মাদনায় 'ভারত শ্রমজীবী' নিয়মিতভাবে বার করতেন। মানুষটির আত্মত্যাগ, নিঃস্বার্থ মানব - প্রেম এবং অক্লান্ত পরিশ্রম করার ক্ষমতা দেখে ধর্মকান্তর তাঁর প্রতি শ্রদ্ধায় মাথা নত হয়ে গেল। ব্যানার্জীবাবুর খবরের কাগজের জন্যে খবরাখবর যোগাড় করে সহায়তা করার কাজে সে নেমে পড়ল। বন্ধের সময় বাড়িতে ফিরে ধর্মকান্ত চা - বাগানের শ্রমিকদের দুঃখ - দুর্দ্দশার খবর সংগ্রহ করে ''ভারত শ্রমজীবী'তে পাঠাত। তার এই কাজকর্মের কথা কিন্তু অসমীয়া ছাত্ররা বিশেষ জানত না। নিঃসঙ্গ আর ভাবুক প্রকৃতির বলে নতুন ছেলেরা তাকে একটু সমীহ করে চলত এবং পুরনো ছেলেরাও তার থেকে যথাসম্ভব একটু দূরত্ব রক্ষা করেই চলত।

পাঁচ

ধর্মকান্ত সেদিন লক্ষেশ্বরের মেসে গিয়ে অসমীয়া ছেলেদের অজ্ঞতা সম্পর্কে চেঁচামেচি করার পরে দু - একটি ছেলের মনে শুভবুদ্ধির উদয় হল যে মাঝে মাঝে মেসে তো আমরা একটি করে আলোচনা সভার ব্যবস্থা করতে পারি। কয়েক বছর আগেও নাকি মানিকচন্দ্র বরুয়া, গঙ্গাগোবিন্দ ফুকন, জগন্নাথ বরুয়া প্রমুখ কলকাতাতে পড়তে যাওয়া ছাত্ররা মিলে এক সাহিত্য - সভা'র আয়োজন করেছিলেন। অগ্রবর্তীর ভূমিকা নেওয়া যুবকেরা চলে যাওয়ার পরে সভাটির অকালমৃত্যু ঘটে। সেই সভার আদর্শে এখন আর একটি আলোচনা সভা গড়ে তোলার জন্যে মেসের ছেলেরা জল্পনা - কল্পনা করতে লাগল/করল। প্রথমে

কিছু ছেলে ফাঁকি দেবার চেষ্টা করছিল। কিন্তু যখন তারা জানতে পারল যে অসমের গণ্যমাণ্য দু - একজন ব্যক্তিকে ও মাঝেমধ্যে মেসের আলোচনা সভাতে নিমন্ত্রণ করে আনা হতে পারে, তখন তাদের মনের ভাব পাল্টে গেল, কারণ বেশির ভাগ ছাত্রই ভবিষ্যতে সুযোগ - সুবিধা নেওয়ার মতলবে অসমের উচ্চপদস্থ সরকারী চাকুরেদের সঙ্গে আলাপ - পরিচয়ে ইচ্ছুক ছিল।

বেশ কয়েকদিন চিন্তাভাবনার পর ঠিক হল যে অসমের 'ছোটলাট' গুণাভিরাম বরুয়া মাঝে মধ্যে কলকাতায় যেহেতু এসে থাকেন, তাই সভাটির উদ্বোধন করবার জন্যে তাঁকেই নিমন্ত্রণ করা যুক্তি যুক্ত। লক্ষেশ্বরের সঙ্গে তাঁর ভালো পরিচয় আছে জানবার পরে তার ওপরেই বরুয়া মশাইকে নিমন্ত্রণ করে নিয়ে আসার ভার দেওয়া হল। ভাগ্য ভালো তাই সেই সময় কোনো বিশেষ কাজে গুণাভিরাম বরুয়া কলিকাতাতেই ছিলেন। লক্ষেশ্বর মেসের দুটি ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে তাঁর থাকবার জায়গায় অর্থাৎ আনন্দমোহন বসুর বাড়িতে গিয়ে উপস্থিত হল। বসু পরিবারের প্রাসাদোপম বাড়ি ঘর আর বিলাতী কায়দায় আসবারপত্র দেখে লক্ষেশ্বররা প্রথমে একটু ভ্যাবচ্যাকা খেয়ে গেল। কিন্তু আশ্বস্ত হল বাড়ির সকলের অমায়িক ব্যবহারে। বরুয়া মশায়ের সঙ্গে কথা - বার্তা বলার পরে সভার দিনক্ষণ ইত্যাদি ঠিক করা হ'ল। বরুয়ার আগ্রহ ও উৎসাহের সীমা নেই। কলকাতাতে থেকেও অসমীয়া ভাষা - সাহিত্যের চর্চার প্রতি লক্ষেশ্বরের আগ্রহ দেখে তাঁর খুব আনন্দ হল। সেইদিনই স্বর্ণ ও বেথুনের বোর্ডিং থেকে বাড়িতে এসেছিল। সেও ছাত্রদের সঙ্গে বসে খোলাখুলিভাবে সভার বিষয়ে নানা কথা আলোচনা করল এবং নিজস্ব মতামত ও জানাল। লক্ষেশ্বরের সঙ্গী ছেলেদুটি অর্থাৎ দুর্গেশ্বর গোঁহাই আর নবীন শহকীয়া দুজনেই সেদিন স্বর্ণর রূপলাবণ্য আর ব্যবহারে মুগ্ধ। তারা কখনো কল্পনাই করেনি যে অসমীয়া মেয়েরাও শিক্ষাদীক্ষাতে এত এগিয়ে গেছে। পশ্চিমী শিক্ষায় শিক্ষিতা মেয়েরা বিপথে যায় বলেই তারা এতদিন শুনে এসেছে। পড়াশুনো করা মেয়েরা নাকি যুবকদের সঙ্গে বসে ঠাট্টা - ইয়ার্কি মারে, গুরুজনদের শ্রদ্ধাভক্তি করে না আর সবদিক থেকে নির্লজ্জ আর খারাপ স্বভাবের হয়। কিন্তু স্বর্ণর মধ্যে তারা এসব বদগুনের একটাও দেখতে পেল না। মেয়েটির নম্র, অমায়িক ব্যবহার, সুরুচিপূর্ণ কথাবার্তা আর পড়াশুনোর প্রতি আগ্রহ দেখে ছাত্ররা এই প্রথম উপলব্ধি করতে পারল যে শিক্ষার আলো পেলে নারীসুলভ গুণাবলি অনেকবেশি বিকশিত হয়।

সেদিন মেসে ফিরে এসেই দূর্গেশ্বর আর নবীন শইকীয়া পাকে প্রকারে স্বর্ণলতার কথা বারবার তুলে লক্ষেশ্বরের কাছ থেকে মেয়েটির সম্বন্ধে আরও জানবার চেষ্টা করল। লক্ষেশ্বরও ছেলেদুটির মনের অবস্থা অনুমান করে অন্যদিনের মতোই নিজের গুরুত্ব বাড়াবার চেষ্টা করে। তাদের মনে হিংসার উদ্রেক করার উদ্দেশ্যে একবার সে বলে ফেলল,

"স্বর্ণকে আমার সঙ্গে বিয়ে দেবার জন্যে হাকিম মশাই চেষ্টা করছেন। কিন্তু একটি ব্রাহ্মমেয়েকে বিয়ে করে আমি তো সমাজে একঘরে হতে পারি না। তারপরে আবার হাকিমমশাই বিধবা বিয়ে করেছেন। কোন ভালো পরিবারের অসমীয়া ছেলেই এরকম

বাড়ির মেয়ে বিয়ে করবে না - একথা তাঁদের জানা উচিত।''

লক্ষেশ্বরের নির্মম মন্তব্য শুনে কিন্তু সঙ্গী দুজনের হিংসা হওয়ার পরিবর্তে স্বর্ণর প্রতি অনুকম্পায় মন ভরে গেল। দুর্গেশ্বর দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল,

''শুনছ, আমাদের সমাজ ভয়ঙ্কর ভাবে পিছিয়ে পড়ে আছে। নাহলে ওইরকম মেয়ের জন্যে কখনোই ছেলের অভাব হয় না।''

লক্ষেশ্বর ঠাট্টা করে বলল, ''আপনার যদি সাহস থাকে তাহলে চেষ্টা করে দেখতে পারেন। সমাজ একঘরে করলেও চারদিক থেকে আপনার লাভই হ'বে।''

লক্ষেশ্বরের হালকা মন্তব্যে বিরক্ত হয়ে দূর্গেশ্বর উত্তর দিল, ''কটকী, আপনি যদি ব্রাহ্ম হওয়াতে এবং বিধবাবিবাহ করার জন্যে গুণাভিরাম বরুয়া মহাশয়কে এত ঘৃণা করেন তাহলে কেন মুখে লোক দেখানো ভালো লাগার কথা বলেন? তাঁর সামনে সমাজ সংস্কারের কথা কেন বলেন? তাঁর মাসে মাসে পাঠানো মানিঅর্ডারের লোভে নাকি? হাকিম মশাই যদি আপনার সম্পর্কে কিছু মিথ্যে আশা করেনও, আপনি খোলাখুলিভাবে তাঁকে কেন বলে দিন না যে আপনি মা - বাবার পছন্দ করা ন-বছরে ছিঁচকাঁদুনে একটি মেয়েকেই বিয়ে করবেন।''

হয়তো চোখের সামনে স্বর্ণর মুখখানি ভেসে উঠছিল তাই দুর্গেশ্বর হঠাৎ নিজের স্বল্পভাষী স্বভাব পরিত্যাগ করে মুর্হুমুহ লক্ষেশ্বরকে আক্রমন করে কথাগুলি বলে ফেলল। লক্ষেশ্বরও তার উষ্মা দেখে আশ্চর্য হয়ে গেল। কথা আরও বাড়তে পারে বুঝে কাজের অজুহাতে লক্ষেশ্বর দুর্গেশ্বরের হাত থেকে পালিয়ে বাঁচল।

নির্দিষ্ট এক বুধবারে অসমীয়া ছাত্রদের মেসে আলোচনা সভা। গুণাভিরাম বরুয়া সভা উদ্বোধন করে অতিসুললিত ভাষায় তাঁর বক্তব্যে অসমের পুরনো সভ্যতাও সংস্কৃতির মোটামুটি একটি বিবরণ তুলে ধরলেন। তাঁর কথা শুনে সব ছাত্রই মুগ্ধ হল। তারপরে ছাত্রদের বক্তৃতা দেবার পালা। দু - একজন পুরনো 'অরুনোদই' তে বেরোনো প্রবন্ধ এবং আরও দু - একটি ইংরেজী বা বাংলা প্রবন্ধের অনুবাদকে একটু এদিক ওদিক করে পাঠ করল। শেষে ধর্মকান্ত দু - এক কথা বলবার জন্যে উঠে দাঁড়াল। ও কোনো রচনা পাঠ করল না। কিন্তু একটু ও না থমকে তার মনের কথাগুলি অনর্গল বলে গেল। প্রথমেই বলল অসমে সাহিত্য - চর্চার অভাবের কথা! অসমীয়া সাহিত্যের ইতিহাস একখানাও নেই, নির্ভরযোগ্য অভিধানও বলতে গেলেও একখানাও তৈরি হয়ে ওঠে নি। বঙ্গদেশে একসঙ্গে এতগুলি সংবাদপত্র চালু আছে। কিন্তু অসমে 'অরুনোদই'র পরে যদি বা একটি 'আসামবিলাসিনী' নামে সংবাদ পত্র বেরিয়েছিল সেও বন্ধ হয়ে গেল। অসমীয়া সাহিত্যের উন্নতির জন্যে অসমীয়া শিক্ষিত যুবকদের যতখানি চেষ্টা করা উচিত ছিল, তা একেবারেই করেনি। ধর্মকান্ত অসমের অর্থনৈতিক দুরবস্থা সম্পর্কেও বলল। অসমে চায়ের চাষ করে ইংরেজরা সবাই লাখ - লাখ টাকা লুটছে, অথচ অসমের লোকদের কোনো উন্নতি হয়নি। চা - বাগানের কুলিদের দুঃখ দুর্দশার কথা ধর্মকান্ত হৃদয় - বিদারক ভাষায় বর্ণনা করল।

ধর্মকান্তের কথাগুলি গুণাভিরাম বরুয়া খুব মন দিয়ে শুনছিলেন। ছেলেটির বুদ্ধিদীপ্ত চেহারা, চোখে আশার আলো আর তার বক্তব্যে যে বিশ্বাসের দৃঢ়তা ফুটে উঠেছিল তা দেখে গুণাভিরামের নিজের যুবক বয়সের কথা মনে পড়ছিল। তাঁর ও একসময় প্রবল ইচ্ছা ছিল সংস্কারের আগুন জ্বালিয়ে তাতে সমাজের কুসংস্কারগুলি পুড়িয়ে ফেলবেন। কিন্তু এতদিনেও তিনি কিছু করতে পারলেন না। সমাজের কুসংস্কারের বিরুদ্ধে নিজের ব্যক্তিগত জীবনটাকে প্রতিবাদ হিসাবে দাঁড় করালেই কি সমাজের কতটুকু উপকার হয়? নিজে এগিয়ে গিয়ে তিনি তো কোনো সামাজিক আন্দোলন গড়ে তুলতে পারলেন না। ধর্মকান্তের অভিযোগগুলি যেন তাঁর নিজের বিবেকের কণ্ঠস্বর বলে মনে হল।

সভা শেষ হলে তিনি ধর্মকান্তকে কাছে ডেকে তার পরিচয় জিজ্ঞেস করলেন। শিবসাগরের লোকনাথ বরুয়ার ছেলে বলে জানতে পেরে তিনি ধর্মকান্তকে তার স্বর্গীয় পিতার সুযোগ্য পুত্র বলে প্রশংসা করলেন। ধর্মকান্তকে এই প্রথম নিজের পিতৃ - পরিচয় দেওয়ার পরে এক অস্বস্তিকর নীরবতার সম্মুখীন হতে হল না। গুণাভিরাম বরুয়া ইংরেজ সরকারের একজন উচ্চপদস্থ কর্মচারী হওয়া সত্ত্বেও স্বর্গীয় লোকনাথ বরুয়ার নাম শুনে নাক কোঁচকালেন না। বরং সকলের সামনে তাঁকে অসমের একজন বীরসন্তান হিসেবে স্বীকৃতি দিলেন। গুণাভিরাম বরুয়ার প্রতি ধর্মকান্তের শ্রদ্ধা বেড়ে গেল।

ধর্মকান্ত এরপরে বেশ কয়েকবার গুণাভিরাম বরুয়ার সঙ্গে দেখা করে অনেক বিষয়ে আলাপ - আলোচনা করল। গুণাভিরাম কলিকাতার ব্রাহ্ম - সমাজসংস্কারকদের সম্পর্কে বলবার পরে একদিন খুব দুঃখের সঙ্গে বললেন যে অসমে শঙ্কর - মাধবদেবের পরে আর একজন ও সমাজসংস্কারকের আবির্ভাব হল না। অথচ সমাজ দুর্নীতি গ্রস্ত। ধর্মকান্ত আগ্রহ এবং উৎসাহের সঙ্গে উত্তর দিল,

"অসমে আপনি ছাড়া নেতৃত্ব দেওয়ার আর কোনো যোগ্য লোক নেই। আমার মতো আরও অনেকে হয়ত আপনার মুখের দিকে তাকিয়ে আছে। আপনি যদি একটি পত্রিকা বার করে তার মাধ্যমে নতুন যুগের ধ্যান - ধারণা প্রচার করতে শুরু করেন তাহলে সমস্ত অসমীয়া সমাজের মহা উপকার হবে।

গুণাভিরাম মুচকি হেসে কিছুক্ষণ মাথা নীচু করে রইলেন। ধর্মকান্তের কথায় তার হারিয়ে যাওয়া আত্মবিশ্বাস যেন অনেকখানি ফিরে পেলেন। দীর্ঘ শ্মশ্রুতে হাত বুলিয়ে তিনি আস্তে আস্তে বলে গেলেন,

"আমিও একটি পত্রিকা বার করার কথা অনেকদিন ধরে ভাবছিলাম। তুমিও যখন বললে তখন মনে সাহস পাচ্ছি। কিন্তু অসমের কথা আমার আগেও অনেকেই চিন্তা করে গেছেন। আনন্দরাম ঢেকিয়াল ফুকন, মনিরাম দেওয়ান — এঁদের কথা তুমিতো জানোই। তাঁদের প্রতি পরম শ্রদ্ধায় মাথা নত করে আমাদের কাজে এগিয়ে যেতে হবে। অসমে আধুনিক যুগে কোনো আন্দোলন হয়নি একথা সত্যি। তার প্রধান কারণ হল জ্ঞানের অভাব। আমরা যদি বিজ্ঞান, শিল্প আর সাহিত্যের বিষয়ে জন সাধারণকে যথাযথ শিক্ষা

দিতে পারি তাহলে নিজেকে অসমের প্রকৃত বন্ধু বলে পরিচয় দিতে পারব।"

পত্রিকা বের করা নিয়ে দুজনে অনেকক্ষণ কথাবার্তা বললেন। কথা প্রসঙ্গে একবার গুণাভিরাম ধর্মকান্তকে তার ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার কথা জিজ্ঞেস করলেন। ধর্মকান্তের মনে তখন হাজারটা পরিকল্পনা তোলপাড় করছে। কোন্ কাজটা প্রথমে হাতে নেবে, কোন্টাই বা পরে, তখনও পর্যন্ত সে ঠিক করতে পারেনি। কিন্তু এইসব পরিকল্পনার ভেতরে নিজের জীবিকা অর্জনের বিষয়টাই বাদ পড়ে গেছে। গুণাভিরাম তার সমাজেসেবার উদ্যমে বাধা দিতে চাইলেন না। কিন্তু পিতৃসুলভ স্নেহে তিনি তাকে বললেন যে সে যদি সরকারী চাকরী না করে তাহলে বেঁচে থাকবার জন্যে তাকে অন্য একটি পথ খুঁজে নিতে হবে। নাহলে অন্যের ওপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল হয়ে চললে কখনো কখনো নিজের আদর্শ থেকে বিচ্যুত হওয়ার সম্ভাবনাও থাকে। গুণাভিরাম এর পরে স্বাধীন ব্যবসা করার প্রস্তাব করলেন। অসমে তাঁর পরিচিত দু - একজন চা, কাঠ, জাহাজ কোম্পানী ইত্যাদির ব্যবসা আরম্ভ করেছে। ধর্মকান্ত ইচ্ছে করলে তাঁদের একজনের সঙ্গে স্বাধীন ব্যবসাতে নামতে চাইলে তিনি সুবিধেও করে দিতে পারেন।

ধর্মকান্ত বিশেষ কিছু না ভেবেই প্রস্তাবটিতে সম্মতি দিল। বি. এ. পরীক্ষার তখনও দুমাসের মতো সময় আছে। তাই ও বিষয়ে সে খুব বেশি চিন্তা করল না। গুণাভিরাম বরুয়া কিন্তু অসমে ফিরে গিয়ে ধর্মকান্তকে চিঠি দিয়ে জানালেন যে নগাঁওর কাছাকাছি তপতজুরি চা বাগানের মালিক দেবনাথ বরুয়া নিজের বাগানে তাকে একটি কাজ দিতে চাইছেন। তাই বি. এ. পরীক্ষা শেষ হলেই সে যেন নগাঁওয়ে আসে। ধর্মকান্তকে অসমে আসতে বলার মূলে গুণাভিরামের অন্য একটি উদ্দেশ্য ছিল। তার মতো উদ্যামী ছে'লে একটির সাহায্য পেলে তিনি নিজেও পত্রিকা বের করার পরিকল্পনার কাজে হাত দিতে পারেন।

ধর্মকান্ত গুণাভিরামের সঙ্গে কলকাতায় কথা-বার্তা বলবার সময় স্বর্ণও মাঝে মাঝে উপস্থিত থাকত্। বাবার মুখে ধর্মকান্তর পরিবারের ইতিহাস শোনার পরে তার যুবকটির সম্পর্কে জানার প্রবল কৌতূহল হল। কিন্তু ধর্মকান্ত বই, পত্র - পত্রিকা, আদর্শ, তত্ত্ব ইত্যাদি বিষয়ে অনেক কথা বলত, নিজের কথা বলত কদাচিৎ। স্বর্ণ কখনো সখনো একটি বা দুটি মন্তব্য করত। আর সে লক্ষ্য করত যে ধর্মকান্ত তার কথার যথেষ্ট গুরুত্ব দিত। অন্য ছেলেদের মত তার মুখের দিকে হাঁ করে তাকিয়ে থাকত না। সেইজন্যে স্বর্ণর ধর্মকান্তকে ভালো লাগত আর সে তাকে সম্মান ও করত। স্বর্ণ তখন শৈশব আর যৌবনের জটিল সন্ধিক্ষণে। এই সময় কার প্রতিটি সম্পর্কই একটি মেয়ের মনে গভীর ছাপ ফেলে যায়। পরে হয়ত জীবনের নতুন নতুন অভিজ্ঞতা সেইসব ছাপকে ঢেকে ফেলে, কিন্তু সম্পূর্ণভাবে মুছে ফেলতে পারে না। ধর্মকান্তের দেশপ্রেম আর আদর্শবোধ স্বর্ণকে গভীরভাবে অনুপ্রানিত করল। তাই সে মনে মনে সিদ্ধান্ত নিয়েছিল যে সে ও পড়াশুনো করে অসমীয়া ভাষা সাহিত্য আর সমাজের উন্নতির জন্যে কাজ করবে। কোনদিন অসমীয়া ভাষা চর্চা না করা স্বর্ণ তার পর থেকে মা ও বাবাকে অসমীয়াতে চিঠি লিখতে

শুরু করল। প্রথমে একটু অসুবিধে হচ্ছিল। কিন্তু বাবা মার উৎসাহে সে আস্তে আস্তে শুদ্ধ অসমীয়া লিখতে শিখে নিল। ছুটিতে বাড়িতে গিয়ে সে বাবার আলমারী থেকে "অরুনোদই এর সংখ্যাগুলি" পড়বার জন্যে বের করে নিল।

ছয়

ব্রাহ্মদের উৎসব বা পর্বের সংখ্যা অন্যান্য হিন্দুর তুলনায় অনেক কম। মাঘ মাসের এগারো তারিখে 'মাঘোৎসব' আর ভাদ্রমাসে কেশবচন্দ্র সেনের নতুন মন্দির প্রতিষ্ঠা দিবস 'ভাদ্রোৎসব।' এই দুটিই ছিল ব্রাহ্মদের প্রধান উৎসব। এরমধ্যে আবার 'আদি - ব্রাহ্মসমাজে'র সদস্যদের কাছে মাঘোৎসবই একমাত্র প্রধান উৎসব বলে গণ্য হয়। দুটি উৎসবই অনাড়ম্বর গুরুগম্ভীর আর শান্ত পরিবেশে উদ্যাপন করা হত। স্বাভাবিকভাবেই, দুর্গাপুজো, কালিপূজার মতো জাঁকজমকপূর্ণ বাঙালিদের উৎসবের তুলনায় ব্রাহ্ম অনুষ্ঠানগুলি যেন বড় ম্লান মনে হতো। হয়তো ব্রাহ্মনেতারাও বুঝতে পেরেছিলেন যে সবসময় মূর্তিপুজাতে অভ্যস্ত বাঙালিদের কাছে হঠাৎ সব জাঁকজমক ত্যাগ করে নিরাকার ব্রহ্মের উপাসনা করাটা খুবই কঠিন হবে। পশ্চিমী শিক্ষায় শিক্ষিত প্রথম সারীর ব্রাহ্মদের ক্ষেত্রে সম্ভব হলেও ভবিষ্যতে বেশি সংখ্যক ব্রাহ্মদের আকৃষ্ট করতে হলে অন্য একপ্রকারের জাঁক - জমকের সৃষ্টি করা প্রয়োজন। নাহলে শেষে বাগবাজারের পুজোর ঢাকের আওয়াজ ব্রহ্ম সংগীতের কোমল সুরকে অশ্রুত করে দিতেও পারে। এসব ভেবেই হয়তো মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ প্রত্যেক বছর খুব উৎসাহ ও আনন্দের সঙ্গে নিজের জোড়াসাঁকোর বিরাট বাসভবনে 'মাঘোৎসব' করার আয়োজন করতেন। এই উৎসবে কলকাতার সব ব্রাহ্মপরিবার এবং অন্য দু - একটি সম্ভ্রান্ত পরিবারও নিমন্ত্রিত হতেন।

স্বর্ণ কলকাতায় পড়তে যাওয়ার পর গুণাভিরাম বেশ কয়েকবার মাঘোৎসবের সময় কলকাতায় যাওয়ার কথা ভেবেছিলেন। কিন্তু সরকারী কাজকর্মে ব্যস্ততার জন্যে সেই সময় যাওয়াটা সম্ভব হয়ে ওঠেনি। স্বর্ণকে কলকাতায় রাখার তিনবছরের মাথায় মাঘোৎসবে উপস্থিত থাকার সুযোগ করতে পারলেন। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে গুণাভিরামের পুরনো চেনাশোনা। স্কুলে পড়বার সময় তিনি তাঁর অভিভাবক আনন্দরাম ঢেকিয়াল ফুকনের সঙ্গে ঠাকুর বাড়িতে বেশ কয়েকবার গিয়েছিলেন। কলকাতার ধনাঢ্য তথা অভিজাত ব্যক্তিদের মধ্যে পুরোভাগে থাকা দ্বারকানাথ ঠাকুর ছিলেন আনন্দরাম ঢেকিয়াল ফুকনের বন্ধু। ফলে কলকাতার ছাত্রাবস্থা থেকেই ঠাকুর পরিবারের সঙ্গে গুণাভিরামের ভালো পরিচয় হয়েছিল আর ব্রাহ্মসমাজের প্রতি তখন থেকেই তিনি আকৃষ্ট হয়েছিলেন।

সাত

স্বর্ণর বয়স তখন তের বছর। সাধারণত নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ বাড়ির মেয়েদের সেই বয়সে অবিবাহিতা অবস্থায় বাড়িতে রাখে না। কিন্তু ব্রাহ্মদের মধ্যে নতুন করে প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী চোদ্দবছর হলে তবেই একজন মেয়ে বিয়ের উপযুক্ত হয়। কেশবচন্দ্র সেনের নেতৃত্বে ব্রাহ্মরা সমাজসংস্কারের জন্যে যে সব পদক্ষেপ নিয়েছিলেন তার মধ্যে এটি ছিল একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। ব্রাহ্মদের পরামর্শে ১৮৭২ সালে (আঠারেশো বাহাত্তর সালে) সরকার যখন ' নেটিভ্ ম্যারেজ এ্যাক্ট, প্রবর্তন করলেন তখন বিবাহের উপযোগী হওয়ার জন্যে ছেলেদের আঠারো আর মেয়েদের বয়েস চোদ্দবছর হতে হবে বলে নির্দ্ধারিত হয়েছিল। ফলে ব্রাহ্ম রীতি অনুযায়ী স্থির করা বিবাহগুলি আইনত গ্রাহ্য হওয়ার জন্যে বয়সের ক্ষেত্রে নিম্নতম সীমারেখাটি মেনে চলার প্রয়োজন ছিল।

গুণাভিরাম বরুয়া নিজের দ্বিতীয় বিবাহটি যদিও আইনসঙ্গত ভাবে রেজিস্ট্রি করিয়েছিলেন এবং স্বর্ণর বিবাহ সেইরকমভাবেই দেবেন বলে ভেবে রেখেছিলেন। সেইজন্য স্বর্ণর বিবাহ সম্বন্ধে তিনি তখন পর্যন্ত ও বিশেষ চিন্তা করেন নি। তার চোদ্দবছর হলেও সে ব্যাপারে চিন্তা করবেন এরকম একটা বোঝাপড়া ভেতরে ভেতরে তিনি তার পত্নীর সঙ্গে করে রেখেছিলেন। কিন্তু এইবার মাঘোৎসবের পরে বিষ্ণুপ্রিয়ার মনটা হঠাৎই পাল্টে গেল। সেইদিন জোড়াসাঁকোতে সকলেই স্বর্ণকে যে রকমভাবে দেখছিল তাতে তাঁর পুরনো দিনের মনটা আশঙ্কাতে কেঁপে কেঁপে উঠছিল। তাঁর প্রথম স্বামীর দুটি মেয়েকে যথাক্রমে ন - দশ বছরে বিয়ে দেওয়া হয়েছিল। তখন তিনি একবারও তা অন্যায় বলে ভাবেন নি। গুণাভিরামের প্রভাবে আধুনিক মানসিকতা ও ভাবধারার সঙ্গে তিনি পুরোমাত্রায় মানিয়ে চলার চেষ্টা করেছিলেন। আর অনেকদূর পর্যন্ত সফলও হয়েছেন। কিন্তু তবুও পুরনো বিশ্বাসগুলি অনেকসময়ই তাঁর মনের মধ্যে মাথা চাড়া দিয়ে ওঠার চেষ্টা করত। মেয়েদের সমাজের সামনে খুব বেশি করে দেখাতে নেই; পুরুষের দৃষ্টি মেয়েদের মন অপবিত্র করে' — এরকম বিশ্বাসের কথা স্বামীর সামনে খোলাখুলিভাবে বলবার সাহস তাঁর কোনদিন ছিল না, কারণ তিনি জানতেন যে গুণাভিরাম সেইসব বিশ্বাসকে কখনই প্রশ্রয় দেবেন না। কিন্তু অসমে ফিরে যাওয়ার দিন এগিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মন ব্যাকুল হয়ে উঠল। তিনি ভাবলেন স্বর্ণকে যদি সঙ্গে নিয়ে যেতে না পারি তাহলে অন্তত একটি ভালোঘরের ছেলের সঙ্গে তার বিয়ের বন্দোবস্ত করে যাওয়া উচিত। বিষ্ণুপ্রিয়া সবসময় আশা করতেন যে ভালো বংশের একটি অসমীয়া ব্রাহ্মন ছেলের সঙ্গে স্বর্ণর সম্বন্ধ করবেন। কিন্তু তিনি আস্তে আস্তে উপলব্ধি করলেন যে অসমের কোনো নৈষ্ঠিক ব্রাহ্মণ পরিবার তাঁদের ঘরের সঙ্গে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করতে চাইবে না। লক্ষ্মীর বিয়ের দিনের ঘটনাই তাঁকে এই নির্মম সত্যটি স্মরণ করিয়ে দিয়েছিল। ব্রাহ্মণ ছাড়া অন্যান্য উচ্চজাতের মানুষেরা বিধবা - বিবাহ সমর্থন করেন না বলে তিনি বুঝতে

পেরেছিলেন। তাই ব্রাহ্মণ পরিবারের বাইরে তাঁদের পরিবারের মেয়ে গ্রহণ করার কোন মানুষই নেই বলে তিনি বুঝতে পেরেছিলেন।

কলিকাতার প্রথম সারির ব্রাহ্ম পরিবারগুলির কথা ভাবতেই স্বাভাবিক ভাবে তাঁর প্রথমেই মনে এসেছিল জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবারের কথা। সেরকম একটি অতি সম্ভ্রান্ত পরিবারের ছেলের সঙ্গে স্বর্ণকে বিয়ে দিতে পারলে বিষ্ণুপ্রিয়া নিজেকে ধণ্য বলে মনে করবেন। তাঁর স্বামীও সেরকম একটি সম্বন্ধকে গুরুত্ব দেবেন বলেই তাঁর বিশ্বাস। আর স্বর্ণের মনের কথাও যেন বিষ্ণুপ্রিয়া ধরতে পেরেছেন। মাঘোৎসবের পর থেকেই স্বর্ণ যে বড় আনমনা হয়ে পড়েছে। একলা একলা বসে কবিতা পড়তেই তার এখন ভালো লাগে। মাঝে মাঝে "বাল্মীকি প্রতিভার" গানগুলি গুনগুনিয়ে নিজের ভাবে বিভোর হয়ে থাকে। বিষ্ণুপ্রিয়া শেষে একদিন কথাটা গুণাভিরামের সামনে তুললেন —

"মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের ছোট ছেলে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে স্বর্ণর সম্বন্ধ হলে কেমন হয়?"

স্ত্রীর প্রশ্নটা প্রথমে গুণাভিরামকে অবাক্ করে দিল —

"সোনামার বিয়ের বয়স তো এখনো হয়নি। এখনি কেন এসব কথা তুলছ?"

বিষ্ণুপ্রিয়া যেন উত্তরটা ভেবেই রেখেছিলেন, "এখন থেকে কথা-বার্তা পেড়ে রাখলে তবেই সময়মতো বিবাহ দিতে পারব। তার বয়স হতে হতে মানে ধর যদি ছেলেটির অন্য জায়গায় সম্বন্ধ হয়ে যায়।"

গুণাভিরাম একটু চিন্তা করে বল'লেন,

"ঠাকুর পরিবার ছাড়াও অন্য জায়গায় ভাল ছেলে থাকতে পারে। এত তাড়াহুড়ো কিসের?" — গুণাভিরাম যেন নিজের মনের কোনো একটা শঙ্কা স্ত্রীর কাছে লুকোতে চাইলেন। বিষ্ণুপ্রিয়া একটু আশ্চর্য হয়ে স্বামীর মুখের দিকে চেয়ে বললেন, "ঠাকুর পরিবার সম্পর্কে আপনার কি কোনো আপত্তি আছে? আমার ধারণা সোনামার জন্যে এরকম একটি সম্পর্কই সবথেকে ভালো হবে। তার ওপর আমাকে দু - একজন একথাও বলেছেন যে রবীন্দ্রনাথেরও নাকি এ বিষয়ে মত আছে —" শেষের কথাটি বলবার সময় একটি ছোটমেয়ের মতোই বিষ্ণুপ্রিয়াও লজ্জায় লাল হয়ে গেলেন। তাই দেখে গুণাভিরামের মনটাও কোমল হয়ে গেল। তিনিও মুচকি হেসে বললেন,

"যদি ছেলে মেয়ের মনের মিল হয় তাহলে আমাকে ও চেষ্টা করতে হবে।

কথাটা সেইদিন সন্ধেবেলাই গুণাভিরাম দূর্গামোহন দাসকে বললেন, দূর্গামোহন এক কথাতেই বল'লেন, "স্বর্ণ আর রবীন্দ্রনাথের জোড় সুন্দরভাবে মিলবে। এত জ্ঞানীগুণী একটি ছেলের জন্যে স্বর্ণর মত সুন্দরী, শিক্ষিতা মেয়ে একটিরই প্রয়োজন। কিন্তু সমস্যা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথকে নিয়ে। তাঁর মত পাওয়াটা খুব সহজ হবে না।"

"কিন্তু সেইদিন মাঘোৎসবে তিনি নাকি স্বর্ণ সম্পর্কে খবর নিয়েছিলেন।"

গুণাভিরাম নিশ্চিন্ত সুরে বললেন — "তাঁর মানে হল তিনি তাকে পছন্দই করেছেন।"

দূর্গামোহন কিছুক্ষণ একটা কথাও না বলে চুপচাপ রইলেন। কিন্তু তাঁর মুখের ভাব

দেখে বোঝা গেল যে তাঁর মনের কোন এক জায়গায় এ প্রসঙ্গে একটু খুঁত্‌খুঁতুনি আছে। তবুও মুখ ফুটে কিছু না বলে তিনি শুধু বল'লেন —

"বরুয়া মশাই, কথাগুলি আপনি নিজে ভাবার মতো এত সহজ নয়। তবুও আমি লালবিহারী ঘোষের মারফৎ খবর নেবো। ভদ্রলোক একজন পাকা ঘটক। ঠাকুরবাড়িতে যাতায়াত আছে।"

দুদিন পেরিয়ে গেল। গুণাভিরামের ছুটির মেয়াদও শেষ হতে চলল। কিন্তু লালবিহারী ঘোষ এসে কোনো খবরই দিলেন না। অবশেষে বিষ্ণুপ্রিয়ার উৎকন্ঠা দেখে নিজেই একদিন ঘোষবাবুর কাছে খবর নিতে গেলেন। খবর পেয়ে ঘোষবাবু এসে পৌঁছোলেন। ভদ্রলোকের সঙ্গে আগে ও একবার গুণাভিরামের দেখা হয়েছিল। তখন তাঁকে তাঁরা বেশ রসিক মানুষ বলেই মনে হয়েছিল। কিন্তু সেদিন তাঁর গম্ভীর চেহারা, আর মুখে ও লেশমাত্র হাসির চিহ্ন না দেখে গুণাভিরাম বুঝলেন যে সংবাদ শুভ নয়। লালবিহারী বাবু বলব কি বলব না করে ও বললেন —

"আপনাদের প্রস্তাবটি ঠাকুরবাড়ির সবাই খুব আগ্রহের সঙ্গে গ্রহণ করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথও নাকি সম্মতি জানিয়েছিলেন। কিন্তু শেষে কোনো এক অজানা কারণে বলতে পারব না, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ মত দিলেন না।"

লালবিহারীবাবু এরপর সান্ত্বনার সুরে অনেক কথা বললেন। এমনকি স্বর্ণর জন্যে উপযুক্ত একজন ভালো পাত্রের খবর এনে দেবেন স্বেচ্ছায় এরকম দায়িত্ব ও নিলেন। কিন্তু গুণাভিরামের আর অন্য কোনকথা শোনবার ধৈর্য ছিল না। স্বর্ণর জন্যে এক অজানা আশঙ্কায় তাঁর মনটা কেঁপে উঠল। এতদিন ধরে তিনি কখনো ভাবেননি যে ব্রাহ্মসমাজের মাঝেও তাঁর পরিবারকে আপন করে না নেওয়ার মতো কোনো একজন ও থাকতে পারে। কিন্তু এখন তাঁর মনে এক প্রচন্ড ঝড় নেমে এল। বিষ্ণুপ্রিয়াকে তিনি কিছুই বললেন না। কিন্তু দেবেন্দ্রনাথের আপত্তির কারণ কি হতে পারে তাই জানবার জন্যে তিনি বন্ধু শিবনাথ শাস্ত্রীর কাছে গেলেন। শাস্ত্রী মহাশয় সব কথা শুনে খানিকক্ষণ চিন্তা করে উত্তর দিলেন—

"আমি দেখছি যে এর একটিই কারণ হতে পারে। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর বিধবা - বিবাহ কোনদিনই মনে - প্রাণে মেনে নিতে পারেন নি। আপনি জানেনই, তিনি দেখতে উদারপন্থী হলেও হিন্দুসমাজের কিছু কিছু রীতিনীতির প্রতি তাঁর প্রবল দুর্বলতা দিনের পর দিন স্পষ্ট হয়ে উঠছে। অবশ্য ঠাকুর পরিবারের নতুন প্রজন্মের ছেলেরা হয়তো তাঁর কথাগুলি সমর্থন নাও করতে পারে। কিন্তু তাঁর আদেশ অমান্য করার সাহস জোড়াসাঁকোতে কারও নেই।"

গুণাভিরাম মাথা নেড়ে মুখ নীচু করে রইলেন। শাস্ত্রী মহাশয় তাঁকে বড় বেশি চিন্তাক্লিষ্ট দেখে যেন আশ্বাস দিয়ে বললেন,

"বরুয়া, আপনি কেন এত চিন্তা করছেন? প্রথমত, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সভ্য হয়ে আপনি স্বর্ণর বিয়ের কথা কেন এত ভাবছেন? আপনি কেশবচন্দ্র সেনের সঙ্গে আমার মতভেদের কথা কি ভুলে গেলেন? দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর হয়তো নিজের পুত্রের জন্যে ন-দশ বছরের একটি বালিকাকে আনবেন। কিন্তু আমরা এতবছর বাল্য - বিবাহের বিরুদ্ধে যুদ্ধ

করে করে যেটুকু এগিয়ে যেতে পেরেছি তাকে ও যদি আমরা প্রত্যেকে নিজের নিজের ক্ষেত্রে গ্রহণ না করি, তাহলে ভারতবর্ষে সমাজ - বিপ্লব কখনই হ'বে না। স্বর্ণর জন্যে অনেক ভালো ছেলে পাওয়া যাবে। আপনি এখন নিশ্চিন্ত মনে নিজের কাজে ফিরে যান। আপনার মেয়ের কথা চিন্তা করার জন্যে তো আমি ও আছি, না কি?"

বন্ধুর কথাবার্তা শুনে গুণাভিরামের মনটা যেন হালকা হালকা লাগল। এখন তিনি বিষ্ণুপ্রিয়াকে আশ্বাস দেওয়ার মতো মনে জোর পেলেন। স্বর্ণর পড়াশুনো, বিবাহ ইত্যাদি বিষয় নিয়ে গুণাভিরাম আজকাল নিজের স্ত্রীর কাছে নিজেকে একটু একটু অপরাধী মনে করেন। একসময় তিনিই বিষ্ণুপ্রিয়াকে বলেছিলেন যে স্বর্ণকে তিনি উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত করে এক নতুন আদর্শ স্থাপন করবেন। সেইই যেন অসমের মধ্যে এন্ট্রান্স পাশ করা প্রথম মেয়ে বলে পরিগণিত হয়। যখন তাঁর বন্ধু মনমোহন ঘোষের সম্পর্কিত ভগিনী কাদম্বিনী আর দুর্গামোহন দাসের মেয়ে সরলা দ্বারকানাথ গাঙ্গুলীর তত্ত্বাবধানে পড়াশুনো করে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে এন্ট্রান্স পরীক্ষা দেবার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছিলেন, তখন গুণাভিরামের মন আনন্দে নেচে উঠেছিল। স্বর্ণ ও কাদম্বিনীর মতই কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বি.এ. পড়ে গ্রাজুয়েট হবে এই স্বপ্নও তিনি দেখতেন। কিন্তু কিছুদিন আগের ঘটে যাওয়া এই ঘটনা গুণাভিরামের ভাবধারা সম্পূর্ণ পাল্টে দিল। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের ঘোরতর আপত্তি সত্ত্বে ও দ্বারকানাথ গাঙ্গুলী নিজের ছাত্রী কাদম্বিনীকে বিয়ে করলেন। কাদম্বিনী তখন কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজের ছাত্রী। দ্বারকানাথ তাঁর থেকে বয়সে আঠারো বছরের বড়ো। কিন্তু বয়সের পার্থক্যের বাইরে তাঁদের দুজনের বৈবাহিক সম্পর্কে আপত্তি করার মতো কোন কারণ ব্রাহ্মসমাজের নেতাদের চোখে পড়েনি। দ্বারকানাথ ছিলেন বঙ্গদেশে স্ত্রীশিক্ষা প্রসারের ক্ষেত্রে সবথেকে বেশি অগ্রণী। আর কাদম্বিনী ছিলেন তাঁরই সার্থক সৃষ্টি। অথচ সৃষ্টিকর্তা আর সৃষ্টির মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্ক হওয়াটা ব্রাহ্মসমাজের অনেকেরই মনঃপুত হয়নি। গুণাভিরাম ও যেন এই ঘটনার পরে মনে একটু ঝাঁকুনি খেলেন। এই সময় দুর্গামোহন দাসসহ ব্রাহ্মসমাজের নতুন অনেক সভ্যের সঙ্গেই স্ত্রী শিক্ষা সম্পর্কে তাঁর মত অনেকক্ষেত্রে মেলেনি। পুরনো ব্রাহ্মদের মতোই তিনি ভেবেছিলেন যে একজন সুশিক্ষিত আধুনিক পুরুষের উপযুক্ত আর আর্দশ সঙ্গিনী হওয়ার জন্যে যতটা শিক্ষাদীক্ষার প্রয়োজন, একজন মেয়ের পক্ষে সেটুকুই যথেষ্ট। পড়াশুনো করে ছেলেদের মত চাকরি বাকরি করাটা স্ত্রী শিক্ষার লক্ষ্য কখনই হতে পারে না। কিন্তু শিবনাথ শাস্ত্রী, মনমোহন ঘোষ ইত্যাদি বন্ধুদের প্রভাবে পড়ে তিনি নিজের ধারনা পাল্টে ফেলেছিলেন। তখন তিনি স্বর্ণকে গ্রাজুয়েট করানোর কথাও ভেবেছিলেন। কিন্তু কাদম্বিনীর বিয়ের পরে যখন বেশ কয়েকজন সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রথম সারির লোক নিজের নিজের ঘরের মেয়েদের স্কুলের শিক্ষা শেষ না করিয়েই বিয়ে দিতে উদ্যত হলেন, তখন গুণাভিরামের বিশ্বাস দৃঢ় হল যে উপযুক্ত পাত্র পেলে স্বর্ণর বিয়ে দেওয়াই পিতা হিসেবে তাঁর কর্তব্য। মেয়ে হিসেবে স্বর্ণ যতটা শিক্ষা পেল সেটুকুই তার পক্ষে যথেষ্ট।

আট

লক্ষ্মী যখন জেলার মধ্যে প্রথম হয়ে এম. ই পরীক্ষাতে উত্তীর্ন হ'ল, তখন তার মনে আনন্দের চেয়ে বেদনাই হল বেশি। নিজের আত্মীয় স্বজনের হাজার তিরস্কারকে অগ্রাহ্য করে সে এম. ই স্কুলের ছেলেদের সঙ্গে সমানে পাল্লা দিয়ে পড়া-শুনো করল, কিন্তু ছেলেদের হাইস্কুলে নাম ভর্তি করানোর জন্যে সে কারো কাছ থেকেই অনুমতি পেল না। ন-গাঁওতে কখনো যে মেয়েদের হাইস্কুল হবে এরকম বিশ্বাস করারও কোনো কারণ ও সে দেখতে পেল না। যে জায়গায় ভালোঘরের মেয়েকে এল. পি. স্কুলেও পাঠায় না, সেই জায়গাতে হাইস্কুল হলে কে মেয়ে পাঠাবে? তবুও লক্ষ্মীর কল্পনা করতে ভালো লাগে যে সে একদিন এনট্রান্স পরীক্ষা পাশ করবে। এম. ই. পরীক্ষার রেজাল্ট বেরনোর সময় তাদের বাড়িতে এম. ই. স্কুলের শিক্ষকরা এসেছিলেন। স্কুলের নাম উজ্জ্বল করার জন্যে সবাই তাকে আশীর্বাদ করলেন। কিন্তু একমাত্র অজয় গাঙ্গুলী মাস্টারমশাইই তাকে বললেন, একদিন সে এন্ট্রান্স পরীক্ষা পাশ করে সকলের প্রশংসার পাত্রী হতে পারবে। লক্ষ্মী ম্লান হেসে জিজ্ঞেস করল —

"তা কি করে হ'বে, স্যার? আমি তো কলকাতায় যেতে পারব না।"

"ইচ্ছে থাকলে তোমার এই মহান্ উদ্দেশ্য সফল করতে ভগবানই পথ দেখিয়ে দেবেন। লক্ষ্মী কোন কাজই চেষ্টার অসাধ্য নয়।"

লক্ষ্মীর জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছে হয়েছিল, ভগবান পথ দেখিয়ে দিলেই যেন লোকে তাকে সেই পথে যেতে দেবে? কিন্তু মুখে মুখে জবাব দিলে গাঙ্গুলী স্যারের খারাপ লাগবে বলে সে চুপচাপ রইল। মাস্টারমশাইদের গেট পর্যন্ত এগিয়ে দেবার সময় অবশ্য অজয় গাঙ্গুলী স্যার একটি উপদেশ দিয়ে গে'লেন—

"যদি মা-বাবার অনুমতি পাও তা হলে মিশন স্কুলের মেয়েদের জিজ্ঞেস করতে পারো। এখন নগাঁওর মেয়েদের শিক্ষার জন্যে পাদরীদের কাছে যাওয়ার বাহিরে আর অন্য উপায় নেই।"

নগাঁও মিশনের মেয়েদের স্কুলটিতে হাইস্কুল পর্যায়ের শিক্ষা দানের ব্যাবস্থা নেই বলেই লক্ষ্মী জানত। তাই মিছিমিছি ঘরে অশান্তি বাড়ানোর জন্যে সে অজয় গাঙ্গুলীর পরামর্শের বিষয়ে কিছুই বলল না। কিন্তু কিছুদিন বাড়িতে থাকার পর তার মন হতাশায় ভরে গেল। স্কুলে যাওয়া বন্ধ হয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে তার কাছে বেঁচে থাকার উদ্দেশ্যই যেন নিরর্থক হয়ে গেল। মাঝে মাঝে চারুশীলা দিদিমণির বাড়িতে গেলে তার মনটা একটু ভালো লাগে। তিনি তাকে এখনো উৎসাহ দেন। নিজের কাছে থাকা দ্-একখানি বই বা পত্র-পত্রিকা তাকে পড়তেও দেন। একদিন তিনি কলিকাতা থেকে আনা একখানি নতুন বই তাকে পড়তে দিলেন— বঙ্কিমচন্দ্রের 'কপালকুন্ডলা' দেওয়ার সময় একটি সাবধান বাণীও তিনি শোনালেন—

"বইটি একটু অন্য ধরনের। তুমি একাই পড়বে। বাড়ীর অন্যরা দেখলে হয়ত তাদের খারাপ লাগতে পারে।"

লক্ষ্মী প্রথমে আশ্চর্য হল। চারুশীলা দিদিমণির দেওয়া বইটিতে কি এমন থাকতে পারে যে ঘরের মানুষ তা খারাপ বলবে? বইটি পড়ে শেষ করার পরে ধীরে ধীরে সে বুঝতে পেরেছিল দিদিমণির কথার তাৎপর্য। সত্যিসত্যিই এই ধরণের রোমাঞ্চকর বই তার কোনদিনই পড়া ছিল না। কিছু কিছু বর্ণনা পড়ে তার গোটা শরীরেই যেন শিহরণ জেগেছিল — এমন অপূর্ব কল্পনা! একই কথা সে বারবার পড়েছিল শেষদিকের কোন কোন পংক্তি তার প্রায় মুখস্থ হয়ে গেল। কপালকুন্ডলার শ্যামাসুন্দরীকে বলা একটি কথা তার বহুদিন ধরে মন তোলপাড় করল — 'যদি জানিতাম যে স্ত্রীলোকের বিবাহ দাসীত্ব, তবে কদাপি বিবাহ করিতাম না।' হঠাৎ লক্ষ্মীর মনটাও বিদ্রোহী হয়ে উঠল। তার ও ইচ্ছে হল নারীজাতির প্রতি সমাজের করা অন্যায়ের বিরুদ্ধে যে কোনভাবে মাথাতুলে দাঁড়াবার। স্কুলে যাওয়া বন্ধ হওয়ার পর লক্ষ্মী অনুভব করল যে সে ধীরে ধীরে আবারও বিধবাদের সেই গতানুগতিক জীবনটিতে ফিরে যাচ্ছে। এর থেকে পরিত্রান পাওয়ার একমাত্র উপায় ছিল বাড়ির বাইরে একটি কর্মক্ষেত্র যোগাড় করে নেওয়া। একদিন চারুশীলা দিদিমণির বাড়িতে যাওয়ার রাস্তায় তারাকে সঙ্গে পেয়ে সে নিজের মনের কথা তাকে বল'ল আর মিশনের মেয়েদের স্কুলটিতে তার জন্যে একটি চাকরির ব্যবস্থা করতে তাকে অনুরোধ করল।

তারা মেমেদের সামনে লক্ষ্মীর দুঃখের জীবন সম্পর্কে বলে তার উচ্চশিক্ষার প্রতি আগ্রহের কথাও বলল। কথাগুলো শুনে মেমেদের মনে লক্ষ্মীর প্রতি এত দয়া হল যে তাঁরা তার সঙ্গে পরিচিত হবার আগ্রহ প্রকাশ করলেন। নিজের মনের ভাব গোপন না করে আমেরিকা থেকে আসা মিসেস মূর নামের মেমটি বলে উঠলেন —

"আমাদের এরকম মেয়েরই প্রয়োজন। তাকে ভালো করে বোঝাতে পারলেই যিশুর দেখিয়ে দেওয়া পবিত্র পথে একদিন না একদিন সে আসবেই।"

মিসেস মূর ভালোভেবেই কথাটি বলেছিলেন। তিনি নতুন এসেছেন। ফলে অসমীয়া মানুষের মধ্যে ধর্মপ্রচারের কাজ তাড়াতাড়ি করবার জন্যে তাঁর ভীষণ উদ্যম। কিন্তু তারার মনটা হঠাৎই দমে গেল। লক্ষ্মীর বিপদে সাহায্য করবার তার যে আগ্রহ হয়েছিল, মেমসাহেবের মুখে ধর্মান্তরের কথা শোনার পর তার সেই আগ্রহ লুপ্ত হয়ে গে'ল। কিছুদিন ধরে তারার মনে এরকম চিন্তার প্রায়ই উদয় হচ্ছিল — মানুষ মানুষকে ভেতরের মতলব ছাড়া সাহায্য করতে পারে না কেন? শিক্ষা সমাজ - সেবা ইত্যাদির সুযোগ নিয়ে কেন ধর্মপ্রচার করতে হবে? খোলাখুলিভাবে মানুষের মধ্যে গিয়ে ধর্মের কথা বলতে পারে না? — বালিরামে হোজামিকির ছে'লে মেয়েদের লিখতে পড়তে এবং শেখাতে তারা তাদের শুধুমাত্র মানুষ বলেই ভাবত, ভালোবাসত। শিক্ষাকে বঁড়শির টোপ বলে কখনো সে ভাবেনি। পাদরী মেম - সাহেবদের সঙ্গে এই একটা বিষয়ে তার মন মেলেনি। তারা

সাতসাগর পেরিয়ে অনেক ত্যাগ স্বীকার করে পর্বত সমতলের দুর্গম স্থানগুলিতে শিক্ষার আলোক বিতরণ করতে এসেছিল, যদিও তারার ধারণা হয়েছিল যে তাঁরা যেন আলোর প্রত্যেকটি কণিকার উচিত মূল্যবিচার করত। সেই মূল্যের উদ্দেশ্য হয়ত মহানই ছিল। কিন্তু মূল্য বিচার করতে গেলে মনে হয় যেন সেবা আর নিঃস্বার্থ হয়ে নেই। তারার মনটা এলোমেলো হয়ে গেল। অথচ এইসব কথা কারো সঙ্গে আলোচনা করার ও উপায় ছিল না।

মেমেরা তার সঙ্গে পরিচিত হতে চায় লক্ষ্মীকে তারা একথা বলল। কিন্তু নিজের মনের আশঙ্কার কথাগুলি জানতে দিল না। একদিন চুপিচুপি তারা লক্ষ্মীকে মিশনে নিয়ে গিয়ে সবার সঙ্গে চেনা-পরিচয় করিয়ে দিল। লক্ষ্মীর কথা-বার্তা, চেহারা-টেহারা সকলকে মুগ্ধ করল। অসমীয়া হিন্দুদের মাঝে যে এরকম একজন মেয়ে থাকতে পারে সে কথা যেন তাঁদের বিশ্বাসই হচ্ছিল না। লক্ষ্মীর কথা-বার্তার ভেতরে তাঁরা যেন সামান্য বিদ্রোহের সুর শুনতে পেলেন, তার থেকে তাঁদের ধারণা হল যে চেষ্টা করলেই তাঁরা তাকে তাঁদের উদ্দিষ্ট পথে আনতে পারবেন। লক্ষ্মীকে সেইদিনই মিশনের মেয়েদের স্কুলে মাসে দশটাকা মাইনের চাকরিতে নিযুক্ত করা হল। সেই সঙ্গে পাদরীরা এই আশ্বাস ও দিল যে তাঁদের তত্ত্বাবধানে লক্ষ্মী পড়াশুনো করতে পারবে আর পরে সরকারের বিশেষ অনুমতি নিয়ে হয়ত তাকে এন্ট্রান্স পরীক্ষাতে ও বসতে দেওয়া যাবে। লক্ষ্মী যেন হাতে স্বর্গ পেল। কিছু না ভেবেই সে তৎক্ষণাৎ প্রস্তাবটিতে রাজী হয়ে গে'ল।

বাড়িতে ফিরে আসবার সময় তারা একটু চিন্তিতভাবে তাকে জিজ্ঞেস করল

"তুমি কাজটা করবে বলে জানানোর আগে একবার মা - বাবাকে জিজ্ঞেস করাটা উচিত ছিল নাকি?"

"কাজটা নেবার আগে জিজ্ঞেস করতে হ'লে কখনো যে অনুমতি দিতেন না। কিন্তু এখন গিয়ে সবাইকে সব কথা বুঝিয়ে বললে হয়তো মা-বাবা আমার কথা শুনবেন। দশ টাকা মাইনের শিক্ষিকার চাকরি তো একটা হেলাফেলার কথা নয়।

লক্ষ্মী ঠিকই অনুমান করেছিল। প্রথমে সে গিয়ে ঘরে কথাটা বলতে সবাই হতভম্ব হয়ে গেল। মিশন স্কুলের শিক্ষিকা আর মাসে দশ টাকা করে মাইনে। একজন সাধারণ মেয়ে এতগুলো টাকা পাবে — তাও নিজের শিক্ষার জোরে। কেউই যেন কথাটা ভাবতে পারেনি। মেমদের সঙ্গে সমান তাল মিলিয়ে মেয়ে পড়ানোর কাজটা কম কথা নয়। পঞ্চানন শর্মার মনটা ভেতরে-ভেতরে গৌরবে ভরে উঠছিল। বাইরে তিনি একটু লোক দেখানো "এঃ - আঃ" করলেও একবারও আপত্তি করলেন না। বাড়ির অন্যান্যরা প্রকাশ্যে কিছুই বলতে সাহস পেল না, কারণ তাদের সকলের চোখেই লক্ষ্মী তখন এক অন্য জগতের বাসিন্দা।

লক্ষ্মী প্রথমদিন কাজে যাওয়ার সময় তারাও সঙ্গে গেল। তার মুখে চিন্তিত ছাপ। প্রথমে এটা-ওটা উপদেশ দেওয়ার পরে তারা একটু ইতঃস্তত করে বলল —

"মেমসাহেবরা তোমার সঙ্গে ধর্মের কথাও বলবেন। তোমার কি সেইসব ভালো লাগবে?"

"ধর্মের কথা শুনতে আমার একটু ও খারাপ লাগবে না তারা, নিজের ধর্মেরই হোক বা পরের ধর্মেরই হোক্। কিন্তু কোন ব্যাপারে যদি আমাকে কেউ জোর করতে চায়, তাহলে আমার খুব খারাপ লাগে। ছোটবেলা থেকে ধর্ম-কর্ম, ব্রত - উপবাসের মধ্যে আমি বড়সড় হয়েছি। কিন্তু সবসময়েই সেসব অন্যরা করতে বলত বলেই আমি করে গেছি। আমার নিজের কি বিশ্বাস তা আমিই বলতে পারবোনা। আসলে জানো, আমি ভাবি যে মানুষের সমাজে থাকতে হলে মানুষের সাহায্য নিতে হবে — এই যেমন এখন তুমি আমায় সাহায্য করছ। এইসব ছোটখাট কথার জন্যে ভগবানকে ডাকা উচিত নয়। তাঁর কাজ অনেক বড়ো।" — শেষের কথাগুলি লক্ষ্মী হেসে হেসে বলল। কিন্তু তারা বুঝতে পারল যে লক্ষ্মীর কথার মাঝে একধরণের দৃঢ়তা প্রকাশ পাচ্ছে। জীবনের অভিজ্ঞতা তাকে বয়সের চেয়ে অনেক বেশি পরিপক্ক করে তুলেছে। তাই তার জন্যে অযথা চিন্তা করবার প্রয়োজন নেই।

লক্ষ্মীর বিষয়ে তারা নিশ্চিন্ত হল যদিও নিজের কিছু চিন্তা তাকে হতাশ করল। বেশ কিছুদিন থেকে তার মা অসুস্থ ছিল। কিন্তু মিশন থেকে যতক্ষণ না আর একজনকে পাঠানো হচ্ছিল ততক্ষণ সে বালিরামের স্কুল ছেড়ে যেতে পারছিল না। শেষে অবশ্য নগাঁও মিশন স্কুলের অন্য একজন খ্রীস্টান মেয়ে সেখানে যেতে রাজি হলে তারা তার হাতে স্কুলের দায়িত্ব সঁপে দিয়ে ঘরে এল। মায়ের অবস্থা দেখে তার নিজের ওপর ধিক্কার জন্মাল। এই মহিলা তার জন্যে অশেষ কষ্ট স্বীকার করে জীবনের বেশির ভাগ সময় একলাই কাটালেন। এখন অসুস্থ অবস্থাতেও নিজের কাজগুলি তাঁকে নিজে করতে দেখে তারার মনটা অনুশোচনায় ভরে গেল। সে এতদিন অন্যের পরিচর্যা করল। নিজের মায়ের প্রতি তার যে একটা দায়িত্ব আছে, সেকথা সে ভাববার সময় পেলো না। সেবার ছুটিতে বাড়ি এসে তারা প্রতিজ্ঞা করল যে কোন পরিস্থিতিতেই সে আর মাকে একলা রেখে যাবেনা। গোলাপী অবশ্য ক্ষীণ প্রতিবাদ করেছিল যে মিশনের কাজ বাকি রেখে তার পরিচর্যা করতে হবে না। কিন্তু তারা কোন কথাই শুনল না। নগাঁও এসে পৌঁছোনোর পরদিন সে মিশনে গিয়ে মেমসাহেবদের নিজের মনের কথা জানাল। মিসেস্ মূর আর মিস কীলার তারার সমস্যাগুলি মন দিয়ে শুনলেন। তাঁরা দুজনে উপলব্ধি করলেন যে হয়তো অনেকদিন একলা একলা সুদূর গ্রামের অভ্যন্তরে থাকাটা তারার পক্ষে ভালো হয়নি। তাঁরা কিছুদিন আগে থেকেই লক্ষ্য করছেন, তারার কথা-বার্তায় যেন আগের সেই অকুণ্ঠ বিশ্বাসের সুর ক্রমশ ক্ষীণ হয়ে আসছে। সে মাঝেমাঝেই এরকম কিছু প্রশ্ন জিজ্ঞেস করে যেগুলোর মধ্যে দিয়ে তার মনের ভিতর প্রোথিত হওয়া সংশয়ই ফুটে ওঠে। তাই তাকে কিছুদিন কাছাকাছি রেখে তার মনে বিশ্বাস ফিরিয়ে আনার প্রয়োজনীয়তার কথা উপলব্ধি করলেন। সেইজন্যেই তারার কথায় তাঁরা আপত্তি করলেন না। নগাঁওতে

থেকে মিশনের কাজ-কর্মে একান্তমনে লেগে থাকবার জন্যে তাঁরা তারাকে উপদেশ দিলেন। তার কথা এত সহজে মেনে নেওয়ার জন্যে তারা একটুও আশ্চর্য না হয়ে পারল না। তার এবং তার মার প্রতি পাদরীদের থাকা স্নেহই এর একমাত্র কারণ বলে সে নিজের মনে বিশ্বাস করার চেষ্টা করল।

নগাঁও মিশনের পুরনো পরিচিত পরিবেশের মাঝখানে তারা আবার কাজ আরম্ভ করল। সপ্তাহে তিনদিন ভোরবেলা মেয়েদের স্কুলে পড়াতে হয়। রোববার ভোরবেলা কখনো বা ছোট - ছোট ছেলেমেয়েদের গীর্জার স্কুলটিতে ধর্মের কথা শেখাতে হয়। মিশনের কাজ সে এটুকুই মাত্র হাতে নিয়েছিল। বাড়িতে থাকার সময়ে অবশ্য তারা অনেক কাজ করত। ঘরোয়া কাজ - কর্ম, মায়ের সেবা করা, এসবের বাইরেও সে সময় পেলেই গরীব দুঃখী ছেলেমেয়েদের জন্যে কাপড় সেলাই করা, উলের সোয়েটার বোনা ইত্যাদি কিছু কিছু কাজ সবসময়ই সে স্বেচ্ছায় করত। অবসর মুহূর্তে মায়ের কাছে বসে কথা বলবার সময় তার অক্লান্ত হাত-দুটি অনবরত কাজ করতে থাকে। কখনো বা সে নিজের মনে অসমীয়া ধর্মসংগীত গায়। তার সুললিত কণ্ঠস্বর শুনে পথের পথচারীর পথচলাও মন্থর হয়ে যায়।

নয়

বি.এ. পরীক্ষা দিয়ে ধর্মকান্তের তক্ষুণি বাড়ি যেতে ইচ্ছে করল না। কলকাতাতে তখন জাতীয়তাবাদের হাওয়া এক নতুন দিকে বইতে শুরু করেছে। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের জন্মলগ্ন আসন্ন প্রায়। জাতীয়তাবাদী নেতাদের বাড়িতে রোজই বৈঠক বসছে। ভারতীয়দের ইচ্ছা - অনিচ্ছা সম্পর্কে সরকারকে জানানোর জন্যে নিত্য নিত্য খসড়া করা চলছে। ধর্মকান্ত এরকম এক পরিবেশ ছেড়ে সরে যেতে চায়নি। তার ইচ্ছা ছিল বোম্বাইতে প্রস্তাবিত প্রথম কংগ্রেস অধিবেশনে সে উপস্থিত থাকবে। শশীপদ ব্যানার্জীর ''ভারত - শ্রমজীবী''র অফিসে সে বেশ কয়েকজন প্রথম সারীর জাতীয়তাবাদী নেতার সঙ্গে কথাবার্তা বলেছে। তর্ক ও করেছে। সে মনে করে যে কংগ্রেসের লক্ষ্য হওয়া উচিত পূর্ণ স্বাধীনতা। ১৮৫৭ সালে ভারতীয়রা অস্ত্র - শস্ত্রের সাহায্যে যে কাজে কৃতকার্যতা লাভ করতে পারল না, এখন কংগ্রেসকে সুপরিকল্পিতভাবে এগিয়ে গিয়ে সেই কাজসমাপ্ত করতে হবে। কিন্তু সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী, আনন্দমোহন বসু ইত্যাদি নেতাদের বক্তৃতাতে ধর্মকান্ত সেই লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার কোনো আশ্বাসই শুনতে পেল না। তাঁরা কংগ্রেসকে আগের Indian Association (ইন্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশান) এর মতো একটা প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তুলতে চান যার উদ্দেশ্য হবে ইংরেজ সরকারের কাছে আবেদন নিবেদনের মাধ্যমে ভারতীয়দের জন্যে যতখানি সম্ভব সুযোগ সুবিধে আদায় করা। কিন্তু ইংরেজ শাসন থেকে নিজেকে মুক্ত করার কথা তাঁরা কেউই বলেননি।

একদিন প্রেসিডেন্সী কলেজের কাছে একটি চায়ের দোকানে দুদল ছাত্রের মাঝে একটি ছোট-খাট তর্ক যুদ্ধ হয়ে গেল। তর্কটির শুরু সেইদিন কলেজ স্কোয়ারের এক সভায় সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জীর দেওয়া এক গরম বক্তৃতাকে কেন্দ্র করে। এক পক্ষের নেতৃত্ব দিচ্ছিল ধর্মকান্ত আর অন্যপক্ষে উমাচরণ মুখার্জী নামে ধর্মকান্তের এক সহপাঠী। উমাচরণ সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জীর সমর্থনে বলল যে সমগ্র ভারতের শিক্ষিত লোকের একসঙ্গে বেশকিছু রাজনৈতিক সংস্কারের জন্যে যুদ্ধ করাটাই দেশের প্রয়োজন। উমাচরণ সেই বছর প্রথম বিভাগে প্রথম স্থান পেয়ে বি.এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে বিলাত যাওয়ার যোগাড়যন্ত্র করছিল। তার জীবনের লক্ষ্য ছিল আই.সি.এস. পরীক্ষা পাশ করে একজন প্রথমশ্রেণীর সরকারী চাকুরিয়া হওয়া। তাই যখন সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী আই. সি. এস. পাশ করে ও হেলাভরে সেই সম্মানকে তুচ্ছ করাতে তিনি উমাচরণদের মতো ছাত্রদের কাছে এক অদ্ভুত ধরনের আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব হয়ে পড়েছিলেন। সেই সময়ে শিক্ষিত ভারতীয়দের কাছে আই.সি.এস. প্রত্যাখান করাটাই যেন জীবনের চূড়ান্ত ত্যাগ হয়ে দাঁড়াল।

ধর্মকান্ত যখন তেজস্বীভাষা আর অকাট্য যুক্তির সঙ্গে সুরেন্দ্রনাথের সেইদিনের সভাতে বলা কথাগুলির প্রতিবাদ করতে শুরু করল তখন প্রথমে একদলছাত্র তার বাগ্মিতার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে হাত-তালি দিয়ে তাকে সমর্থন করেছিল। কিন্তু যখন সে প্রকাশ্যে ইংরেজ সরকারকে তাড়িয়ে স্বাধীন ভারত গঠন করার কথা বলতে শুরু করল তখন দু একজন করে তার সমর্থকের সংখ্যা কমতে লাগল। কেউই নিজের ভবিষ্যৎ বিপন্ন করে আগুনে ঝাঁপ দিতে প্রস্তুত ছিল না। দু একজন মনে মনে ধর্মকান্তের কথাগুলির সত্যতা মেনে নিলেও ইংরেজ সরকারের গুপ্তচরের ভয়ে তারা উমাচরণের পক্ষ নিতে বাধ্য হল।

সেইদিন মেসে একা একা বসে ধর্মকান্ত অনেকক্ষণ চিন্তা করল। কলকাতার শিক্ষিত সমাজের কাছে সে অনেক কথা শিখল। সেই বিচিত্র মহানগরীতে না এলে সে হয়তো কখনো উপলব্ধি করতে পারতো না যে হাজার ভিন্নতার মাঝে ও ভারতবর্ষ একটি অদ্ভুত মিলনের দেশ। কলকাতায় সে যতজন শিক্ষিতলোকের সঙ্গে তর্ক করল, মতান্তর ঘটল আর অন্তরঙ্গ বন্ধুত্ব ও করল, প্রত্যেকের মধ্যেই সে যেন কোন না কোনভাবে নিজেকে খুঁজে পেল। তার মনের মধ্যে এলোমেলো হয়ে থাকা চিন্তাগুলি এই শহরেই যেন পথের হদিশ খুঁজে পেল। কিন্তু সেই পথ ধরে সে এখন কোন্‌দিকে যাবে সেইটেই ধর্মকান্তের কাছে বড় প্রশ্ন হয়ে দেখা দিয়েছে। সে ইচ্ছে করলে কলকাতাতেই গোটা জীবনটা হয়ত কাটিয়ে দিতে পারত। শশিপদ ব্যানার্জী ও আর দু একজন তাকে থেকে যাওয়ার জন্যে অনুরোধ করেছিলেন। কিন্তু ধর্মকান্ত নিজেকে প্রশ্ন করল যে তার নিজের মানসিক তৃপ্তির জন্যে কলকাতার পরিবেশের যদিও বড়ো বেশি প্রয়োজন তবুও কলকাতার কাছে তার প্রয়োজন ততটা আছে কি? কলকাতায় সমাজ সংস্কারক, ধর্মীয় সংস্কারক, রাজনৈতিক নেতা কোন কিছুরই অভাব নেই। কিন্তু অসমে এখন নতুন ভাবধারার বীজ বপন করার দরকার। কলেজ স্কোয়ারের চায়ের দোকানের তর্কযুদ্ধের একটি বিশেষ আমেজ আছে।

কিন্তু অসমে ফিরে গিয়ে লোকজনদের আসল যুদ্ধের জন্যে প্রস্তুত করানোটা তার নৈতিক দায়িত্ব বলে ধর্মকান্ত বিবেচনা করল। সেইদিন চায়ের দোকানের আড্ডার পরে সে মনে মনে সংকল্প নি'ল যে যত শিগগির সম্ভব সে অসমে ফিরে গিয়ে এক নতুন কর্মক্ষেত্র গড়ে তুলবে।

ধর্মকান্ত প্রথমে ভেবেছিল যে সোজা গিয়েই তপত্জুরি বাগানের ফলিক দেবনাথ বরুয়ার সঙ্গে দেখা করবে। গুণাভিরাম বরুয়া নগাঁওর থেকে তাকে চিঠি দিয়েছিলেন যে দেবনাথ বরুয়া তাকে বাগানে একটি কাজ দেবার ইচ্ছে প্রকাশ করেছেন। তাই কলকাতা থেকে ফিরে এসে সে যেন তাঁর কাছে যায়। ধর্মকান্ত সেইভেবেই জাহাজের টিকিট কাটলো গুয়াহাটি পর্যন্ত। কিন্তু যাত্রার আগ মুহূর্তে তার একবার শিবসাগর যাওয়ার ইচ্ছে হল। মামা বাগানের কাজ থেকে অবসর নিয়ে শিবসাগরের বাসিন্দা হবার পর থেকে তার সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ হয়নি। মাকেও সে অনেকদিন দেখেনি। তাই সে ভেবেচিন্তে টিকিটটা দিখৌমুখ পর্যন্ত করে নিল।

ধর্মকান্তের ধারণা ছিল যে নতুন চিন্তা চর্চার ক্ষেত্রে অসম অনেকখানি পিছিয়ে আছে। কিন্তু শিবসাগর পর্যন্ত গিয়ে সে অনুভব করল যে পশ্চিমদিক থেকে আসা নতুন হাওয়া এই শহরটিকে ও ছুঁয়ে গেছে। একদিন সে শিবসাগর হাইস্কুলের তার পুরনো সহপাঠী নকুল গগৈয়ের ঘরে বেড়াতে গিয়ে সত্যিই বিস্মিত হল। তাঁর ঘরে একটি সভা বসেছিল যার আলোচনার বিষয়বস্তু ছিল সরকারের নতুন করে বসানো ট্যাক্সের বিরুদ্ধে জনগণকে সজাগ করে তোলা। নকুল গগৈ সেই সময়ে শিবসাগর হাইস্কুলে শিক্ষকতা করত। বাকিরাও শিক্ষিত যুবক। কেউবা এন্ট্রান্স পরীক্ষা দেবার জন্যে প্রস্তুত হয়েছে, কেউ বা আর্থিক অভাবের জন্যে হাইস্কুলের পড়া মাঝপথে ছেড়ে দিয়ে ছোট - খাট কাজে ঢুকেছে। নকুল গগৈ খুব আগ্রহে ধর্মকান্তকে ডেকে নিয়ে সকলের সঙ্গে চেনা - পরিচয় করিয়ে দিয়ে বলল — "আমি এবার জনগণের কাজের জন্যে বেরিয়েছি। জোরহাটের জগন্নাথ বরুয়ার আয়োজিত সার্বজনীন সভার মতো একটি সভার আয়োজন আমরা এখানে করার চেষ্টা করছি। বলুনতো বরুয়া, কলকাতার দিকে এই ধরণের সভা কিভাবে হয়?"

ধর্মকান্ত এর আগে সার্বজনীন সভার কথা শোনেনি। সে নিজের অজ্ঞতায় নিজে লজ্জা পেল। কিন্তু খবরটা পেয়ে তার মন আনন্দে ভরে গেল। গগৈ এর নিকট সে সভার কাজ - কর্মের বিষয়ে খবর নিল। চোখে পড়ার মতো কোনো কাজ যদিও হয়নি, তবুও অন্তত রাজনৈতিক চিন্তাধারার বীজ অঙ্কুরিত হয়েছিল। ধর্মকান্ত সেইদিন অনেক বেলা পর্যন্ত গগৈয়ের বাড়িতে সমবেত সকলের সঙ্গে কলকাতার সভা সমিতি গুলির সম্পর্কে কথা বলল। আগামী দিনের কংগ্রেস অধিবেশনের কথাও বিস্তারিত ভাবে বলল। প্রত্যেকে আগ্রহ সহকারে অনেক প্রশ্ন করল — ইন্ডিয়ান লীগ, কংগ্রেস — এদের নীতির মাঝে পার্থক্য কি? কোনটির পথ ঠিক কোনটির ভুল? — ধর্মকান্ত সর্ববিষয়ে নিজের মতামত স্পষ্টভাবে প্রকাশ করল। —

"ইংরেজ সরকারের কাছে আবেদন-নিবেদন করার দিন শেষ হয়ে গেছে। এখন সবাই একসঙ্গে মিলে দলবদ্ধ ভাবে বেরোতে হবে নিজেদের অধিকার ইংরেজদের হাত থেকে ছিনিয়ে নেবার জন্যে, কংগ্রেস যদি এই নীতি মেনে নেয় তাহলে জনগণের সমর্থন পাবে।"

"আমি ও তাই ভাবি। ফুলগুড়ির যুদ্ধের কথা মনে আছে নিশ্চয়? সে রকম সাহস কলকাতার লোকে দেখাতে পারবে?" একজন যুবক সগর্বে জিজ্ঞেস ক'রল।

ধর্মকান্ত শিবসাগরে প্রায় একসপ্তাহ থাকল। সেই কয়েকটি দিনে সে অনেক আগের স্কুলের বন্ধু এবং শিক্ষকদের সঙ্গে দেখা করে কথা-বার্তা বলল। কলকাতায় সম্মানের সঙ্গে বি-এ পাশ করে এসেছে শুনে সকলেরই তার সম্পর্কে কৌতুহল বেড়ে গেল। গ্রাজুয়েট হয়েও তার কোনো গর্ব-অহংকার হয়নি, আগের মতই সকলের সঙ্গে সমভাবে কথা বলছে, এই ব্যাপারটিতে সকলেই আশ্চর্য হল। তার কথাবার্তা সবাই মন দিয়ে শুনল। ধর্মকান্ত আধুনিক রাজনৈতিক দর্শন, বঙ্গের নবজাগরণ এবং জাতীয় উত্থানের বিষয়ে অনেক নতুন নতুন কথা বলল। তার কথাগুলি যেন সকলের মনেই এক নতুন আশা এনে দিল। যেন কিছু একটা পরিবর্তন হওয়ার সম্ভাবনা আছে — প্রত্যেকের এরকম ধারনা হল।

ধর্মকান্ত বাগানের চাকরীতে ঢুকবে শুনে মামা মনে মনে খুব কষ্ট পেলেন। এত কষ্ট করে কলকাতায় পড়া-শুনো করে হাকিম না হয়ে সে বাগানের কেরানী হতে চায় দেখে তিনি অবাক হলেন। ধর্মকান্ত মামার সঙ্গে তর্ক করার চেষ্টা করল না। ছোটবেলা থেকেই সে মামার স্নেহ ভালোবাসা পেয়ে এসেছে। এখন তার মনের কথা বুঝতে না পারলেও তাঁর প্রতি তার শ্রদ্ধাভক্তি অটুটই আছে। ধর্মকান্ত মামাকে আশ্বাস দিয়ে বল'লঃ

"আমি ইংরেজ সরকারের অধীনে চাকরী করতে চাইনা বলেই প্রথমে অসমীয়া মালিকের চা বাগানের চাকরীতে ঢুকে পড়তে চাই। আমার বিশ্বাস যে একদিন আমার কাজ - কর্মের জন্যে আপনারা গর্ব করতে পারবেন। আমি অনেক বড়ো বড়ো কাজ করব বলে ভেবে রেখেছি।"

মা ধর্মকান্তের মনের কথা বুঝতে পেরে তাকে শুধু প্রাণভরা আর্শীবাদ দিলেন। তিনি কোনদিন তার কাছে কিছুই আশা করেননি। কিন্তু তাঁর গভীর বিশ্বাস ছিল যে তার মনে দুঃখ দেবার মতো কোনো কাজ ধর্মকান্ত কখনোই করবে না।

তপত্জুরি বাগানটি গুয়াহাটি থেকে কয়েক মাইল দূরে - পূর্বদিকে । সাহেবদের চা-বাগানগুলোর তুলনায় অনেক ছোট। কিন্তু অসমীয়া মালিকের উদ্যোগে যথেষ্ট পরিমানে চায়ের পাতা উৎপন্ন হতে শুরু করেছিল। বাইরে থেকে আনা "চুক্তিবদ্ধ" কুলি কাজে না লাগিয়ে মাত্র স্থানীয় বড়ো-কাছারী শ্রমিকদের সাহায্যেই চায়ের উৎপাদনে সফল হয়েছিলেন। যদিও বাগানে কলের মেশিন ছিল না। গুয়াহাটীর 'বরুয়া-ফুকন ব্রাদারর্স্' কাঁচা চায়ের পাতা কলকাতায় চালান দেয়। 'বরুয়া-ফুকন ব্রাদারর্স্' এর সঙ্গে ব্যবসায়িক লেনদেনের

হিসেবপত্র রাখার কাজে বাগানের মালিক ধর্মকান্তকে নিয়োগ করলেন। ধর্মকান্তের কাজটা খারাপ লাগল না। চাকরীসূত্রে গুয়াহাটীতে প্রায়ই আসা যাওয়া করবার জন্যে সে রাজনৈতিক বিষয়ে আলোচনা করার লোকজনদের সঙ্গে দেখা করার ও সুযোগ পেল। বাগানের দিনগুলিতে ও সে শুধুমাত্র ফাইল ঘেঁটেই সময় কাটাল না। সময় পেলেই কাছাকাছির গ্রামগুলিতে গিয়ে কারো উঠোনে বসে বসে দেশ-বিদেশের কথা বলত আর তার সঙ্গে ইংরেজ শাসনের ফলে আমাদের দেশের লোকের কি দুরবস্থা হয়েছে সেই বিষয়েও দু-একটি কথা বলত। গ্রামের লোকেরা তার কথা শুনে নানারকম প্রশ্ন করত আর ধর্মকান্তের উত্তর শুনে সেইসব দীনদরিদ্র লোকদের মন বিস্ময়ে ভরে যেত। তাদের গ্রামের চারিদিকের সীমানার বাইরে ও যে একটি বৃহৎ জগৎ আছে এবং সেখানে ঘটে যাওয়া ঘটনাগুলি তাদের অজান্তে তাঁদের গ্রামের উপরও প্রভাব ফেলছে, সেকথা যেন তাঁরা ধর্মকান্তের কথা থেকেই প্রথম জানতে পারলেন।

ধর্মকান্ত চিঠি পত্রের মাধ্যমে গুণাভিরাম বরুয়ার সঙ্গে যোগাযোগ রেখেছিল। তাঁর চিঠি থেকেই সে জানতে পারল যে অসমীয়া পত্রিকা প্রকাশের কাজ দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলেছে। প্রথম সংখ্যাটি মাঘমাসে বেরনোর কথা। পত্রিকাটির নাম রাখা হয়েছে 'আসাম বন্ধু'। ছাপাখানার থেকে আসার পরে বিতরণ ইত্যাদিতে সাহায্য করার জন্যে গুণাভিরাম ধর্মকান্তকে নগাঁওতে ডেকে পাঠালেন। ধর্মকান্ত চিঠি পেয়েই বাগানের মালিক বরুয়াকে কথাটা জানিয়ে কয়েকদিনের ছুটি চাইল। বরুয়া আপত্তি করলেন না। হাকিম গুণাভিরাম তাঁর বন্ধু। ধর্মকান্তের ইচ্ছেতে বাধা দেওয়া মানে বন্ধুর ইচ্ছে উপেক্ষা করা এবং গুণাভিরামের মতো প্রতিপত্তিশালী বন্ধুকে উপেক্ষা করার প্রশ্নই ওঠে না। ফলে মাঘমাসে বিহুর সময় একসপ্তাহের ছুটি নিয়ে ধর্মকান্তের নগাঁও যাওয়া ঠিক হল।

দশ

ধর্মকান্ত যখন নগাঁও গিয়ে পৌঁছোল তখন 'বিল্বকুটীরে' উৎসবমুখর পরিবেশ। কলিকাতা থেকে আসা 'আসাম বন্ধু' দেখবার জন্যে নগাঁওর শিক্ষিত মানুষের মধ্যে তাড়াহুড়ো পড়ে গেছে। সত্যনাথ বরা, রত্নকান্ত মহন্ত, হেমচন্দ্র গোস্বামী ইত্যাদি যুবকদের মধ্যে উৎসাহ সবথেকে বেশি। প্রত্যেকে একটি করে কপি নিজের জন্যে কিনেছে, আর ও কয়েকটি কপি কিনে নিয়ে গেছে নিজের পরিচিত লোকদের নিকট বেচবার জন্যে। পরের সংখ্যাটির জন্যে প্রত্যেকে একটা করে প্রবন্ধ বা কবিতা লিখবে বলে প্রায় সব যুবকই দায়িত্ব নিয়েছে। বয়স্কদের মধ্যেও উদ্যমের অভাব নেই। গুরুনাথ দত্ত, পদ্মহাস গোস্বামী, পঞ্চানন শর্মা প্রত্যেকেই গুণাভিরাম বরুয়ার প্রচেষ্টার প্রশংসা করছেন এবং নিজেদের পরামর্শও দিচ্ছেন।

ধর্মকান্ত গিয়ে পৌঁছোবার সঙ্গে সঙ্গে গুণাভিরাম এরকম ভাব দেখালেন যেন 'আসাম

বন্ধু'র আসল জন্মদাতা এসে উপস্থিত হ'য়েছে। তাঁর ব্যবহারে একটু অপ্রস্তুত হয়ে ধর্মকান্ত একান্তমনে পত্রিকাটি দেখতে শুরু করল।

"কিরকম দেখলে?" — গুণাভিরাম যে এতক্ষণ তার প্রতিক্রিয়ার জন্যেই পথের দিকে চেয়েছিলেন সে কথা ধর্মকান্ত খেয়ালই করেনি। সে মাথা তুলে দেখল যে শুধু গুণাভিরামই নন, স্বর্ণলতা এবং বিষ্ণুপ্রিয়াও তার উত্তরের জন্যে অপেক্ষা করছেন। ধর্মকান্ত একটু অপ্রস্তুত হয়ে পড়ল। সে এক কথায় 'খুব ভালো হয়েছে' বলে ও বলতে পারল না। 'আসাম বন্ধু'র মূল উদ্দেশ্য সম্পর্কে লিখিত যে বিবরণ তার সঙ্গে তার নিজের মতের অনেক অমিল আছে। গুণাভিরাম লিখেছেন যে পত্রিকাটিতে কেবল জ্ঞানবিজ্ঞানের চর্চাই করা হবে। — "শাসন, বিচার ইত্যাদি রাজনৈতিক বিষয়গুলিতে হস্তক্ষেপ করতে চাইনা।" কিন্তু ধর্মকান্তের বিশ্বাস যে অজ্ঞানতা, অন্ধবিশ্বাস, অত্যাচার, অবিচার — এইসবের তীক্ষ্ণ সমালোচনা না করে জ্ঞান - বিজ্ঞানের চর্চা চলতেই পারে না। তারপরে যদি 'আসাম বন্ধু' জনগণকে অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়বার জন্যে সাহসই দিতে না পারে বা পথ দেখাতে অসমর্থ হয়, তাহলে সে কি রকমের 'বন্ধু' হল?

কিছুদিন আগে হলে ধর্মকান্ত দ্বিধাহীনভাবে নিজের অভিমত প্রকাশ করত হয়ত। কিন্তু জীবনে প্রথমবারের জন্যে সে এইবার নিজের জিভকে শাসন করল। 'বিল্বকুটীরে'র উদ্যামী পরিবারটির মনে দুঃখ দিতে তার ইচ্ছে হল না। তাই একটু সৌজন্যের হাসি হেসে সে বল'ল —

"আমি এখন ওপর ওপর দেখলাম। মনে হচ্ছে বিষয়বস্তু সবই যেন যথেষ্ট উপযোগী। অসমে সংবাদপত্র আর পত্রিকার এত অভাব যে এইটি অনেক অভাবপূরণ করবে। কিন্তু অক্ষরগুলো অসমীয়ার মত হলে ভালো ছিল। অন্ততঃ 'র' টাও যদি অসমীয়া 'ব' দেওয়া যেত।"

"আমি ও সেই কথাই বলছি," স্বর্ণ বলল, "কিন্তু কলকাতার প্রেসে নাকি পেটকাটা 'ৰ' পাওয়া যায় না।"

"কেন, অরুণোদই কোত্থেকে পেয়েছিল? মিশনারীরা যেন কলকাতা থেকে অক্ষর আনেনি?" ধর্মকান্ত বলল।

"ধর্মকান্ত, শিবসাগরের মিশন প্রেসের কথা বলবে না। পাদরীদের সব কথাই আলাদা। ব্রাউন সাহেবের নিজের হাতে নক্সাগুলি এঁকে অসমীয়া কারিগরের সাহায্যে ছাঁচ কাটিয়ে ছিলেন। 'ব' অক্ষরটি সম্ভবত মিশন প্রেস তাদের নিজেদের ছাচে ঢালাই করে বানিয়ে নিয়েছিল। আমাদের যেহেতু এসব সুবিধে নেই, তখন কলিকাতাতে যে অক্ষর পাওয়া গেছে তাতেই সন্তুষ্ট থাকতে হবে।" গুণাভিরাম যেন, এই আলোচনা বন্ধ করে দেবার মত করেই বললেন।

ধর্মকান্ত কিন্তু সন্তুষ্ট হল না। সে আগ বাড়িয়ে এই পরামর্শ দিল যে কলকাতার একটি ফাউণ্ড্রিতে এখন অর্ডার দিয়ে অসমীয়া 'ৰ'ও'ৰ' অক্ষর দুটির ছাঁচ বানিয়ে নেওয়াটা কোন

দুঃসাধ্য ব্যাপার নয়, সে নিজেই এই কাজের দায়িত্ব নিতে প্রস্তুত হ'ল। ধর্মকান্তের যুক্তি ফেলতে না পেরে অবশেষে গুণাভিরামও তার কথায় সম্মত হয়ে কলকাতায় নতুন একসেট অক্ষরের অর্ডার দিয়ে চিঠি লিখলেন। সেই চিঠিতেই কাজ হল। তৃতীয় সংখ্যার পরেই 'আসামবন্ধু'র চেহারা প্রকৃত অর্থেই অসমীয়া হয়ে গেল।

'বিল্বকুটীরে' সেই এক সপ্তাহ ধর্মকান্তর' ও খুব ব্যস্ততার মধ্যেই কেটে গে'ল। অসমের একপ্রান্ত থেকে অন্যপ্রান্ত পর্যন্ত গুণাভিরামের যে সমস্ত শিক্ষিত পরিচিত লোক ছিল সকলকেই ডাকে বিনামূল্যে 'আসামবন্ধু' পাঠানো হ'ল। তারসঙ্গে অবশ্য বার্ষিক চাঁদা পাঠাবার অনুরোধ জানিয়ে একটি করে চিঠিও দেওয়া হল। ঠিকানা সংগ্রহ করা, লেবেলের ওপরে সেসব লেখা। তারপরে ডাকঘরে গিয়ে ওজন করে টিকিট লাগানো— ইত্যাদি বহুবিধ কাজের সৃষ্টি হল। স্বর্ণর হাতের লেখা সুন্দর বলে ঠিকানা লেখার কাজটা ধর্মকান্ত তাকেই দিল। স্বর্ণ, তারা এবং লক্ষ্মীকে ডেকে আনা হল। এসব কাজ করে তারারা আনন্দ পাবে বলে তার ধারণা। তারপর এই উপলক্ষে তিনজন বান্ধবী একসঙ্গে হওয়ারও একটি সুযোগ পাবে। খবর পেয়ে তারা আর লক্ষ্মী স্কুল থেকেই সোজা 'বিল্বকুটীর'- এ চলে এল। গুণাভিরামের বৈঠকখানার একটি কোণে বসে ধর্মকান্ত পত্রিকাগুলি কাগজে মুড়ে মুড়ে বাঁধছিল। মেঝেতে কাছেবসে স্বর্ণ কাগজের লেবেলে ঠিকানাগুলো লিখে যাচ্ছিল। তারা আর লক্ষ্মী তার কাছে বসে ঠিকানা লেখা আর আঠা লাগানোর কাজে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিল। স্বর্ণ লক্ষ্মীকে আস্তে আস্তে জিজ্ঞেস করল

"তুমি যে বাড়িতে না গিয়ে সোজা আমাদের এখানে এলে, মা-বাবা চিন্তা করবেন না তো?"

"বেশি দেরি হ'লে করবেন। কিন্তু আজকাল মা আমাকে বিশ্বাস করেন। আগের মতো ভাইদের কাউকে বা চাকরদের সঙ্গে পাঠান না।" — লক্ষ্মী হেসে হেসে বলল।

তারা বলল — " আমাদের দেশে একলা হেঁটে যাওয়াটা কেন খারাপ বলে মনে করা হয়? অন্যের ওপর সবসময়ে নির্ভরশীল হলে তবেই ভালো মেয়ে, না?"

আমাদের সমাজের সেটাই ধারণা। যেসব মেয়ে মাথায় ঘোমটা দিয়ে বাড়ির মধ্যে থাকে তাদেরই ভালো মেয়ে বলে, আর আমাদের মতো মেয়েদের বলে নির্লজ্জ। বাড়ির বাইরে বেরোতে দেয় না।" —লক্ষ্মী বিদ্রুপের সুরে বল'ল।

স্বর্ণ এতক্ষণ চুপচাপ লিখছিল এইবার কলমটি নামিয়ে রেখে সে গম্ভীর সুরে বলল, "আমাদের লোকেরা স্ত্রী-স্বাধীনতার আসল অর্থ বোঝেনি বলেই সেরকম ভাবে। লজ্জার প্রকৃত অর্থ কি? মাথায় ঘোমটা দিয়ে নিজের মুখখানি লুকিয়ে রাখলেই তাকে লাজুক বলে না, তো বরং লজ্জার অর্থ হল পাপ কাজ থেকে যে ভয়ে দূরে থেকে নির্ভীক ভা বে এগিয়ে যায়, সেইই আসলে লাজুক। যেসব মেমেরা সৎকাজের সঙ্গে যুক্ত তাদেরও লজ্জা আছে, যদিও তারা মাথায় ঘোমটা দেন না আর পুরুষদের সহিত একত্রে ঘোরা-ঘুরি করেন। স্ত্রী স্বাধীনতা একেই বলে।"

দুজন মেয়েই স্বর্ণর যুক্তি শুনে মুগ্ধ হল। লক্ষ্মী নিজের হাতখানি স্বর্ণর হাতের ওপর রেখে আবেগে বলে উঠল,''আজ তুমি আমার মনের অনেক দিনের একটা খুঁত খুঁতুনির এত সুন্দর একটা সমাধান করে দিলে। এখন থেকে আর আমি নিজের কাজ করার সময়ে সমাজকে ভয় করে চলব না। বিধবা হলেও যে নারীর একটা নিজস্ব জীবন থাকতে পারে সেটাকেই আমি সৎ কাজ করার মধ্য দিয়ে দেখাতে চেষ্টা করব।''

ধর্মকান্ত এতক্ষণ মাথানিচু করে নিজের কাজ করবার সময়ে তিনজনের কথাগুলো খুব মনোযোগ দিয়ে শুনছিল। লক্ষ্মীর শেষ কথাটি শুনে সে অবাক হয়ে ওর দিকে তাকাল। কিছুক্ষণ আগে স্বর্ণ দুজন মেয়ের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবার সময় তার মনেই হয়নি যে লক্ষ্মী নামের ছিপছিপে, দীর্ঘাঙ্গী মেয়েটি বিধবা। তার মুগার মেখলা এবং সবুজ পাড় লাগানো সূতির চাদর দুখানিতে বৈধব্যের কোনো লক্ষণ সে দেখতে পায়নি। অবশ্য তার বোঝা উচিত ছিল যে ব্রাহ্মনের পূর্ণ যুবতী মেয়ের সিঁদুর না নেওয়ার অর্থ বৈধব্যই হয়। কিন্তু বিধবা বামুনের মেয়ে মিশনস্কুলের শিক্ষয়িত্রী কেমন করে হল? লক্ষ্মীর সম্পর্কে জানবার জন্যে ধর্মকান্তের মনে ভীষণ কৌতুহল হতে থাকে।

ইতিমধ্যে তারা আর লক্ষ্মী বিদায় নিয়ে চলে গেছে। স্বর্ণ তাদের এগিয়ে দিয়ে সামনের দিকের বারান্দার চেয়ারে বসে পড়ল। ধর্মকান্ত ও বাইরে বেরিয়ে এসেছিল। একটু ইতস্ততঃ করে সে স্বর্ণর কাছাকাছি অন্য একটি চেয়ারে বসে স্বাভাবিকের চেয়ে একটু গম্ভীর সুরে বলব কি বলব না করে বলে উঠল —

''তখন তোমাদের কথা শুনে খুব ভালো লাগলো। তোমাদের মতো শিক্ষিতা মেয়েরা যে নারীর আসল গুণগুলির সম্পর্কে চিন্তা করছ তা দেখে খুব ভালো লাগছে। আমি মনে করি যে তুমি আজকের এই কথোপকথনটা লিখে 'আসামবন্ধু'তে প্রকাশের জন্য দিলে বেশ হয়।

ধর্মকান্ত যে তাদের কথা শুনেছে একথা তার একবারও মনে হয়নি। তাই সে একটু অপ্রস্তুত ভাবে বলল —

''আমাদের কথা পড়তে কারও কি ভালো লাগবে?''

''কেন? আমার মতো অনেকেরই ভালো লাগবে। আজকাল নারীমুক্তির কথা নিয়ে সবাই হাসি - ঠাট্টা করে। তোমাদের কথাগুলো মানুষকে অনেক কথা শেখাবে।''

খানিকক্ষণ দুজনেই চুপচাপ। ধর্মকান্ত লক্ষ্মীর কথা তুলবে ভেবেছিল। কিন্তু হঠাৎই তার মন অস্বস্তিতে ভরে গেল। স্বর্ণকে সে যদিও সবসময় নিজের বোনের মত স্নেহ করে এবং নিঃসঙ্কোচে তার সঙ্গে সাহিত্য, রাজনীতি, ধর্ম বিষয়ে আলোচনা করে, তবুও কোন কোন বিষয়ের ক্ষেত্রে সে সবসময়ই সংযত হয়ে আলোচনা করে। মেয়েদের সম্পর্কে সে কোনদিন কোন আলোচনায় ভাগ নেয়নি। অবশ্য এ বিষয়ে তার অভিজ্ঞতা খুবই কম। স্কুল - কলেজে পড়ার সময় সে সহপাঠী হিসেবে কোনো মেয়ের সঙ্গ পায়নি। স্বর্ণর সঙ্গে পরিচয়ের আগে পর্যন্ত তার ধারণা ছিল যে মেয়েরা এক অন্য জগতের প্রানী বিদ্যা -

বুদ্ধিতে যারা নাকি ছেলেদের থেকে অনেক পিছিয়ে। অবশ্য গুণাভিরাম বরুয়া পরিবারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হওয়ার পরে সে বেশ কয়েকজন সুশিক্ষিতা বাঙালি মেয়ের সঙ্গ পেয়েছিল আর তাদের জ্ঞান এবং বুদ্ধি তাকে বিস্মিত করেছিল। কিন্তু অসমে যে স্বর্ণ ছাড়াও অন্য শিক্ষিতা মেয়ে থাকতে পারে সে তারা আর লক্ষ্মীকে দেখার পরে উপলব্ধি করল। স্বর্ণ এতক্ষণ নিজের ভাবনায় এত বেশী বিভোর ছিল যে ধর্মকান্তের চুপচাপ থাকাটা সে লক্ষ্যই করেনি। সে তখন লেখিকা হওয়ার স্বপ্ন দেখছিল। ধর্ম কান্তের পরামর্শ অনুযায়ী সে সেই দিনের কথোপকথন কি রকম করে লিখবে তা মনে মনে ভেবে নিচ্ছিল। একটু পরে সে নিজেই বলে উঠল ঃ

" আমি যদি বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের মতো লিখতে পারতাম।"

" তোমার তাঁর লেখা ভালো লাগে নাকি? কোন্ কোন্ বই পড়েছ?"

" কলকাতাতে থাকার সময় 'দুর্গেশনন্দিনী' পড়েছিলাম। এখানে লক্ষ্মীর কাছ থেকে এনে 'কপালকুন্ডলা ' পড়লাম। অদ্ভুদ বই! বারবার পড়তে ইচ্ছে করে! লক্ষ্মীর তো অনেক লাইনই মুখস্থ হয়ে গেছে।"

—" লক্ষ্মী এইসব বই কোত্থেকে পেল?" — ধর্মকান্ত বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞেস করল।

"চারুশীলা দিদিমণি তাকে পড়তে দেন। তিনি তাকে সেই প্রথম দিন স্কুলে যাওয়া থেকে সব ব্যাপারে উৎসাহ দিচ্ছেন। তাঁর সাহায্য না পেলে লক্ষ্মীর জী বনটা কি হত কে জানে!" — স্বর্ণ দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল।

"লক্ষ্মীর জীবনের কথা বলতো। আমার বিশ্বাস করতে কষ্ট হচ্ছে সে কেমন করে এতদূর পড়াশুনো করল।" ধর্মকান্ত খোলাখুলিভাবে এবা র নিজের কৌতুহল প্রকাশ করল।

স্বর্ণর কাছে লক্ষ্মী এবং তারা সম্পর্কে কেউ যদি জানতে চায় তাহলে সেই চাওয়াটা খুবই স্বাভাবিক ব্যাপার। কারণ তারা দুজনেই অন্য সব মেয়েদের থেকে আলাদা। তাদের সম্পর্কে বলতে পারলে তার আর অন্যকিছু চাই না। লক্ষ্মীর সংগ্রামী জীবনের একটি আদর্শ ছবি সে ধর্মকান্তর সামনে তুলে ধরল। হয়ত কোন কোন ক্ষেত্রে তার বর্ননা কিছুটা অতিরঞ্জিত ও ছিল — কলকাতার হোস্টেলের বাঙালী বান্ধবীদের নিকট থেকে এই গুনটার অল্প হলেও না নেওয়াটাই অস্বাভাবিক ছিল। কিন্তু সামনাসামনি এমন মুগ্ধ শ্রোতা পেলে কে আর বাস্তবের চিত্রাঙ্কনের ওপর সামান্য রং ফলিয়ে তাকে বেশিমাত্রায় মনোগ্রাহী করে তুলতে না চায়? তার ওপর ধর্মকান্ত সেইদিন লক্ষ্মীর জীবনকাহিনী শুনে এমনভাবে মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে গেল যে স্বর্ণ যদি কিছু অতিরঞ্জিত করেও থাকে, সেটি তার চোখে ধরা পড়ল না। তার মনে সেইদিন লক্ষ্মী এক সংগ্রামী নারীশক্তির প্রতীকরূপে চিহ্নিত হল এবং কোমলভাবে অজান্তে সঙ্গে সঙ্গে আরও কিছু যে তার হৃদয়ে স্থান পেল।

সেই কয়েকদিন তারা আর লক্ষ্মী 'বিল্বকুটীর'-এ নিয়মিত আসত। একসঙ্গে কাজ করার মধ্যে তারা এক ধরণের নতুন আনন্দ খুঁজে পেল। গুণাভিরামও প্রায়ই তাদের সঙ্গে

বসে আলাপ করতেন এবং ভবিষ্যৎ সম্পর্কে নানা পরামর্শ দিতেন এবং পরিকল্পনা ও করতেন। বিষ্ণুপ্রিয়া মাঝে মধ্যে চা জল - খাবার দিতে এসে নিজে বসেও এটা ওটা নির্দেশ দিতেন। এগারো বছরের করুণারও যথেষ্ট উদ্যম ছিল। স্কুল থেকে এসেই সে পত্রিকার প্যাকেটগুলিতে ডাক - টিকিট লাগানোর কাজে লেগে যেত। প্রত্যেকেরই ধারণা হয়ে ছিল যে, কোন একটা বড়ো কাজ যেন শেষ হওয়ার উপক্রম হতে চলেছে। একদিন তারা গোটা দৃশ্যটা দেখে হেসে হেসে বলল —

"বড়দিনের সময়ে মিশনের বাংলোতে কাজ করার মতো মনে হচ্ছে। ঠিক এইভাবেই আমরা সবাই মিলে কাজ করি।"

— "বিহুর আগের দিন বা বাড়িতে যদি কোন অনুষ্ঠান থাকে তাহলে তার আগের দিন আমি সারা রাত জেগে বাড়ির ঝি এবং বৌদের সঙ্গে কাজ করি। কিন্তু সেইসব কাজে এত আনন্দ পাওয়া যায় না। সেইসব কাজ শুধু নিজের বা বাড়ির মঙ্গলের জন্যে করা হয়। আমরা এখন যে কাজটা করছি সেটা দশজনের জন্যে, ঠিক কিনা?" — লক্ষ্মী গম্ভীর সুরে বলল।

"দেখ যদি আমার এই ছোট্ট পত্রিকাটি অসমের মানুষের মধ্যে সামান্য জ্ঞানের আলো বয়ে নিয়ে যেতে পারে, তাহলে আমার এই কষ্ট যথার্থ সার্থক হবে।" — গুনাভিরাম পত্রিকার একটি কপিরগায়ে পরম স্নেহে হাত বুলোতে বুলোতে বলে গেলেন।

ধর্মকান্তের সেইমুহূর্তে ধারণা হয়েছিল যে গুণাভিরাম বরুয়া যেন একটি বড়োসড়ো পিপুলগাছ। তার ছত্রছায়াতে তারা সবাই কিছুক্ষণের জন্যে বসে ভবিষ্যৎ জীবনের জন্যে নিজেদের প্রস্তুত করছে। ঘরে থাকা প্রত্যেককে সে লক্ষ্য করল। বিষ্ণুপ্রিয়া ও যেন ফলফুল ভরে থাকা একটি গাছের মতোই। তাঁর মাথার ওপর দিয়ে কত ঝড় বয়ে গেছে — অথচ দেখতে তিনি অত্যন্ত শান্ত, স্নেহশীলা একজন মা। স্বর্ণ একটি সদ্যফোটা গোলাপের মতো — জীবনের কাঁটায় অভিজ্ঞতা তাকে এখনো স্পর্শ করেনি। তারা, অতিব্যস্ত এক ঝরণার মতো। কারও জন্যে দাঁড়াবার সময় নেই। তার সেই অফুরন্ত শক্তি যদি দেশের কাজে লাগানো যেত — ধর্মকান্ত ভাবে। আর লক্ষ্মী? তাকে কার সঙ্গে তুলনা করবে সে ভেবেই পেল না। আজ পর্যন্ত যত মেয়ের সে দেখা পেয়েছে সবার চেয়ে সে যেন বেশ কিছু স্বতন্ত্র। এই কদিনেই ধর্মকান্ত বুঝতে পারছিল যে লক্ষ্মীর সঙ্গে দেখা হওয়ার পর থেকে সে আর আগের মতো নেই। এখন একলা থাকলেই লক্ষ্মীর সমস্ত স্মৃতি যেন তার মনপ্রাণকে আচ্ছন্ন করে রাখে। এই সব ভাবনাচিন্তা তাকে নিজের লক্ষ্য থেকে পাছে সরিয়ে আনে তাই তার বড়ো চিন্তা হয়। অথচ তার সম্পর্কে ভেবে সে যে কিছু পাপ করছে, একথাও তার মনে হয় না। খুব অস্থিরভাবে ধর্মকান্ত একসপ্তাহ পরে তপত্জুরি ফিরে গেল।

এগারো

শীতের ছুটির পরে স্বর্ণ কলকাতায় ফিরে যাওয়ার সময় এসে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে গুণাভিরাম আর বিষ্ণুপ্রিয়ার মনে নানা চিন্তা যেন ভর করল। দুই - এক বছরের মধ্যে ভালোছেলে পাওয়া গেলে স্বর্ণকে বিয়ে দেবেন এরকম কথা তাঁরা মনে মনে ভেবে রেখেছিলেন। সুতরাং এই কদিন মেয়েকে বোর্ডিং এ রাখার ইচ্ছে তাঁদের আর একটু ও ছিল না। এদিকে স্বর্ণ স্কুল ছেড়ে দেওয়র নাম শুনতেই চায় না। তার সঙ্গী কয়েকটি মেয়ের এনট্রান্স পড়বার ইচ্ছে ছিল যদিও তাদের মা - বাবা অর্ধ-শিক্ষিত হওয়ার পরে স্কুল ছাড়িয়ে তাদের বিয়ে দিয়ে দেওয়ায় স্বর্ণ মনে খুবই দুঃখ পায়। তার একান্ত বিশ্বাস ছিল যে তার মা - বাবা এরকম নয়। তাকে যতদূর খুশি পড়তে দেবেন। স্বর্ণর বিশ্বাসে আঘাত দিতে চান না বলেই গুণাভিরাম আর বিষ্ণুপ্রিয়া অন্য একটি বিকল্প পথ বেছে নিলেন। দু - বছরের জন্যে বিষ্ণুপ্রিয়া কলকাতায় থাকবেন, আর স্বর্ণকেও নিজের সঙ্গে রেখে স্কুলে পড়াবেন। সে তখন হাইস্কুলের তৃতীয় শ্রেনীর ছাত্রী। আরও তিনবছর পরে সে এন্ট্রান্স পরীক্ষা দেবে বলে সব শিক্ষয়িত্রী বড় আশা করেছিলেন।

কলকাতায় মানিকতলা স্ট্রীটের একটি বড় সড় ঘর ভাড়া নিয়ে গুণাভিরাম স্ত্রী এবং পুত্র কণ্যাদের সেখানে রেখে এলেন। 'বিল্বকুটীর' নির্জণ হয়ে গেল। কিন্তু মাসে মাসে 'আসাম বন্ধু' বেরোবার সময় বাড়িতে লোকসমাগম হতে লাগল। গুণাভিরাম এখন একা আছেন ফলে আরও বেশি করে লেখাপড়া নিয়ে সময় কাটাতে লাগলেন। ধর্মকান্ত প্রায় প্রতিমাসে নগাঁও এসে থাকে। যদিও তার এত ঘন ঘন এখানে আসার প্রকাশ্য কারণ 'আসাম বন্ধু' তবুও গুণাভিরাম লক্ষ্য না করে পারলেন না যে লক্ষ্মী আর ধর্মকান্তর মাঝখানে যেন কিছু একটা গভীর সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। গুণাভিরাম এই বিষয়ে ধর্মকান্তের সঙ্গে কথা বলবেন ভেবেও বয়সের দূরত্বের জন্যে নিজের দিক থেকে কথাটি আলোচনা করতে সংকোচ বোধ করলেন। ধর্মকান্ত কথাটা তুললে তিনি এ সম্পর্কে আলোচনা করবেন ভেবে চুপচাপ রইলেন। ধর্মকান্ত আর লক্ষ্মী দুজনেরই ওপরই তাঁর অগাধ বিশ্বাস। তারা একটা কিছু খারাপ কাজ করতে পারে এরকম তাঁর মনে হল না।

এদিকে কলকাতার বাড়িতে স্বর্ণ ছোট ছোট তিনটি ভাইয়ের অভিভাবিকা রূপে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে নিল। প্রথমে বিষ্ণুপ্রিয়া কলকাতার নতুন পরিবেশের সঙ্গে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে একটু কষ্ট পেলেন। যদিও খবর নেবার জন্যে অনেক লোকজন ছিল তবুও দৈনন্দিন জীবনের খুঁটি নাটি কথাগুলির জন্যে প্রতি পদে পদে তাঁকে স্বর্ণর সাহায্য নিতে হত। স্বর্ণ বাংলা আর ইংরেজী দুটোই ভালো করে বলতে পারত। ফলে বাড়ির ঝি - চাকরদের সঙ্গে কথা বলা থেকে আরম্ভ করে ভাইদের স্কুলের হেডমাস্টার মশাইয়ের কাছে ইংরেজীতে দরখাস্ত লেখা সবই স্বর্ণকে করতে হত। এইসব কাজে স্বর্ণ হঠাৎই এক নতুন ধরনের আনন্দ পেল। এতদিন বাড়ি থেকে দূরে থাকার পরে আবার যেন সে তার

ভাইদের নতুন করে খুঁজে পেল। তাদের ভালো করে কাপড় চোপড় পরানো, বইপত্র গুছিয়ে দেওয়া, পড়াশুনোয় দৃষ্টি দেওয়া, আর গল্প - টল্প শুনিয়ে অপার আনন্দ লাভ করত। তাদের কাছেও ''দিদি'' হয়ে উঠল পৃথিবীর সব থেকে জ্ঞানী গুনী আর সুন্দরী মেয়ে। তার প্রত্যেকটি আদেশকে তারা নির্দ্বিধায় মেনে নিত।

স্বর্ণর স্কুলে যাতায়াত করার জন্যে বাবা একটি ঘোড়ার গাড়ির ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। স্কুলে যাওয়া - আসার পথে মহানগরীর নানা দৃশ্য তার মনকে আশ্চর্যভাবে রোমাঞ্চিত করে তুলত। হয়তো কৈশোর আর যৌবনের সন্ধিক্ষণের অনেক আবেশ ভরা স্মৃতি জড়িত হয়ে থাকার জন্যেই এই নগরীটি তার ভালো লাগত। শিশু যেমন মাকে ভালোবাসে, নগাঁও ছিল তার কাছে তেমন। কিন্তু কলকাতার আকর্ষণ এক রহস্যময় প্রেমিকের মতো। এর বৈচিত্র্যময় জীবনের মাদকতা যে উপভোগ করছে একমাত্র সেই মানুষই বুঝতে পারবে। বসন্তকালে দক্ষিণের মলয়ানিল বৃদ্ধের হৃদয়কেও জাগিয়ে তুলতে পারে — তরুণদের তো কথাই নেই। সেই মলয় পবনের সুবাস কত কত নীরস লোককেও কবিতা লিখতে বসিয়ে দেয়। স্বর্ণ তাদের বাড়ির দক্ষিণ দিকের একটি খোলা জানালার কাছে দাঁড়িয়ে সেইরকম মাদকতাময় বিকেলে, ররীন্দ্রনাথের গানগুলি গুণ্‌গুণ করে গাইতে চেষ্টা করে। মাঘোৎসবের সেই সন্ধার পরে সে আর কবির দেখা পায় নি। কিন্তু হেমপ্রভাদের কাছে শুনেছে যে ছোট একটি মেয়ের সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়ে গেছে। খবরটি পেয়ে স্বর্ণর মন বিষাদে ভরে গিয়েছিল। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তার বিবাহের কথা - বার্তা হওয়ার কথা এবং পরে কোন এক কারণের জন্যে সম্বন্ধটি না হওয়ার কথাও সে হেমপ্রভাদের কাছ থেকে একটু জানতে পেরেছিল। সেইজন্যেই হয়ত কবির সঙ্গে সে কিছু একটা রহস্যময় সম্পর্ক অনুভব করেছিল। মাঘোৎসবের দিন গোধুলিতে উভয়ের ঘোরাফেরার সময় কবির চোখের গভীর চাহনির কথা মনে পড়লে স্বর্ণর বুকখানি কেমন কেমন করে ওঠে। ''মায়ার খেলার'' সেই নতুন গানটা — ''রোদনভরা এ বসন্ত'' — স্বর্ণর মনে হয়, সেটা যেন তার জন্যেই লেখা!

বার

'আসাম বন্ধু' মাত্র একবছরই নিয়মিতভাবে বেরোল। তারপরে পত্রিকাটির মৃত্যু আসন্ন হয়ে উঠল। গ্রাহকের সংখ্যা বাড়ল না। পুরনো গ্রাহকেরা আর ও একবছরের জন্যে চাঁদা পাঠাতে আগ্রহ দেখাল না। গ্রাহক - চাঁদা চেয়ে গুণাভিরাম অনেক জায়গায় চিঠি দিলেন। কিন্তু দু-একজন ছাড়া কেউই চিঠির উত্তর দিল না। নতুন গ্রাহক খুঁজতে ধর্মকান্ত গুয়াহাটী আর নগাঁওর বাড়ি বাড়ি ঘুরল। একটা থলিতে পত্রিকার শেষ সংখ্যার কয়েকটি নিয়ে সে অনেক চেনা অচেনা লোকের কাছে গেল। এককপি পত্রিকা কিনতে কেউই আপত্তি করল

না, কিন্তু বছরের চাঁদা দিতে সকলেরই আপত্তি — পত্রিকাটি এ বছর বেরোয় কি না বেরোয়? দুঃখী বা দরিদ্র পাঠকদের কথা তো বাদই। ধর্মকান্ত অবাক যে সামর্থ্য থাকা মানুষরাও বার্ষিক চাঁদা তিনটাকা দেবার সময়ে নানারকম ওজর - আপত্তি করতে শুরু করল। কেউ কেউ নিজেদের অভাব অনটনের অজুহাত ও তুলল। দু - একজন পত্রিকার ভাষা আর বিষয়বস্তুর বিরূপ সমালোচনা করে চাঁদা দিতে ইতস্ততঃ করল। এবার গুয়াহাটী যাওয়ার সময় গুণাভিরামের অনুরোধ ঠেলতে না পেরে ধর্মকান্ত লক্ষেশ্বর কটকীর কাছেও গিয়েছিল। লক্ষেশ্বর বি.এ.পরীক্ষা তৃতীয় বিভাগে পাশ করে গুণাভিরামের সুপারিশে চাকরীতে ঢুকেছিল। তারপরে সে অবশ্য গুণাভিরামের সঙ্গে আর বিশেষ সম্পর্ক রাখেনি। মাঝখানে মাত্র একটি চিঠিতে সে জানিয়েছিল যে কলিয়াবরের গোঁসাই বাড়ির নয়বছরের মেয়ে একটিকে মা - বাবার ইচ্ছে অনুযায়ী সে বিয়ে করেছে। ধর্মকান্ত কলেজে পড়ার সময় থেকেই লক্ষেশ্বরের ধ্যাণ-ধারণা পছন্দ করেনি। উচ্চশিক্ষা পেলেই যে মানুষের মন সংকীর্ণতা মুক্ত হয়ে যায় না সে কথা লক্ষেশ্বরের সঙ্গে পরিচয় হওয়ার পরই ধর্মকান্ত বুঝতে পেরেছিল। কলকাতার মেসে অনুষ্ঠিত একটি আলোচনাচক্রে লক্ষেশ্বরের পাঠকরা একটি রচনার কথা ধর্মকান্ত ভুলে যায় নি। 'নারীর প্রকৃত স্বাধীনতা কি?' নামক রচনাটিতে লক্ষেশ্বর প্রমাণ করতে চেয়েছিল যে মেয়েদের জন্যে উচ্চশিক্ষার প্রয়োজন নেই বরং উচ্চশিক্ষা তাদের মধ্যে সমাজ ধ্বংস করার বীজই বপন করবে। লক্ষেশ্বরের মতে ঘরোয়া কাজ - কর্ম সুচারু রূপে সম্পন্ন করাতেই স্ত্রীজাতির প্রকৃত কৃতিত্ব প্রকাশ পায়। রচনাটিতে এরকম আরও অনেক কথাই সে লিখেছিল, যেগুলো ধর্মকান্ত সর্বান্তঃকরণে সমর্থণ করতে পারেনি। সেইদিন এই বিষয়টা নিয়ে মেসে বেশকিছু ছাত্রের মধ্যে তর্কাতর্কি হয়েছিল। ধর্মকান্ত ব্রাহ্মসমাজের আদর্শসমূহ আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে নিজের যুক্তিগুলি তুলে ধরেছিল এবং অবশেষে তার বিজয়ও হয়েছিল। কিন্তু লক্ষেশ্বরের সমর্থণকারী ছাত্রের সংখ্যা ও সেদিন নেহাৎ কম ছিল না।

লক্ষেশ্বরের সঙ্গে দেখা করতে যাওয়ার সময় এসব কথাই তার মনে এল বারবার। তবুও, পত্রিকাটি বাঁচিয়ে রাখবার জন্যে সবরকম মানুষের কাছ থেকে সাহায্য ও সহযোগিতার প্রয়োজন উপলব্ধি করে সে লক্ষেশ্বরের কাছে গিয়েছিল। কিন্তু প্রথম থেকেই সে লক্ষ্য করছিল যে লক্ষেশ্বর যেন তার সঙ্গে একটু ঠাট্টার সুরে কথা বলছে। 'আসাম বন্ধু'র সম্পর্কেও সে কোনো উৎসাহ দেখাল না। গুণাভিরাম বরুয়ার বিষয়ে দু - একটি কথা জিজ্ঞেস করে দেব কি দেব না ভেবে সে তিনটি টাকা বের করে দিয়ে বলল —

"লোকের দানের উপর নির্ভর করে এরকমভাবে আর কতদিন পত্রিকা চালাবে বরুয়া? এতগুলি ভালো ভালো বাংলা পত্রিকা থাকতে অসমীয়া পত্রিকাটি কেউই পড়ে না, বুঝলে? আমি এসব চিন্তা অনেক আগেই বাদ দিয়েছি।"

"আপনার মত শিক্ষিত লোকই যদি এত হতাশার সুরে কথা বলে, তাহলে অসমীয়া ভাষা - সাহিত্যের উন্নতি দেখছি কোনদিনই হ'বে না।" ধর্মকান্ত একটু বিরক্তির সুরে বলল।

"আচ্ছা, ভাষা-সাহিত্যের কথা বাদদিন তো- এই যে, কথাটা শুনছি, সত্যি নাকি?" লক্ষেশ্বর খুবই অন্তরঙ্গসুরে আস্তে প্রশ্ন করল।

ধর্মকান্ত আশ্চর্য হয়ে উত্তর দিল "কোন কথাটা?"

"আপনি ও গভীর জলের মাছ। পঞ্চানন শর্মার বিধবা মেয়ের সঙ্গে আপনার ক্রিয়াকলাপের খবর আমরা এখানে থেকেও পেয়েছি। শেষকালে, একটু সাবধান করে দিই বাবু। পঞ্চানন শর্মা দেখতে নিরীহ হলেও খুবই একরোখা লোক। মেয়ের কোন অঘটন ঘটলে কি করবে ঠিক নেই।" লক্ষেশ্বর ধর্মকান্তকে জব্দ করার ছলে চোখটিপুনি মেরে বলে যেতে লাগল, "লক্ষ্মীপ্রিয়া ও অবশ্য কম নয়। আমি একদিন ঠাট্টা করে তার হাতখানি ধরাতে সে যেরকম ঠিকরে দৌড়ে চলে গেল, যেন ভীষণ-সতী-সাধ্বী!"

ধর্মকান্ত রাগে এবং বিস্ময়ে প্রথমে স্তব্ধ হয়ে গেল। মানুষের মন যে এত নীচ হতে পারে, তার ধারণা ছিল না। লক্ষ্মী আর তার মাঝখানের পবিত্র সম্পর্ককে এত নীচে টেনে নিয়ে গিয়ে লোকে তার নামে কুৎসা রটনা করছে সে কথা সে লক্ষেশ্বরের কথা শুনে উপলব্ধি করতে পারল। লক্ষেশ্বরের মতো নীচুতলার লোকের সঙ্গে তর্ক করে লাভ নেই, সে বুঝল। তবুও লক্ষ্মীর সম্মান রক্ষা করার জন্যে সে একটা বড় কথা বলে ফেলল যেটা সে খোলাখুলি লক্ষ্মীকেও তখন ও পর্যন্ত বলতে পারেনি —

"কটকী, আমার ভাবী পত্নী-সম্পর্কে এতগুলো কথা আপনার কখনই বলা উচিত হয়নি। এরপরে আমি আর কোনদিনই আপনাকে বন্ধু বলে ভাবতে পারব না।"

"আপনার 'ভাবী পত্নী'? কে-লক্ষ্মীপ্রিয়া?" লক্ষেশ্বর অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে বলে উঠল।

"হ্যাঁ, লক্ষ্মীপ্রিয়া। আপনাদের মতো নীচলোকের পক্ষে এটা অসম্ভব হলেও আমার পক্ষে সম্ভব। আপনার পক্ষে খেলাচ্ছলে একজন অবলা বিধবা নারীর সতীত্ব নষ্ট করাটা সাধারণ কথা। আমার কাছে নারী হিসাবে তাকে সম্মানের সঙ্গে সমাজে বাঁচার সুযোগ দেওয়াটাই পবিত্র কর্ত্তব্য বলে মনে করি।"

লক্ষেশ্বরকে হতভম্ব করে দিয়ে ধর্মকান্ত দুপদাপ শব্দে বেরিয়ে গেল। যাওয়ার সময় সে মনে মনে দৃঢ়সংকল্প করে গেল যে পরেরবার নগাঁও গিয়েই সে লক্ষ্মীপ্রিয়াকে বিয়ে করার প্রস্তাব দেবে। একাকী লক্ষ্মীর দেখা সে দুবার না তিনবারই পেয়েছিল-দুদিন মিশনস্কুলের সামনে আর একদিন 'বিম্বকুটীর' থেকে সে তার বাড়ির অল্প আগে পর্যন্ত এগিয়ে দিয়েছিল। সেইটুকু সময়ের মধ্যে তারা একজন আর একজনের সম্পর্কে মনোভাব ও ভালোকরে প্রকাশ করতে সক্ষম হয়নি। কিন্তু কথাগুলো এত খারাপভাবে রটনা হয়েছে যে ধর্মকান্ত স্থির করে ফেলল যে লক্ষ্মীকে সমাজের নিষ্ঠুর আক্রমণ থেকে বাঁচাতে হলে যে কোন উপায়ে সে বিয়েটা করবেই।

'আসাম বন্ধু'র বার্ষিক চাঁদা তুলতে গিয়ে ধর্মকান্তের যেসব তিক্ত অভিজ্ঞতা হল, তার কিছু আভাস সে গুণাভিরাম বরুয়াকে দিল। একদিন হতাশার সুরে সে বলেছিল —

"আমাদের অসমীয়া মানুষরা নিজের দেশের কোন মানুষ যদি কিছু একটা ভালো

কাজ করতে চায় তাহলে কখনো উৎসাহ দিতে চায় না। বরং শুধু দোষই দেখে।''

''বুঝতেন-কিন্তু যারা দোষ দেখায় তারা নিজেরা কিছুই করে না। প্রত্যেকে যদি নিজের মনের সমস্ত ভাব খোলাখুলিভাবে প্রকাশ করবার গুনটি বাঙালিদের কাছ থেকে নিত, তাহলে হয়ত আমাদের অনেক উন্নতি হত। কিন্তু আমাদের শিক্ষিত লোকেরা জ্বালানো আগুনের কাছাকাছি বসে শুধুমাত্র অন্যের দোষ দেখতেই ভালোবাসে। কাগজ-পত্রে কিছুই লেখে না।''

''যা দেখছি, এইভাবে আর বেশিদিন 'আসামবন্ধু' বের করা যাবে না। আগের বেরিয়ে যাওয়া দু -তিনটি সংখ্যার সমস্ত খরচ আপনি নিজে দিয়েছেন। এখন কয়েকজন লেখকের বাইরে আর কোনো গ্রাহকই পাওয়া যাবে না। এইভাবে একটি পত্রিকা বের করা যাবে কেন? তার ওপর লেখকদের সংখ্যাও আস্তে আস্তে কমে যাচ্ছে।''

ধর্মকান্তের গলায় ক্ষোপ আর হতাশা ফুটে উঠল। পত্রিকা বেরনো বন্ধ হয়ে গেলে তার যে অতি আপন কোনো একটা জিনিষ হারিয়ে যাবে সেরকমই মনে হচ্ছিল। এই পত্রিকাটির মাধ্যমেই সে লক্ষ্মীকে পেল। তারার মত একজন বন্ধু পেল আর 'বিল্বকুটীরে'র সবাইয়ের অফুরন্ত আদর - ভালোবাসা পেল। এখন 'আসাম বন্ধু' বন্ধ হয়ে গেলে তার সেইসব যোগসূত্র ছিন্ন হয়ে যাবে। লক্ষ্মীকে নিজের একান্ত আপন করে নিয়ে সে সেই সম্পর্কটা অন্ততঃ একটা জায়গায় চিরস্থায়ী করতে চাইল।

নগাঁও মতো ছোট্ট একটি শহরে কোন কথাই বেশি দিন গোপন থাকে না। লক্ষ্মী আর ধর্মকান্তের কথাটা গুয়াহাটীর লক্ষেশ্বরের কানে গিয়ে যখন পোঁছেছে, তখন পঞ্চানন শর্মার এতদিনে কথাটা নাজানা বড়ো আশ্চর্য্যের ব্যাপার বলতে হবে। ধর্মকান্তের সাক্ষাৎ তিনি 'বিল্বকুটীরে' বেশ কয়েকবার পেয়েছিলেন এবং ছেলেটির কথা-বার্তা আর গাম্ভীর্যপূর্ণ আচার - ব্যবহার তাঁর খুবই ভালো লেগেছিল। কিন্তু লক্ষ্মীর সঙ্গে তার কোনরকম সম্পর্ক গড়ে উঠতে পারে এ তিনি কল্পনাও করেননি। খবরটি একজনের মুখে শুনে তাই তিনি হতভম্ব হয়ে গেলেন। বাড়িতে গিয়ে তিনি স্ত্রী এবং কণ্যাকে শোওয়ার ঘরের ভিতরে ডেকে এনে দরোজা বন্ধ করে দিলেন। লক্ষ্মী বাবার চেহারা দেখেই ঘটনাটা কি হতে পারে তা আঁচ করতে পেরেছিল। সে বুঝতে পারল যে সত্যি কথাটা বললে মা-বাবা দুজনেই মর্মাহত হবেন। অথচ তাঁদের প্রবঞ্চনা করতেও তার একটু ইচ্ছে ছিল না। ধর্মকান্ত আর সে আগের দিন কলং এর পাড়ে বেড়াতে বেড়াতে সিদ্ধান্ত নিয়েছিল যে দুজনে পঞ্চানন শর্মার কাছে গিয়ে সবকথা জানিয়ে তাঁর আশীর্বাদ ভিক্ষা করবে। বিবাহ করবার সম্মতি তিনি যে দেবেন না এ তারা জানতই। কিন্তু চূড়ান্ত পদক্ষেপ নিয়ে বাড়ি থেকে চিরবিদায় নিয়ে বলে যাওয়ার আগে লক্ষ্মী একটু সময় নেবে বলে ভেবেছিল। কিন্তু কোন একজন ''শুভাকাক্ষী'' তা হতে দিলেন না। লক্ষ্মী একটি বড় দীর্ঘশ্বাস নিয়ে মা - বাবার সামনে স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিল যে সে আর ধর্মকান্ত বিয়ে করবে বলে মনস্থ করেছে। পঞ্চানন শর্মা আর তাঁর পত্নী কিছুক্ষণ বজ্রাহতর মতো স্থির নিশ্চল হয়ে রইলেন। এরকম একটা

অসম্ভব কান্ড করার সাহস লক্ষ্মী কোথা থেকে পেল। পঞ্চানন শর্মা মেয়ের মুখখানি দেখলেন। সেই স্কুলে যাওয়ার জন্যে জেদধরা মুখ। চোখদুটি যদিও মাটির দিকে, তবুও সেই দৃষ্টিতে নেই কোন সংশয় তা তিনি ভালোভাবে বুঝতে পেরেছিলেন। তবুও নিজের কতৃত্ব প্রকাশ করবার একটা ক্ষীণ চেষ্টা তিনি করলেন —

"কোন বিধান অনুযায়ী তোমরা বিয়ে করতে চলেছ? হিন্দুধর্মে অসবর্ণ বিবাহ হতে পারে না। অবশ্য ছেলে উচ্চবর্ণের এবং মেয়ে নীচুবর্ণের হলে তা চলতে পারে। কিন্তু তোমাদের ক্ষেত্রে তো তা উল্টো। তারপর বিধবা - বিবাহ আমাদের এখানে এখনো চালু হয়নি। কেউই মানে না। সুতরাং এরকম বিয়ে অসম্ভব।"

লক্ষ্মী বাবার কথার মধ্যে ক্রোধের চেয়ে ও এক অসহায় ভাবই লক্ষ্য করল — যেন ব্যাপারটা অসম্ভব না হলে তাঁর খারাপ লাগত না। সে বাবাকে বুঝতে পারল। তার প্রতি তাঁর স্নেহ আর সমাজের বিধিনিষেধের মাঝখানে একধরণের দ্বন্দ্ব তাঁর মনে অহরহ চলছে। এতদিন পিতৃস্নেহের জয় হয়ে আসছিল। কিন্তু এখন আর কি তা সম্ভব হবে?

লক্ষ্মী বাবার প্রশ্নের উত্তরে দৃঢ়ভাবে বলল —

" বাবা, আমরা ব্রাহ্মধর্ম মতে বিয়ে করব। তাতে সেইরকম বাধা - নিষেধ নেই।

"নিজের ধর্ম পরিত্যাগ করতে পারবি? ধর্মের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের সমাজ ও ত্যাগ করতে হবে। বিপদে - আপদে তোদের পাশে কেউ থাকবে না।"

"ব্রাহ্মধর্ম অন্য আলাদা ধর্ম নয় বাবা। হিন্দু ধর্মেরই একটি রূপ। নিয়মকানুন একটু অন্যধরণের বলে লোকে খ্রীস্টান বলে মনে করে। আর সমাজ আমাদের ত্যাগ করলেও সমাজের মঙ্গলের জন্যে আমরা সবসময়ই কাজ করে যাবো। একদিন না একদিন সমাজ আবার আমাদের আপন করে নেবে।"

পঞ্চানন শর্মা নিঃশাষ ফেলে মাথা নাড়লেন মাত্র। লক্ষ্মীর মা ইতিমধ্যে ফুঁপিয়ে কেঁদে কেঁদে বলছিলেন "ওরে, হাকিম বরুয়া মশাইই যে তোর মাথাটা খেয়েছেন। এইসব লোকজনের বাড়িতে যাতায়াত করতে কী দরকার ছিল বল্?

মায়ের অবস্থা দেখে লক্ষ্মীর খুব দুঃখ হল। তার হঠাৎ যেন মনে হল মা তার থেকে বয়সে অনেক ছোট। জীবনের যেসব কথা এই বয়সেই সে শিখে গেল, মা তার অর্ধেকও জানেন না। কোন কোন ক্ষেত্রে মা যেন ছোট শিশুর মতোই নেহাৎই ছেলেমানুষ। লক্ষ্মী মাকে জড়িয়ে ধরে তাঁর বাহুতে মাথা গুঁজে দিয়ে বল'ল —

"মা, হাকিম বরুয়ারা আমার কথা কিছুই জানেন না। তাদের মিছিমিছি দোষ দেবে না, মা। আমার ভাগ্যের জন্যে আমি নিজেই দায়ী। মা, তোমরা আমার জন্যে দুঃখ করবে না। মাত্র আর্শীবাদ কর, আমি যেন কখনো পাপ কাজ করে তোমাদের মনে দুঃখ না দিই।" শর্মা গিন্নী এই অদ্ভুত মেয়েটির কথা কিছুই বুঝতে পারলেন না। তিনি যেটা পাপ বলে ভাবছেন সে সেটা ভাবেই নি। তবু ও মেয়ের মাথায় হাতখানি একটু রেখে তিনি বিছানায় লুটিয়ে পড়ে কাঁদতে শুরু করলেন। পঞ্চানন শর্মাও আস্তে আস্তে ঘর থেকে বেরিয়ে গে'লেন।

মনের দুঃখ প্রকাশ করার জন্যে শর্মা গেলেন গুণাভিরামের কাছে। হাকিমমশাই এত বড় একটা কথা কেন তাঁকে আগে জানতে দিলেন না, শর্মা অভিযোগ করলেন। গুণাভিরাম সেইদিন অনেকক্ষণ মাথা নীচু করে রইলেন। তারপরে অপরাধী অপরাধী ভাবে বললেন—

"আজ্ঞে, আমার উচিত ছিল আগেই আপনাকে সাবধান করে দেওয়া। ব্যাপারটা আমি আগেই লক্ষ্য করেছিলাম। কিন্তু এটা এতদূর গড়াবে বলে আমি ভাবিনি। ধর্মকান্ত এ ব্যাপারে আমাকে আগে বলেনি। আমি ও অবশ্য জিজ্ঞেস করিনি। আসলে স্বর্ণর বিয়ের কথাটা আজ অনেকদিন থেকেই আমাকে এত চিন্তার মধ্যে ফেলেছে যে অন্যকথা ভাববার সময় আমি পাইনি। তার বিবাহ সম্প্রতি স্থির হয়েছে, ঢাকানিবাসী নন্দকুমার রায় নামের একজন বিলেতফেরৎ ডাক্তারের সঙ্গে।"

"আপনি খুবই ভাগ্যবান পিতা, এরকম একজন সুপাত্রের সঙ্গে মেয়ের বিবাহ স্থির করেছেন। আমার মতো দুর্ভাগা মানুষ এই জগতে কে আছে?"—শর্মা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন।

"কার ভাগ্যে কি লেখা আছে কেউই বলতে পারে না শর্মা। ধর্মকান্ত ব্রাহ্মণ না হতে পারে। কিন্তু ভালো ঘরের ছেলে। তার মতো বুদ্ধিমান এবং সৎ চরিত্রের ছেলে দ্বিতীয় আছে বলে আমার বিশ্বাস হয় না। কজন ছেলে বিধবা মেয়ে বিয়ে করতে সাহসী হবে? বঙ্গদেশেও এরকম ছেলে পাওয়া শক্ত। আমার বিশ্বাস যদি তারা দুজনে সৎভাবে সংসার পাততে পারে তাহলে আমাদের আনন্দিত হওয়া উচিত। হিন্দু শাস্ত্রে বিধবা - বিবাহে নিষেধ নেই। পরাশর মুনি এরকম বিবাহ সমর্থণ করেছেন। নাহলে আর বিদ্যাসাগর মহাশয় শাস্ত্রের বচন মতে বিধবা বিবাহের সপক্ষে এত শক্তিশালী যুক্তি তুলে ধরতে পারতেন কি? আমি আপনাকে একসময় বিদ্যাসাগরের লেখা একখানি বই পড়তে দিয়েছিলাম না?"

"হ্যাঁ। নামটা ছিল, 'বিধবা - বিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কিনা'? বইটি আমি পড়েছি। পড়ার সময় কথাগুলি এক্কেবারে সত্যি বলে মনে হয়েছিল। কিন্তু আমাদের সমাজকে এসব কথা কে বোঝাবে? লক্ষ্মী আমার ধর্মত্যাগ করে ব্রাহ্ম হলে গোটা সমাজ তোলপাড় হয়ে যাবে। আমাকে একঘরে করবে।"

গুণাভিরাম কিছুক্ষণ চুপচাপ রইলেন। শর্মা ঠিকই বলেছেন। নৈষ্ঠিক ব্রাহ্মণ সমাজের কাছে - ব্রাহ্ম আর খ্রীস্টানের মাঝে কোন পার্থক্য নেই। ব্রাহ্মরা অখাদ্য জিনিস খায় এবং জাতের বাচ - বিচার করে না বলে দুর্নাম আছে। তার ওপরে তাঁর মতো বিধবা বিবাহ করা সমাজবিপ্লবী ও ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে আছে। অতএব সরকারী কাজ থেকে অবসর নেওয়ার পরে একঘরে হওয়ার আশঙ্কা তাঁর নিজের ও যে একবারে নেই তাও ঠিক নয়। তবুও পঞ্চানন শর্মাকে আশ্বাস দিয়ে তিনি বললেন —

"ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করতে হলে হিন্দুধর্ম পরিত্যাগ না করলে ও চলবে। ব্রাহ্মরা হিন্দুদের আদি, পবিত্র, বৈদিক - ধর্ম গ্রহণ করেছে। তাই সেই দিক থেকে আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন

লক্ষ্মী আর ধর্মকান্ত অধর্মের মাঝে আশ্রয় খুঁজছে না। আর আপনি যে কথা নিজে শুদ্ধ বলে বিশ্বাস করেন তার জন্যে সমাজের রোষ কখনো বা হয়ত সহ্য করতে ও হতে পারে। ভয় করবেন না। আপনাকে অন্যেরা একঘরে করলে ও আমরা করব না।"

শেষের কথাগুলি গুণাভিরাম একটু হালকা সুরে বললেন। শর্মা ও হাসতে চেষ্টা করলেন। তাঁর মনটাও একটু হাল্‌কা হাল্‌কা লাগল। কিন্তু অন্য এক খুঁত-খুতুঁনি তাঁর মনে থেকে গেল বলে তিনি জিজ্ঞেস করলেন —

"ব্রাহ্মসমাজ কি অসবর্ণ বিবাহ স্বীকার করে?"

"মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ প্রমুখ 'আদি - ব্রাহ্মসমাজ' এর লোকেরা এরকম বিয়ে মেনে নেয় না। আমিও এতদিন সেই মতই মেনে এসেছিলাম। কিন্তু কেশবচন্দ্র সেন প্রথমে এক অসবর্ণ বিবাহ দিয়ে ব্রাহ্মসমাজে তোলপাড় লাগিয়ে দেবার পরে আজ - কলকাতায় 'সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের' সভ্যদের মধ্যে সেরকম বিয়ে বেশ কয়েকটা হয়েছে। আমার বন্ধুদের মধ্যে ও অনেকেই এরকম বিয়ে মেনে নিয়েছেন।"

"কিন্তু লক্ষ্মীদের বিবাহটি আপনি মেনে নেবেন তো?" শর্মার সোজাসুজি প্রশ্নটির উত্তর দিতে গুণাভিরামের অসুবিধে হল। তিনি সে বিষয়ে প্রস্তুত ছিলেন না। অল্পভেবে তিনি বললেন —

"পরিস্থিতি মানুষের চিন্তা - ভাবনার পরিবর্তন করে। লক্ষ্মী এবং ধর্মকান্ত দুজনকেই আমি খুব স্নেহ করি। তাই তাদের সঙ্গে মতের অমিল হলে ও আমি তাদের আমার অন্তর থেকে আর্শীবাদ করব।"

তেরো

নগাঁওর ব্যাপ্টিস্ট মিশনের চৌহদ্দীর সচরাচর শান্ত পরিবেশের মাঝে হঠাৎ এক উচ্ছল আনন্দের পরিবেশের সৃষ্টি হল। মিশনের কর্ম-কর্তাদের মাঝে এক নতুন ধরণের ব্যস্ততা আর তৎপরতা দেখা দিল। প্রতিদিনই মিশনে ছোট-খাট একটি সভা বসত যাতে আগামী সোনালী জয়ন্তী উৎসবটি সার্থকভাবে পালন করার সম্পর্কে আলোচনা আর পরিকল্পনা করা হয়েছিল। পঞ্চাশ বছর আগে নাথান ব্রাউন আর অলিভার কাট্রার সাহেবের পরিবার কটি প্রথম আসামে এসে অশেষ দুঃখ-কষ্ট সহ্য করে প্রথম খ্রীস্টান ধর্ম প্রচারের যে পথ অনুসরণ করেছিলেন তারাই সশ্রদ্ধা স্মৃতিচারণ এই জুবিলি উৎসব নগাঁওতে করার আয়োজন করা হয়। সমগ্র পূর্ব ভারতের মিশনারীরা এই উপলক্ষে নগাঁওতে এসে নিজের নিজের কাজ - কর্মের হিসেবনিকেশ দেওয়া নেওয়ার পরিকল্পনা করেছিলেন। উৎসবটি আয়োজন করার অন্য একটি উদ্দেশ্যও ছিল। অসমের ভৈয়াম পর্বতের কোণে-কোণে যে সব খ্রীস্টান কর্মী অক্লান্তভাবে শিক্ষাদান আর ধর্মপ্রচারের কাজ একক ভাবেই করে গিয়েছিলেন

তাঁদের দুদিনের জন্য একত্র করে মিশনের ভ্রাতৃত্ববোধ আরও বেশি সফল করার উদ্দেশ্য ও এই আয়োজনের মধ্যে নিহিত ছিল।

তারা জুবিলি উৎসবের কথা প্রথম শুনতে পেল ''যুবক বন্ধুদের বুধবারের সভাতে।'' এই সভাটি মিশন বাংলোতে প্রতিসপ্তাহে একবার করে করা হত। কোন একজন তরুণ বা তরুণী বাইবেলের একটি বিশেষ ঘটনা তুলে ধরত। তার ওপরে সকলে যে যার নিজের মতামত ব্যক্ত করে। শেষে সভায় উপস্থিত থাকা প্যাস্টর বা যে-কোনো একজন পাদ্রী সাহেব উপাখ্যানটির প্রকৃত গুরুত্ব সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করতেন। সেইদিন তারা মেরী মডলেইনের জীবনকাহিনী পড়ে শুনিয়েছিল। মেরী কেমন করে নিজের পবিত্র অশ্রু দিয়ে যীশুর চরণ দুখানি ধুয়ে দিল সেই দৃশ্য বর্ণনা করতে করতে তারার গলারস্বর আবেগে রুদ্ধ হয়ে উঠল। ঘরে পঁচিশত্রিশ জন তরুণ-তরুণী ছিল। বেশির ভাগেরই বাড়ি নগাঁওর কাছাকাছি। দূরের অতিথির ভেতরে ছিল নগাঁও মিশনে কয়েকদিনের জন্যে থাকতে আসা হেনরী টমাস নামের একজন যুবক। নামটি বিদেশী হলেও হেনরী প্রকৃত পক্ষে খাস অসমীয়া ঘরেরই ছেলে। তার আসল বাড়ি ছিল শিবসাগরে। ছোটবেলায় মা-বাবার দেওয়া নাম ছিল আহিনা। পরে শৈশবকালে মা-হারা আহিনাকে কেউ এসে শিবসাগরের মিশনে রেখে যায়। তারপর থেকে মিশনে বড়োসড়ো হয়ে সে খ্রীস্টান ধর্মে দীক্ষিত হল। পাদরীরা তার নতুন নামকরণ করলেন হেনরী টমাস। গারো পাহাড়ে বেশ কিছুদিন মিশনের কাজ করাবার পরে এখন তাকে নাগাপাহাড়ে পাঠানোর জন্যে মনোনীত করা হয়েছে।

নাগা পাহাড়ের আওদের সঙ্গে হেনরীর পরিচয় অনেক দিনের। শিবসাগর মিশনে থাকার সময় হেনরী চুবংমেরেং নামের একজন নাগা খ্রীস্টানকে প্রায়ই সঙ্গে পেত। চুবং মেরেং ছিল শিবসাগরের রেভারেন্ড ক্লার্ক সাহেবের বিশেষ প্রিয় পাত্র। তাঁর কাছেই হেনরী নাগাপাহাড় সম্পর্কে অনেক কথা শিখেছিল। হেনরী তখন স্কুলের ছাত্র। কিন্তু শিবসাগর মিশনের গধুলা দাদার সঙ্গে ধর্মপ্রচারের কাজে আর ও কয়েকবার নাগা পাহাড়ের ডেকা-হাইমঙে গিয়েছিল। গধুলা দাদা চমৎকার আও ভাষা বলতে পারতেন। তাঁর সঙ্গে থাকতে থাকতে হেনরীও আও ভাষা শিখে নিয়েছিল। কিন্তু অনেক দিন গারো পাহাড়ে থেকে সে অনেক কথা ভুলেই গিয়েছিল। বাল্যের স্মৃতি তাকে প্রায়ই নাগা পাহাড়ের দিকে টানত। একসময়ে তার ইচ্ছে ছিল আওদের মাঝখানে সে তার মিশনারী জীবন আরম্ভ করবে। কিন্তু মিশন কতৃপক্ষের তার সম্পর্কে অন্য পরিকল্পনা ছিল। তাই সে যা ভাবল তা হল না। ক্লার্ক সাহেব পরে যখন ডেকা-হাইমঙে নতুন মিশন স্থাপন করলেন তখন তিনি হেনরীকে ডেকে পাঠালেন। প্রথমে তুরার মিশন হেনরীকে ছাড়তে চায়নি। পরে অবশ্য জুবিলি উৎসবের আগে তাঁরা ক্লার্ক সাহেবের সঙ্গে দেখা করার জন্যে তাকে নগাঁও পাঠালেন। নতুন মিশনে যাওয়ার আগে হেনরীর শিবসাগরে কয়েক দিন জিরিয়ে নেবার ইচ্ছে হয়েছিল। কিন্তু জুবিলি উৎসবে আর আসা হবে না ভেবে শেষকালে নগাঁওতে দুদিন

থাকবে বলে স্থির করল।

মিশনে আসার আগের জীবনের কথা হেনরীর মনে পড়ে না। মাঝে মাঝে তার ধারণা হয় হয়তো তার বাবার মাটি বাড়ি একটু কিছু ছিল, সেটুকু থেকে বঞ্চিত করার জন্যেই কোনো নিজের লোক তাকে মিশনে রেখে গিয়েছিল। নাহলে তাকে বড়ো করে তোলার জন্যে গ্রামের একটি লোককেও কি খুঁজে পাওয়া যেত না? শিবসাগর মিশনে তার প্রথম স্মৃতির দিনটি থেকেই পাদরী সাহেব-মেমেরা তাকে খুবই স্নেহ করতেন। ছোট থেকে তাকে মিশনের কাজ-কর্ম করার জন্যেই গড়ে তোলা হয়েছিল। সেও কোনদিন ভাবেনি যে পৃথিবীতে তার জন্যে আর অন্য কোন কাজ থাকতে পারে। সাহেব-মেমদের সন্তুষ্ট করার জন্যেই যেন তার জন্ম হয়েছিল। আর এঁদের অবাধ্য হওয়াটাই যেন তার কাছে ছিল সবচেয়ে বড় অপরাধ।

সবসময় সাহেব-মেমদের সঙ্গে থাকার জন্যেই হয়ত হেনরীর কথা-বার্তা পোষাক পরিচ্ছদ সবেতেই এক অত্যন্ত পরিপাটি আর শৃঙ্খলাবোধের ভাব ফুটে উঠত। ছোটবেলা থেকেই হেনরী নিজের স্বাভাবিক প্রকৃতিকে দমন করে 'ভদ্র' বা 'ভালো'-ছেলে হতে শিখেছিল। যে সময়ে তার সমবয়সী ছেলের একটু করে গামছা পরে কাদাতে মল্ল-যুদ্ধ করে পুকুরে ঝাঁপ দিয়ে স্নান করত বা গাছে উঠে কাঁচা আম পেড়ে খেত সে সময়ে হেনরী পরিস্কার হাফ-প্যান্ট সার্ট পরে গীর্জাতে প্রার্থনা করত বা স্কুলে যেত। মিশনের বাইরের জগতের সঙ্গে হেনরীর বিশেষ পরিচয় ছিল না। ছোট অবস্থায় কখনো কখনো সে অসমীয়া গৃহস্থ লোকের বাড়ির সামনের বাঁশের গেটের মুখে দাঁড়িয়ে অনেকক্ষণ ধরে তাকিয়ে থাকত। সাংসারিক জীবনের সাধার দৃশ্য-গুলিও তাকে অদ্ভুতভাবে আকর্ষণ করত-যেন দূর থেকে আসা চেনা সুর একটা সে শুনতে পেয়েছে। কিন্তু ভেতরে গিয়ে কথা-বার্তা বলবার সাহস তার ছিল না। মিশনের অভিভাবকেরা তাকে তাঁদের অনুমতি ছাড়া খ্রীস্টান ব্যতীত অন্যকোনো লোকের বাড়িতে যেতে নিষেধ করেছিলেন। সুতরাং তার কাছে সেই জগৎ নিষিদ্বই ছিল।

হেনরী যখন গারো পাহাড় থেকে নগাঁও মিশনে এল তখন সেখানে জুবিলি উৎসবের প্রস্তুতি পুরোদমে চলছে। মিশনের তত্ত্বাবধানে থাকা রেভারেন্ড মূর আর তাঁর স্ত্রী হেনরীকে অসমীয়া ধর্মসংগীত পরিচালনার ভার দিলেন। এই কাজে তাকে সাহায্য করল তারা। প্রথমে হেনরী একটু ইতস্ততঃ করছিল, কারণ দুদিনের জন্যে এসে একটি নতুন জায়গাতে এত বড় দায়িত্ব নিতে সে রাজি হয়নি। কিন্তু তারার কর্ম তৎপরতা আর সব কাজ সুচারুভাবে পরিচালনা করার দক্ষতা দেখে সে অবাক্ই হল এবং তার শ্রমের ও কিছুটা লাঘব হল। নগাঁও আসার পরে তার মন নানারকম চিন্তায় এলোমেলো হয়েছিল। কোনো কাজেই সে পুরোপুরি মন দিতে পারছিল না। তারার সঙ্গে সঙ্গে থেকে এটা ওটা নির্দেশ দিতে পেরে হেনরী আশ্চর্য ধরণের হাল্কা ভাব একটা অনুভব করছিল। প্রথম দিন থেকেই তারাকে তার ভালো লেগেছিল। তার ব্যস্ততা, কর্মনিষ্ঠা আর আত্মবিশ্বাস সবকটা গুণই

তাকে মোহিত করল। তার মতো স্বল্পভাষী, গম্ভীর একটি মানুষ তারার সঙ্গে সঙ্গে থেকে খোলাখুলিভাবে হাসতে আর কথা বলতে সুরু করল। নিজের এই পরিবর্তনে হেনরী নিজেই অবাক হয়ে গেল।

আসলে হেনরীর মনে কিছুদিন থেকেই একটা পরিবর্তনের ভাব আসছিল। এতদিন তার জগৎটি ছিল অতি সংকীর্ণ এবং পরিপাটি। সন্দেহ, সংশয়, দ্বিধাভাব এসব তার মনে শিকড় গাড়তে পারেনি। তার সব প্রশ্নের উত্তর সে পাদ্রীসাহেব - মেমদের কাছে থেকেই জেনেছিল আর যে গুলোর সঠিক উত্তর তাঁরা দিতে পারেন নি, সেইসব প্রশ্ন তার মনে কচিৎ কখনো এলেও সেগুলোকে সে প্রশ্রয় দেয়নি। ছোট থেকেই শিখেছিল যে ধর্মের ক্ষেত্রে নির্বিবাদে বিশ্বাস করাটাই প্রকৃতভক্তের চিহ্ন।

কিন্তু এবার চিলামারীতে উজান-মুখী জাহাজটিতে পা দেবার পরক্ষণেই যেন তার পায়েরতলার পৃথিবীটা একটু টলমল করে উঠল। এক-অচেনা বাতাস যেন তার সযত্নে আচড়ানো চুলগুলিকে এলো-মেলো করে দিল। অথচ জাহাজে পা দেবার আগের মুহূর্ত পর্যন্ত সে একবারও ভাবেনি যে পৃথিবীতে এতরকম পরিবর্তনের স্রোত বইতে শুরু করেছে। হেনরীকে মিশনারী বলে জেনেই জাহাজে থাকা বিশেষ কেবিনটার একটাতে জায়গা দেওয়া হয়েছিল। কেবিনের অন্যযাত্রী ছিলেন একজন বাঙালী ভদ্রলোক। হেনরী কেবিনের ভেতরে ঢোকবার সঙ্গে সঙ্গে ভদ্রলোকটি স্বগতোক্তি করার মতো বললেন- ''থ্যাঙ্ক্ গড।'' হেনরী চিরাচরিত অভ্যেস অনুসারে আস্তে করে বলে ফেলল ''আ - মেন।'' তারপরে সে জিনিষপত্রগুলি ঠিক করে গুছিয়ে রাখতে লাগল। অচেনা লোকের সঙ্গে আগ বাড়িয়ে কথা বলতে হেনরী সবসময়ই ইতস্ততঃ বোধ করে। বাঙালী ভদ্রলোকটি কিন্তু বেশ খোলামেলা প্রকৃতির। তিনি নিজে এগিযে এসে হেনরীর সঙ্গে করমর্দন করে নিজের পরিচয় দিলেন —

''আমি রাজনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়। কলিকাতার জেনারেল এসেমব্লী কলেজে শিক্ষকতা করি। আপনার নামটা শুনে প্রথমে ভয়ই খেয়েছিলাম। ফিরিঙ্গীর সঙ্গে একই কেবিনে যাত্রা করা কি রকম অসুবিধে বুঝেছেন তো? আপনাকে পেয়ে ভালো লাগল। আপনি কোথায় যাবেন?''

''শিলঘাট। আর আপনি?''

''আমি গুয়াহাটীতে নামব। সেখানে আমার ভাই সরকারী চাকরী করে। বহুদিন থেকে সে ডাকছে। ভাবলাম, মা কামাখ্যা এবার দর্শণ করে আসি। আপনি তো খ্রীস্টান। নাহলে আপনাকে জিজ্ঞেস করতাম যে গুয়াহাটীতে আর কি কি মঠমন্দির আছে।''-চট্টোপাধ্যায় হেসে হেসে বললেন।

হেনরী কোনো উত্তর দিল না, শুধু একটু মুচকি হাসল। চট্টোপাধ্যায় তাঁর পুঁটলি থেকে কড়াপাকের সন্দেশ কয়েকটি নিয়ে হেনরীর দিকে বাড়িয়ে দিলেন-

''খান আপনাদের চিলামারীতে এত সুন্দর মিষ্টি পাওয়া যায় জানা ছিল না।''

হেনরী একটু ইতস্ততঃ করে একটা মিষ্টি তুলে নিয়ে ভদ্রলোককে সবিনয়ে ধন্যবাদ জানাল। চট্টোপাধ্যায় মিষ্টি একটা মুখে দিয়ে গেলাস থেকে দুঢোক জল খেয়ে সন্তোষের হাসি হেসে বললেন —

"মিস্টার টমাস, আপনি কোথাকার লোক?"

"আমি অসমেরই।"

"আপনার মাতৃভাষা অসমীয়া নাকি? আপনি তো তাহলে বাংলা ও বলতে পারেন? দুটি ভাষাই প্রায় এক বলে শুনেছি।"

এতক্ষণ কথাবার্তা সবই ইংরেজীতে হচ্ছিল। কিন্তু চট্টোপাধ্যায় শেষের কথাগুলি বাংলাতে বললেন। হেনরী বাংলা ভালো করে বলতে পারতেন না। তাই ইংরেজীতেই আবার উত্তর দিল —

"দেখতে একইরকম লাগলেও কিন্তু ভাষাদুটির মধ্যে যথেষ্ট অমিল আছে। আমি বাংলা ভালোভাবে বুঝতে পারি। কিন্তু বলতে পারি না। আপনি আমার সঙ্গে বাংলাতেই কথা বলতে পারেন। আমি যেরকম পারি বলব।"

এরপরে দুজনের মধ্যে একদিক থেকে সড়গড় বাংলা আর অন্যদিক থেকে অসমীয়া বাংলা ইংরাজী মিশ্রিত ভাষায় অনেক কথাবার্তা হল। সাধারণত যাতায়তের সময় অচেনা লোকের সঙ্গে হেনরী কথা বলে না। চট্টোপাধ্যায়ের ব্যবহার এত মধুর ছিল যে অল্পসময়ের মধ্যে তিনি হেনরীর সঙ্গে আন্তরিকভাবে কথা বলতে শুরু করলেন। হেনরী ও আস্তে আস্তে নিজের স্বাভাবিক গাম্ভীর্য পরিত্যাগ করে নিজের কাজ কর্ম সম্পর্কে দু - একটা কথা বলতে শুরু করল। চট্টোপাধ্যায় হেনরীকে গারো পাহাড়ে ধর্মপ্রচারের অভিজ্ঞতার বিষয়ে দু - একটা প্রশ্ন করে এবার হঠাৎ জিজ্ঞেস করে ফেললেন —

"আচ্ছা, মিঃ টমাস্, আপনি ধর্মপ্রচারের সময় লোকদের কেন খ্রীস্টান ধর্ম গ্রহণ করতে বলেন?"

"কারণ এই বিশুদ্ধ ধর্মই মানুষকে পরিত্রাণের পথ দেখিয়ে দেয়।" — হেনরী চট্‌পট্‌ উত্তর দিল।

"অন্য কোনো ধর্মই সেরকম পথ দেখায় না নাকি?" চট্টোপাধ্যায় যেন কোনো ছাত্রের মৌখিক পরীক্ষা নিচ্ছেন — স্বরটা যেন সে রকমেরই ছিল।

হেনরী এতদিন নিজের অটল বিশ্বাসে সংশয় জন্মাতে পারে এরকম সবধরণের আলোচনা থেকে নিজেকে বাঁচানোর চেষ্টা করে এসেছে। অজ্ঞ লোকে ধর্ম সম্পর্কে যে কোনো কথা জিজ্ঞেস করলে তার উত্তর দিতে সে সবসময়ই প্রস্তুত। কিন্তু শিক্ষিত জ্ঞানী লোক তার ধর্মবিশ্বাস বিপন্ন করতে চাইলে সে কখনই প্রশ্রয় দেয় না। ফলে চট্টোপাধ্যায়ের উত্তরে সে দৃঢ়ভাবে বলল —

"আমি বিশ্বাস করি যে একমাত্র খ্রীস্টধর্মই মানুষকে মুক্তির পথ দেখাতে পারে।"

চট্টোপাধ্যায় কিছুক্ষণ মাথা নীচু করে রইলেন। হেনরী তার হাতে রাখা "পিল্‌ গ্রিমস্‌

প্রগ্রেস" এর পাতা উল্টোতে শুরু করল। ও বইটির অসমীয়া অনুবাদ ছেলেবেলা অরুনোদই তে পড়েছিল। এই ইংরেজীতে পড়ে বইটির আসল রস সে যেন উদ্ধার করতে পারছে। চট্টোপাধ্যায় জাহাজের রেলিং ধরে অনেকক্ষণ ব্রহ্মপুত্রের শোভা দেখতে লাগলেন। তারপরে তিনি হেনরীর বসে থাকা বেঞ্চটির প্রান্তে বসে গম্ভীর ভাবে বললেন—

"তখন আমার প্রশ্নটা শুনে আপনার নিশ্চয়ই খারাপ লাগল।" হেনরী আশ্চর্য হয়ে চট্টোপাধ্যায়ের মুখের দিকে তাকায়। ভদ্রলোক আবারও বললেন — "আমি কিন্তু আপনার ধর্মবিশ্বাসে সন্দেহ প্রকাশ করতে চাইনি। আপনার মতো ধর্মীয় কাজে সমর্পিত একজন মানুষকে হয়ত এ ধরণের প্রশ্ন জিজ্ঞেস করা আমার উচিত হয়নি। কিন্তু আজ থেকে বেশ কিছুদিন আগে আমি কলকাতায় একজন বড় সাধকের দেখা পেয়েছিলাম। তাঁর নাম শ্রীরামকৃষ্ণ। লোকেরা তাঁকে 'পাগল ঠাকুর' ও বলে থাকে। তাঁর কথাগুলি শোনার পর আমার মন ভীষণভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ছে। সেই কারণেই আপনাকে প্রশ্নটি জিজ্ঞেস করেছিলাম। রামকৃষ্ণই বলেছেন, "যত মত, তত পথ" অর্থাৎ একই ঈশ্বরকে পাওয়ার জন্যে আমরা একেকজন এক এক ধর্মের পথ নিই। কিন্তু শেষে সব পথই একজায়গায় গিয়ে শেষ হয়।

হেনরী বিস্ময়ে কথাগুলো শুনে গেল। "এই সাধক নিশ্চয়ই হিন্দু," — সে প্রশ্ন করল।

"হ্যাঁ। কিন্তু তিনি নাকি গীর্জা, মন্দির, মসজিদ সব জায়গায় প্রার্থনা করে দেখেছেন আর একই ফল পেয়েছেন। রামকৃষ্ণের দেখা পাওয়ার পর থেকে আমার ধারণা হয়েছে সকল ধর্মই সমান, সকলের লক্ষ্য একটাই।" কথাগুলি বলবার সময় মানুষটির চোখেমুখে এক দার্শনিক ভাব ফুটে উঠল। হেনরীর তাঁর সঙ্গে আর একটু সময় কথা বলবার ইচ্ছে হল। ছোট একটি ছেলের দেওয়ালের ফুটো দিয়ে নিষিদ্ধ জগৎ উঁকি মেরে দেখার মতোই হেনরী ও যেন মানুষটির সঙ্গে কথা বলবার সময় একটি বিচিত্র জগতের সন্ধান পেল। কিন্তু বেশিক্ষণ সেই স্বাদ নিতে পারল না। জাহাজ এর মধ্যেই গুয়াহাটীর কাছাকাছি পৌছেছে। চট্টোপাধ্যায় দূর থেকেই নীলাচল পাহাড়ের দিকে তাকিয়ে দুহাত তুলে প্রণাম জানালেন। তারপরে নিজের জিনিষপত্র সামলানোতে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন।

কলকাতা থেকে আসা অনেক যাত্রী গুয়াহাটিতে নেমে গেল। পূর্বদিকের যাত্রীরা পরের দিন সকালে জাহাজে উঠবে। হেনরী রাতটা কাটাবার জন্যে জাহাজ ঘাটের কাছেই গুয়াহাটি ব্যাপ্টিস্ট মিশনে পৌছল। তাতে সে পুরনো চেনাশোনা কজন মানুষের দেখা পেল। শিবসাগর থেকে তুরাতে যাওয়ার পথে সে সবসময় গুয়াহাটীতে দুরাত কাটিয়ে যায়। সেখানে অসমের বিভিন্ন জায়গায় মিশনারীদের সমাগম হয়ে থাকে। যদিও মিশনারীদের কাজ-কর্মের মুখ্যকেন্দ্র শিবসাগরের পরেই হয়ে উঠেছিল নগাঁও, তথাপি যাতায়াতের সুবিধার জন্যে গুয়াহাটীর গুরুত্ব কম ছিল না। নগাঁওর বেশ কয়েকজন নিষ্ঠাবান কর্মীকে গুয়াহাটীতে পাঠানো হয়েছিল আবার গুয়াহাটী থেকেও পাদ্রীরা নগাঁও তে

গিয়েছিলেন। নগাঁও কান্দুরা নামের দেশীয় কর্মীর পত্নীকে গুয়াহাটীর স্কুল সুন্দরভাবে চালাতে দেখে হেনরী অবাক্ হয়ে গেল। এর আগে সেই স্কুলে মিসেস্ ডেনফোর্থ, মিসেস ওরার্ড, মিসেস্ স্কট ইত্যাদি বিদেশী মহিলারাই চালিয়েছিলেন।

হেনরী এবার গিয়ে দেখে মিশনের সবাই জুবিলি উৎসবের জন্যে প্রচন্ড উদ্যমে কাজ-কর্ম করছে। রেভারেন্ড বার্‌ডেট গুয়াহাটি মিশনের কাজ-কর্মের একটি রিপোর্ট লেখায় ব্যস্ত। তিনি সেইটি নগাঁওর জুবিলি কনফারেন্সে পড়বেন। চারদিকের এই ব্যস্ততার মাঝখানে হেনরীর হঠাৎ নিজেকে যেন বড় নিঃসঙ্গ মনে হতে লাগল। তুরার মিশনটাকে তার আপন মনে করার সঙ্গে সঙ্গেই আবার নাগা পাহাড়ের নতুন জীবন। শিবসাগরে তার আগের পরিচিত লোকজনকে আর পাওয়া গেল না। অবশ্য মিশনারী হিসাবে যেখানেই থাকুক সেটাকেই নিজের বাসস্থান বলে তাকে ভাবতে শেখানো হয়েছে। কিন্তু সেইদিন গুয়াহাটিতে তার মন যেন বড্ড ভেঙে পড়েছিল। রাত্রে শোবার পরে তার চট্টোপাধ্যায়ের কথাগুলি মনে পড়ল। সত্যিকরেই সে যে সব মানুষকে একদিন অধর্মী বলে ভেবে এসেছিল তাঁদের মাঝে ও শুদ্ধ পথে যাওয়া লোক আছে? সব ধর্মের লক্ষ্য যদি একই হয়, তাহলে অন্যধর্মগুলির বিষয়ে জানতে কোনো আপত্তি নেই। এসব ভাবতে ভাবতে ভাবতে অনেকক্ষণ তার ঘুম এলো না।

পরেরদিন সকালে উঠতে তার দেরি হল। তাড়াহুড়ো করে জাহাজঘাটে গিয়ে দেখে জাহাজ ছাড়তে দেরি নেই। হেনরী নিজের জিনিষপত্র জাহাজের কেবিনে রেখে গিয়েছিল। কিন্তু এসে দেখল যে কেউ সেগুলোকে বাইরে বের করে রেখেছে। একজন খালাসীকে জিজ্ঞেস করতে সে বলল যে গুয়াহাটী থেকে একজন সাহেব আর তাঁর মেম উঠেছেন। তাঁদের জন্যে কেবিনটা খালি করে দেওয়া হয়েছে। হেনরী যেন অন্য জায়গায় বসে যায়। হেনরী নিরুপায় হয়ে নিজের জিনিষপত্র তুলে নিয়ে নীচের তলায় ডেকের দ্বিতীয় শ্রেণীর যাত্রীদের সঙ্গে একটা বেঞ্চের ধার ঘেঁসে বসল। সামনের একটি বেঞ্চে ধর্মকান্ত বসেছিল। সে খালাসীর সঙ্গে হেনরীর কথোপকথন শোনেনি, যদিও ঘটনাটা অনুমান করতে পারছিল। হেনরীর নির্বিবাদে অন্যায়টাকে মেনে নেওয়া দেখে ধর্মকান্তর রাগ হল। হেনরী বসার সঙ্গে সঙ্গেই সে প্রশ্ন করল —

"আপনার হাতে তো প্রথম শ্রেণীর টিকিট! ওপরের কেবিনেই তো আপনার জায়গা পাওয়া উচিত।"

"হ্যাঁ। চিলামারী থেকে কেবিনেই এসেছিলাম। এখন সাহেব-মেম দম্পতীর জন্যে সেই সিটটা ছেড়ে দিতে হল। আমার অবশ্য কোন অসুবিধে হবে না। শিলঘাট মাত্র একদিনের রাস্তা।" — হেনরী সহজভাবে বলল।

"একদিনেরই হোক বা একঘন্টার রাস্তাই হোক, জায়গাটা আপনার এত সহজে ছেড়ে দেওয়া ঠিক হয়নি। আপনি আগে থেকেই সেই কেবিনের যাত্রী। জায়গা কম থাকা সত্ত্বেও সাহেব-মেমকে টিকিট দেওয়া অন্যায় হয়েছে।" উত্তেজনায় ধর্মকান্তর স্বর সামান্য

চড়ে গেল। হেনরী আবার শান্তভাবে হেসে বলল,

"কি করব, উপায় নেই। সাহেবদের অধিকার আমাদের চেয়ে বেশি।"

হঠাৎই ধর্মকান্তর সেই পুরনো রাগ মাথা চাড়া দিল। কাছের যাত্রীদের উদ্দেশ করে উচ্চকণ্ঠে বক্তৃতা করার সুরে সে বলতে শুরু করল —

"আমরা ভারতীয়রা এইভাবেই নিজেদের সব অধিকার ছেড়ে দিচ্ছি। আজ নিজের রেল - জাহাজের সিটটা, কাল বড় বাড়িটা, পরশু দেশটাকে বিদেশীর হাতে দিয়ে দেওয়াতেও আমাদের কুণ্ঠাবোধ নেই। আমাদের দেশে থেকেই সুযোগ-সুবিধা, ধন সম্পত্তি লুটে নিয়ে বিদেশীরা বড়লোক হল, তবুও আমরা নিজেদের অধিকার সম্পর্কে সজাগ নই। এরকমভাবে চললে একদিন সবাই সর্বস্বান্ত হব।"

ধর্মকান্তের কথা শুনে হেনরী অবাক্ হল। ভেতরে ভেতরে একটু ভয়ও পেল। এরকম কথা কারাও মুখে সে খোলাখুলিভাবে শোনেনি। সাদা সাহেব-মেমকে সবসময় সন্মানের চোখে দেখতে হয় হেনরী ছোট থেকে একথাই শিখেছিল। তার মতে তাঁদের মতো দয়ালু, গুনী, জ্ঞানীলোক এই জগতে আর নেই। ইংরেজ সাহেব দেশের ধন-সম্পদ লুটছে, এমন কথা সে কখনো ভাবেনি, আর অন্যে ও যে এরকম চিন্তা করতে পারে তাও তার কল্পনার অতীত ছিল। কিন্তু সেইদিন তার ভুল ভাঙল। ধর্মকান্তের কথার সমর্থনে কাছাকাছির দু-চারজন লোক ও মাথা ঝাঁকালেন। একজন ধর্মকান্তের দিকে তাকিয়ে বললেন,

"শুনছি, নাকি কলকাতা, বোম্বাই ইত্যাদি শহরগুলোতে আমাদের দেশের অনেক বিদ্বান মানুষ একসঙ্গে আমাদের দেশের মানুষদের অধিকার ছিনিয়ে নেবার জন্যে কি একটা কমিটি গঠন করেছে?"

"হ্যাঁ, বোম্বাইতে গেল বছর ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস নামে একটি সভার প্রতিষ্ঠা হয়েছে। এই বছর সেই সভা কলকাতাতে বসেছিল। আমাদের এখান থেকেও কিছু সংখ্যক সদস্য সেখানে গিয়েছিল। আস্তে আস্তে এই সভা গোটা দেশের জনগণের জন্যে কাজ করতে পারবে।" ধর্মকান্তের মন্তব্যগুলিতে বিশ্বাস আর উৎসাহ ফুটে উঠল। তার কথাগুলো শুনে কাছাকাছি বসা যাত্রী কজনের মনে একটা আশার ভাব সঞ্চারিত হল — যেন কিছু একটা পরিবর্তন আসছে। হেনরী প্রথমে কথাগুলি শুনে খুব অস্বস্তি অনুভব করছিল। তাকে কেন্দ্র করেই যে এই অবাঞ্ছিত আলোচনার সূত্রপাত সেই কথাটাই তাকে বেশি চিন্তিত করল। ইংরেজদের বিরুদ্ধে সে কোনদিন কোনো খারাপ মনোভাব পোষণ করেনি। কিন্তু ধর্মকান্তের কথা-বার্তা থেকে সে বুঝল যে অন্য ধরণের চিন্তা করার লোকও অনেক আছে। জাহাজের কেবিন থেকে বের করে দেবার জন্যে তার মনে যে রাগ বা অসন্তোষের উদয় হয়েছিল, এরকম হবে জানলে সে সহজেই তা হজম করে নিলে হত। কিন্তু সেদিন ধর্মকান্তই যে তার ভেতরে থাকা ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে তাকে সজাগ করে তুলল। নিজের প্রতিবাদ করার অক্ষমতার জন্যে সে নিজেকে ভীষণ অপমানিত বোধ করল।

চৌদ্দ

ধর্মকান্ত আর লক্ষ্মীপ্রিয়ার বিয়েটি নগাঁওতে এক আলোড়নের সৃষ্টি করল। বিধবা ব্রাহ্মণ মেয়ে একটির সঙ্গে কলিতা ছেলের বিয়ের খবরটিই যথেষ্ট চাঞ্চল্যকর। কিন্তু তার থেকেও চাঞ্চল্যকর খবরটি ছিল যে, বিয়ে হয়েছিল দুটি পরিবারবর্গের অনুপস্থিতিতে চারুশীলা দিদিমণির বাড়িতে। 'সাধারণ' ব্রাহ্মসমাজের 'নব-বিধান' অনুযায়ী বিয়েটি অনুষ্ঠিত হয়েছিল। ফলে হোম, সপ্তপদীগমন — এইসব কিছুই হয়নি। পরে অবশ্য আইনানুযায়ী বিয়েটি রেজিস্ট্রি করা হয়েছিল।

বিয়ের আগের দিনই লক্ষ্মীকে নেবার জন্যে চারুশীলা সেন এসেছিলেন। পঞ্চানন শর্মার বাড়ির পরিস্থিতি সেদিন কিরকম হয়েছিল তা সহজে বোঝানো যাবে না। মানুষ মরে গেলে ও একটি বাড়ির অবস্থা হয়ত সেরকম হয় না। লক্ষ্মীর কাকিমা আর বিধবা পিসী রান্নাঘরের ভাতের হাঁড়ি ইত্যাদি উঠোনে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে চীৎকার করে কান্না-কাটি করছিল। পঞ্চানন শর্মা ভোরবেলাই বাড়ি থেকে বেরিয়ে গিয়েছিলেন। তাঁর স্ত্রী কিছু না খেয়ে মাটিতে পড়ে কান্না - কাটি করে আকুলি-বিকুলি করেছিলেন। লক্ষ্মী যাওয়ার সময় মায়ের পা ছুঁয়ে প্রণাম করা ছাড়া আর কাউকেই কিছু বলে যায়নি। বাড়ির অন্যান্যদের সঙ্গে মা বাবাকে সে প্রকাশ্যে পরিত্যাগ করেছিল যদিও সে তাঁদের কথা বুঝতে পেরেছিল। মায়ের নিজস্ব কোনো মতামতই ছিল না। অন্যেরা যা বুঝিয়েছিল তাই গ্রহণ করেছিল। সেই কারণে মায়ের মনে কষ্ট দেওয়াতে তার নিজেকে খুব অপরাধী লাগছিল। বাবা অবশ্য তার কথা ভালো করে বুঝেছিলেন এবং হয়তো ভেতরে ভেতরে তাকে সমর্থন ও করেছিলেন। কিন্তু তার থেকে বেশি কিছু করা তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না। লক্ষ্মী বুঝতে পেরেছিল যে দেশাচার তাঁর হাত-পা বেঁধে রেখেছে।

গোরুর গাড়িতে উঠে লক্ষ্মী যখন চারুশীলা দিদিমণির বাড়ির দিকে যাচ্ছিল তখন তার ধারণা হয়েছিল যে অতীতটা আস্তে আস্তে পিছিয়ে যাচ্ছে। সেই অতীত কে সে ভুলে যেতে চেষ্টা করছিল। চোখের জল মুছে যখন গাড়ির সামনের দিকে সে মুখখানি ঘুরিয়ে নিল, তখন পথের দুই পাশের সবুজ ধানের ক্ষেত যেন তাকে হাতছানি দিয়ে তার নতুন ভবিষ্যৎকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছিল। লক্ষ্মী ধর্মকান্তের কথা ভাবছিল। যে মুক্তির সন্ধানে সে এতদিন হাভাতের মত ঘুরছিল সেই মুক্তির ধ্বজা যেন সেই বহন করে এনেছিল। তার অসীম আশা, উদ্দীপনা আর আদর্শবোধ দেখে লক্ষ্মীর বিশ্বাস হল যে পৃথিবীর পরিবর্তন আসতে শুরু করেছে। পুরনো সাজ ছেড়ে যেন নতুন সজ্জা পরিধান করেছে।

লক্ষ্মী ধর্মকান্তের বিয়েতে নগাঁওর সবকটি ব্রাহ্মপরিবার আসেন নি। গুণাভিরাম বরুয়া ও সেদিন উপস্থিত থাকতে পারেন নি। কোনো একটি কাজে মফঃস্বলে গিয়েছিলেন। ধর্মকান্তের একটু খারাপ লেগেছিল। তার ধারণা হল তাদের বিয়েতে বড়ুয়া মহাশয়ের বিশেষ উৎসাহ নেই। তিনি অবশ্য বিয়ের আগে তাদের অগ্রিম শুভেচ্ছা জানিয়েছিলেন।

কিন্তু সে অনুভব করেছিল যে তাঁর মনের কোথাও যেন একটু দ্বিধা থেকে গেছে। নাহলে তাঁর পত্নী অন্ততঃ নিশ্চয়ই বিয়েতে আসতেন। ধর্মকান্ত অবশ্য জানত না যে লক্ষ্মীর প্রথমবারের বিয়েতে বিষ্ণুপ্রিয়ার যে অভিজ্ঞতা হয়েছিল সে কথা ভুলতে পারেন নি বলেই এবার তিনি যাননি। ধর্মকান্ত ধরে নিল যে বিষ্ণুপ্রিয়া আর গুণাভিরাম পুরনো সংস্কারের বশে তার এবং লক্ষ্মীর বিবাহিত সম্পর্কটি মনে প্রাণে মেনে নিতে পারেন নি। ধর্মকান্ত বহু আগে থেকেই উপলব্ধি করেছিল যে গুণাভিরামের মতো একজন গুনী, জ্ঞাণী, সাহসী ব্যক্তির পক্ষেও সমাজের কিছু সংকীর্ণতা থেকে মুক্ত হওয়া অত্যন্ত কঠিন। এই দুর্বলতার জন্যে তাঁর যে বিবেকের দংশন হয়নি তাও নয়। ধর্মকান্ত তাঁদের কথা-বার্তার মধ্যে এক দ্বিধাদ্বন্দ্বের ভাব লক্ষ্য করেছিল বিশেষ করে ব্রাহ্মসমাজের ভেতরের মতানৈক্য গুলির ক্ষেত্রে। এই মানসিক দুর্বলতার জন্যে গুণাভিরামের প্রতি ধর্মকান্তের শ্রদ্ধা কমে যায়নি। গুণাভিরাম হলেন একটি যুগের প্রতীকস্বরূপ। যে সময়ে অসমে তাঁর কোন সতীর্থ ছিল না, সেই সময়ে একলাই তিনি গোঁড়াসমাজের বিরুদ্ধে লড়াই করেছিলেন। কিন্তু এখন ধর্মকান্তের পালা। তারাই বা কতদূর যেতে পারবে?

বিয়ের কয়েকদিন বাদেই লক্ষ্মী আর ধর্মকান্ত নগাঁও ছেড়ে ডিব্রুগড়ে যাওয়ার যোগাড়যন্ত্র করল। তপত্ জুরি বাগানের কাজটি ধর্মকান্ত বিয়ের আগেই ছেড়ে দিয়েছিল। বাগানের মালিকের সঙ্গে দিনের পর দিন তার যে মতানৈক্য বাড়ছিল তার ফলেই তাকে এই সিদ্বান্ত নিতে হয়েছিল। বাগানের শ্রমিকদের সঙ্গে তার মেলামেশা আর রাজনৈতিক কথাবার্তা বাগানের মালিক বরুয়ার অপছন্দ ছিল। অবশ্য বরুয়া খোলাখুলিভাবে তাকে কোনদিনই কিছু বলেন নি। কিন্তু পাকে প্রকারে তিনি ধর্মকান্তকে বোঝাতে চেষ্টা করেছিলেন যে শ্রমিকদের বেশি নাইদিলে তাদের শাসন করাটা পরে কঠিন হবে। সাহেবদের বাগানের 'চুক্তিবদ্ধ' কুলিদের চেয়ে তপ্তজুরির শ্রমিকদের অবস্থা ভালোই ছিল বলা যেতে পারে। অন্ততঃ তাদের সঙ্গে কোন গোলামের মত ব্যবহার করা হত না। কাছাকাছি গ্রাম থেকে এসে কাজ করে তারা রোজই আবার বাড়িতে ফিরে যেত। সাহেবদের বাগানের মতো কুলির 'লাইনে' থাকত না।

ধর্মকান্ত কাছাকাছি গ্রামগুলিতে গিয়ে কুলিদের মধ্যে সভা করেছিল। সাহেবরা কর ইত্যাদি বাড়ানোর জনগণের যে দুর্দশা তার কথা বুঝিয়ে বলেছিল। মণিরাম দেওয়ানের গানগুলি গেয়ে গ্রামের লোকদের চোখে জল এনেছিল। মণিরাম দেওয়ানের বঙাল (বিদেশী) তাড়াতে গিয়ে নিজের প্রাণ আহুতি দেওয়ার কথাও ছিল। এইসবেরই দু-একটা কথা তপত্জুরি বাগানের মালিকের কানে যাওয়ায় তিনি একদিন ধর্মকান্তকে বলেছিলেন —

"দেশের লোকের ভালো হোক এ চিন্তা আমিও করি, বুঝেছ। কিন্তু রাজদ্রোহের অপরাধে পড়তে চাই না।"

"আপনার ক্ষেত্রে রাজা কে, সেটাই আসল প্রশ্ন। আমার ক্ষেত্রে জনসাধারণই রাজা। সুতরাং আমি রাজদ্রোহ করছি না। বরং রাজসেবাই করছি।"

বরুয়া একটু সময় চুপচাপ থাকলেন। ধর্মকান্তের আর্দশকে তিনি সম্মান করতেন। কিন্তু এত কষ্ট করে নিজের হাতে গড়া বাগানের উন্নতির পথে বাধার সৃষ্টি করে এমন কোন পদক্ষেপ নিতে তিনি প্রস্তুত ছিলেন না। সেইজন্যে ধর্মকান্তকে ভালোভাবে বোঝানোর চেষ্টা করে তিনি বললেন,

"ধর্মকান্ত, তোমার কথা ঠিকও হতে পারে। কিন্তু আমার নিজের ব্যবসা আছে, ঘর-সংসার আছে। সরকারের অসন্তোষ সৃষ্টি করলে আমার অনিষ্ট হবে, তোমরাও হবে। আমি ভালো বুঝেই বলছি। তুমি এসব ছেড়ে নিজের কাজ করো। তোমার মতো একটি ভালো, শিক্ষিত ছেলের ধ্বংস আমি চাই না।"

ধর্মকান্ত বুঝেছিল যে দেবনাথ বরুয়ার সঙ্গে মিথ্যে তর্ক করে লাভ নেই। তাঁর আর তার নিজের দৃষ্টিকোন দুটি সম্পূর্ণ বিপরীত। অথচ সে জানত যে বরুয়া শুভাকাঙ্ক্ষী, শত্রু নন। তাঁর সঙ্গে আর বেশি মনোমালিণ্য বাড়াতে তার ইচ্ছে হ'ল না, সেইজন্যে হঠাৎই একদিন সে চাকরীতে ইস্তফা দিল। চিঠিখানি পেয়ে বরুয়া তাঁকে ডেকে এনে জিজ্ঞেস করলেন,

"তুমি যে যেতে চাইছ, কোথাও কোনো চাকরী ঠিক করলে নাকি?"

"ডিব্রুগড়ে থাকা আমার বন্ধু কৃষ্ণকান্ত কাকতি একটি ছোট প্রেস নিয়েছে। সেখান থেকে দুজনে মিলে একটি সংবাদ পত্র বের করব বলে ভাবছি।"

"অসমে কি সংবাদপত্র চলবে?" — বরুয়া বিস্ময়ে জিজ্ঞেস করলেন।

"কোন একজনকে তো চেষ্টা একদিন করতে হবেই। আমাদের দেশের মানুষদের সবসময় অজ্ঞানের অন্ধকারে থাকতে দেবো নাকি? সত্যি আর ভালো কথা লিখলে জনগণ নিশ্চয়ই পড়বে।" — ধর্মকান্ত দৃঢ় বিশ্বাসের সঙ্গে বলেছিল।

ধর্মকান্তের সিদ্ধান্তের কথা শুনে লক্ষ্মী প্রথমে একটু চিন্তায় পড়ল। দুটি প্রাণীর খেয়ে -দেয়ে বেঁচে থাকতে হলে অন্ততঃ একজনের তো কিছু একটা স্থায়ী সংস্থান দরকার। শুধু প্রেসের কাজে কি ভাত কাপড়ের সমস্যার সমাধান করা যাবে? সেই ভাবনা-চিন্তা করতে করতেই হঠাৎ একদিন একটা খবর পেল। ডিব্রুগড়ে থাকি মেয়েদের একটি নিম্ন প্রাইমারী স্কুল খোলা হয়েছে। তারজন্যে একজন ভালো শিক্ষয়িত্রী লাগবে। তাকে খবরটা দিলেন এম. ই. স্কুলের তার শিক্ষক অজয় গাঙ্গুলী মাস্টারমশাই। তাঁর সম্পর্কীয় একজন আত্মীয় সেই স্কুলটি স্থাপনের সঙ্গে যুক্ত। লক্ষ্মী সঙ্গে সঙ্গে ডিব্রুগড়ে চিঠি-লিখল, আর বিয়ের ঠিক আগে আগে উত্তর পেল। সে যদি কাজটি নিতে চায় তাহলে বসবাসের সব বন্দোবস্ত স্কুল কতৃপক্ষই করে দেবে। মাইনে মাসে দশ টাকা।

লক্ষ্মী খবরটি দিলে সে হেসে হেসে বলেছিল,

"বিয়ের পরে তার মানে তুমি ঘর বাঁধবে, আমি পুরুষ মৌমাছির মত তাতে ঢুকব।"

লক্ষ্মী কৌতুকের হাসি হেসে বলেছিল, "তখনই দেখব তুমি কর্মী মৌমাছি না অলস মৌমাছি।"

ধর্মকান্ত গম্ভীর হয়ে পড়ল। তার মনে লক্ষ্মীর প্রতি হঠাৎই এক দায়িত্ববোধ জেগে উঠল,

"জানো, আমার কাজ-কর্ম হয়তো তোমার অপ্রীতিকর ও হতে পারে। আমি তো আর অন্য লোকদের মতো ঘর-সংসার পেতে চিরস্থায়ী হয়ে বসতে পারব না।"

"তোমাকে কেই বা বসতে বলেছে?" — লক্ষ্মী হেসে হেসে বলল। "আমি ঘর-সংসার চালাব আর তুমি দেশের কাজ করবে। আমি তোমার কাজে বাধা হয়ে দাঁড়াব না।" ধর্মকান্ত লক্ষ্মীর একটি হাত নিজের হাতে তুলে নিয়ে মাত্র তার মুখখানির দিকে অল্প একটু তাকিয়ে রইল। তার দেওয়া প্রেরণা তার মনোবল দুগুণ বাড়িয়ে দিল।

ডিব্রুগড় রওনা হবার আগের দিন ধর্মকান্ত এবং লক্ষ্মী দুজনেই 'বিল্বকুটীর'— এ গেল। বিষ্ণুপ্রিয়া আর তিনটি ছেলে নগাঁওতে ফিরে আসার পরে 'বিল্বকুটীর' এ আবার যেন প্রাণ ফিরে এল। লক্ষ্মীরা গেটের মুখ থেকেই অনুভব করল যে বাড়িতে এক আনন্দমুখর পরিবেশ বিরাজ করছে। স্বর্ণর ভাই কমলা ঢোকার মুখে খবর দিল আগের দিন সন্ধেবেলা কলকাতা থেকে 'সোনামাদিদি' আর 'জামাইবাবু' এসেছেন। তাঁদের জন্যে বাবা সেই জন হাজো থেকে গানের দল আনিয়েছেন। ফলে তারা আর অপেক্ষা করতে পারছে না! "ছোকরা-ছুক্‌রী"রা কখন এসে পড়বে সেইজন্যে তারা পথ চেয়ে আছে। লক্ষ্মী জানে যে বরুয়া মশায়ের এসবে খুব সখ। নগাঁওতে হাজো বা দেবগাঁয়ের থেকে পার্টি এলেই তিনি যে কোনপ্রকারে একবার নিজের বাড়িতে আনবেনেই। আত্মীয়-স্বজন এবং বন্ধু-বান্ধবকে "গান" শোনার জন্যে নিমন্ত্রণ করবেন। পঞ্চানন শর্মা আগে এরকম নিমন্ত্রণ পেলে যেতেনই, না যাওয়ার প্রশ্নই ছিল না। কিন্তু ছেলেমেয়েদের নিতেন না। সেইজন্যে লক্ষ্মীর "গান" শোনার সৌভাগ্য হয় নি। অবশ্য পুতুলনাচ দেখাবার জন্যে ছোটবেলার বাবা একবার তাকে 'বিল্বকুটীর'-এ নিয়ে গিয়েছিলেন সেকথা মনে পড়ে।

ধর্মকান্ত বাড়িতে ঢুকতে প্রথমে একটু ইতস্ততঃ করল। অনিমন্ত্রিত হয়ে আসার জন্যে নয়। নগাঁওর অসমীয়া সমাজের মুখোমুখি হবার খুব একটা ইচ্ছে তার ছিল না। কেউ যদি লক্ষ্মীকে খারাপ কথা কিছু একটা বলে দেয়, তাহলে সে চুপ করে থাকতে পারবে না কি করব না করব ভাবতে ভাবতেই কমলা দৌড়ে গিয়ে ভিতরে খবর দিল আর প্রায় সঙ্গে সঙ্গে স্বর্ণ আর তারা বাইরে বেরিয়ে এল। বহুদিন পর দুই বান্ধবীকে দেখে লক্ষ্মী একটু থমকে গেল। দুজন কত বিপরীত। স্বর্ণকে বিয়ের পরে সে এই প্রথম দেখছে। তারার বিয়েতে অবশ্য সে গিয়েছিল, বাড়ির অমতে। তারা একই আছে, তার সাধারণ সাজগোজের মধ্যে এক অসাধারণ ব্যক্তিত্ব ফুটে উঠেছে! তারার তুলনায় স্বর্ণ যেন রূপ-লাবণ্য আর ঐশ্বর্য্যের প্রতীক। নীল বেনারসী শাড়িতে আর সোনার গয়নায় তার সৌন্দর্য দুগুণ বাড়িয়ে দিয়েছে। সেদিন স্বর্ণকে দেখে লক্ষ্মীর এরকম মনে হল যেন তার সমান সুখী আর কেউ নেই। হঠাৎ সে অনুভব করল যে তাদের দুজনের মধ্যে যেন এক বিরাট ব্যবধান এসে পড়েছে। হাকিমের মেয়ে, বেথুন স্কুলের ছাত্রী এবং "বিলেত ফেরৎ" ডাক্তারের

পত্নী স্বর্ণলতা আর মধ্যে সামাজিক ব্যবধান থাকাটাই স্বাভাবিক। কিন্তু স্বর্ণ যখন তাকে জাপটে ধরে এগিয়ে নিয়ে গেল, তখন তাদের মাঝখানের সব দূরত্ব ক্ষণিকের জন্যে দূরে সরে গেল।

ইতিমধ্যে গুণাভিরাম বরুয়া নিজে এগিয়ে এসে ধর্মকান্তকে ভেতরে ডেকে নিয়ে গেলেন আর স্বর্ণ তারা আর লক্ষ্মীর হাত দুটি ধরে দুজনকে বেলগাছ তলায় টেনে নিয়ে গেল।

''এই জায়গাটা আমার খুব ভালো লাগে জানো। লক্ষ্মী আর আমি এখানে কত যে রান্না-বাড়ি খেলেছি, মনে আছে, না?'' স্বর্ণ লক্ষ্মীকে জিজ্ঞেস করল।

''আছে তো,'' লক্ষ্মী গাছটির গায়ে হাত বুলোতে-বুলোতে বলল, ''এখানে আমরা কত হেসেছি, কেঁদেছি।''

''আর আমি ও স্বর্ণকে প্রথম দিন যখন এই গাছের তলায় খেলতে থাকা অবস্থায় দেখেছিলাম তখন ভেবেছিলাম, হাকিমের মেয়ের হয়তো খুব অহংকার।'' খিলখিল করে হাসল।

হঠাৎই তিনজন মেয়ে গম্ভীর হয়ে গেল। হয়তো সেইদিন সেইমুহূর্তে তাদের তিনজনের কাছে বেলগাছটি অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যতের মধ্যে যোগসূত্র হয়ে পড়েছিল। তাদের তিনজনেরই জীবনে কত পরিবর্তন এল। কিন্তু গাছটি একইরকম আছে। স্বর্ণ গাছটির দিকে তাকিয়ে দার্শনিকের মতো বলল,

''মানুষের কত পরিবর্তন হয়। কিন্তু গাছপালাগুলি দেখতে একই থাকে।''

''কিন্তু আসলে গাছপালার আমাদের চেয়েও বেশি পরিবর্তন হয়। বছরে বছরে নতুন পাতা গজায়,ফুল ফোটে, ফল ধরে, আবার খসে পড়ে।'' তারার কথা-বার্তায় কোনো জটিলতা নেই। সহজ সরল সাধারণ কথা।

''আচ্ছা, আজ থেকে দশবছর পরে আমরা যদি আবারও এই জায়গাটায় আসি, আমরা দেখব যে বুড়ো গাছটি একই জায়গায় স্থির হয়ে আছে। কিন্তু আমাদের কি হবে কে জানে?'' - লক্ষ্মীর গলায় এক উদাস সুর শোনা গেল। স্বর্ণ তার বাহু ধরে কথাটা উড়িয়ে দিয়ে বলল,

''আচ্ছা আমরা দশবছর পরের কথা এখন নাইবা ভাবলাম। আজ আমরা তিনজনে কতদিন পরে একসাথে মিলিত হয়েছি। আজ খুব হৈ চৈ করব বুঝলে। কাল লক্ষ্মী চলে যাবে তো। আমরা ও বেশিদিন থাকব না। আবার কবে দেখা হবে। চল গানের পার্টি এসে পড়ল। অনেকদিন পরে আজ অসমীয়া গান শুনতে পাবো।''

শেষের কথাগুলি বলতে বলতে তারা ভেতরে গিয়ে পৌছাল। ধর্মকান্ত স্বর্ণের কথা শুনে বলে উঠল, ''অসমীয়া গান বলে কেন বলছ? হাজোর ছেলে-মেয়ে হলেও তারা বাংলা গানই গাইবে। আর যেরকম বাংলা উচ্চারণ করবে, ডাক্তার রায়ের পক্ষে একটি শব্দ বোঝাও দুষ্কর। স্বর্ণকে তাঁর জন্যে আবার কলকাতার বাংলায় তর্জমা করতে হবে।''

''কলিকাতার বাংলা নয়, ঢাকার বাংলায়।'' স্বর্ণ হেসে উত্তর দিল।

"ওই বাংলা আর অসমীয়া-বাংলার মধ্যে ফারাক বেশি নেই!"

এইরকম হাসি-তামাসার মাঝে সেই বিকেল পেরিয়ে গেল। কেউই জানত না যে এরকম আর একটি বিকেল তারা তিনজনে একসঙ্গে আর কোনোদিন কাটাতে পারবে না। বিদায়বেলায় তিনজনের চোখে জল দেখে ধর্মকান্ত, হেন্‌রী আর ডাক্তার রায় হেসেছিলেন আর বলেছিলেন,

"মহিলারা এমনি এমনি কাঁদতে পারেন। এই তো ঢাকা, এই নগাঁও আর এই ডিব্রুগড়। মানুষ দেখলে ভাববে যেন তোমরা বিলেত বা আন্দামানে যাচ্ছ।

পনের

নগাঁও মিশনে পা দেওয়ার পর হেনরীর মনে নানারকম চিন্তার উঁকি হল। সে তার দায়িত্ব যদিও আগের মতোই পালন করে যাচ্ছে, তবুও নিজের মনের ওপরে তার নিয়ন্ত্রণ যেন কমে গেল। আগে তার সামনে পথ ছিল একটা — সোজা পরিস্কার পথ। এখন যেন সে হঠাৎ আবিস্কার করল যে পথের আশেপাশে জিনিষপত্রগুলি সে যেন এতদিন লক্ষ্যই করেনি। নিজেকে তার খুব অসম্পূর্ন মনে হল। তারার নাগাল পাবার পর তার মনের এলোমেলো ভাবটা যেন আরও গম্ভীর হয়ে দাঁড়াল। প্রথম দিন থেকেই সে ওর প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিল। তার ব্যাক্তিত্বের মধ্য দিয়ে প্রকাশিত আত্মবিশ্বাস আর সব কাজে মনপ্রাণ ঢেলে দেওয়ার ক্ষমতা দেখে তার নিজেকে যেন বড়ো দূর্বল মনে হল। একদিন তারা হাসির ছলে তাকে জিজ্ঞেস করেছিল —

"মিস্টার টমাস্, আপনি এত গম্ভীর হয়ে থাকেন কেন? আপনার সঙ্গে থাকলে আমার যেন নিজেকে বেশি চটুল স্বভাবের বলে মনে হয়।"

হেনরী একটু থতমত খেয়ে বলেছিল, "আমি সবসময়ই এরকম। মিশনারী হয়ে বেশী হাসি-তামাসা করতে পারি না।"

"মিশনারীরা কি মানুষ নয়? মানুষ হাসি-তামাসা করবেই। সবসময়ে না হলেও, মাঝে মাঝে।"

"তোমার সঙ্গে থাকলে অবশ্য আমারও ইচ্ছে হয় হাসতে —" হেন্‌রী কথাগুলি বলে হঠাৎ সচেতন হয়ে গেল। তারপরে আবারও গম্ভীরভাবে বলল, আসলে আমার এই কয়েকদিন মন ভালো নেই। অনেকরকম চিন্তা হচ্ছে। সেসব তোমাকে বলতে পারব না।"

পরে অবশ্য হেনরী তারাকে নিজের জীবনের অনেক কথাই বলেছিল। তার মনে নতুনভাবে আসা দ্বিধা আর সংশয় সম্পর্কে ও সে তাকে একটু আভাস দিল। কিন্তু স্পষ্ট করে কিছুই বলে নি — কি জানি তার ধর্ম-বিশ্বাসী মনটা তাকে যদি ভূল বোঝে। একদিন জুবিলি উৎসবের সমবেত প্রার্থনার পরে ওরা দুজনে একসঙ্গে তারার বাড়িতে যাওয়ার

পথে হেনরী হঠাৎ বলে ফেলল —

"তারা, আমার কোনো শেকড় নেই, বুঝেছ? তারা অবাক হয়ে তার মুখের দিকে চেয়ে বলল —

"মানুষের আবার শেকড় থাকে নাকি?" "সত্যি বলছি। ক্লার্ক সাহেব, গার্নী সাহেব, মূর সাহেব, এঁদের গভীর শেকড় আছে নিজের দেশে। কিন্তু আমার শেকড় কোথায় আছে?"

"কেন, আমাদের এই দেশে আছে। নিজের ধর্মের মধ্যে আছে"— তারা দৃঢ়ভাবে বলেছিল। হেনরী মাথা ঝাঁকালো —

"নেই, আমাদের শেকড় যদিও আছে তা আছে ওপরে ওপরে। তলাতে নেই। এই দেশের সঙ্গেই বা আমি কী সম্পর্ক রাখছি? এর সভ্যতা, ধর্ম, নাচগান সবকিছুই আমরা খারাপ বলে প্রচার করছি। — শয়তানের সৃষ্টি বলেও বলছি।"

"কিন্তু, আমার ধর্ম?" — তারা অসহায়ভাবে জিজ্ঞেস করল।

"ধর্ম ও শূন্যে ঝুলে থাকতে পারে না। ধর্মকেও বাঁচিয়ে রাখতে গেলে শেকড় লাগবে।"

তারা কিছুই বলল না। তার মনে অনেকসময় অনেক সন্দেহেরই ভাব এসেছে। কিন্তু সেগুলোকে প্রশ্রয় দেবার সে প্রযোজন বোধ করেনি। স্বর্ণ, ধর্মকান্ত, লক্ষ্মীদের সঙ্গে কথা বলবার সময় তারার ধারনা হয়েছিল যে পাদ্রীরা যাদের 'অধর্মী ' বলে করুণার চক্ষে দেখে, তাদের কথা-বার্তা, রীতি-নীতি অবমাননার যোগ্য নয়। হেনরীর ভাষায় এই দেশে তাঁদের কোন গভীর শেকড় আছে। তাঁদের নিজেদের লোকজনদের জন্যে কিছু একটা করতে চাওয়া আর পাদ্রীদের করতে চাওয়ার মধ্যে একটা যেন বড় পার্থক্য আছে। তারা কথাগুলো কখনই এত গভীরভাবে চিন্তা করে নি। কিন্তু মনে মনে উপলব্ধি করেছিল। হেনরীকে আশ্বাস দেবার উদ্দেশ্যে তারাই বলেছিল —

"আমি ও তো এই দেশেরই মানুষ। আমাদের শেকড় নিশ্চয়ই এই মাটিতেই আছে। খুঁজে দেখলেই পাব"। — তারা তার স্বভাবসুলভ আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে বলল।

জুবিলি কনফারেন্সের পরে রেভারেন্ড ক্লার্ক সাহেব নাগাপাহাড়ে ফিরে যাওয়ার সময় হেনরীকে সঙ্গে নিয়ে যাওয়ার জন্যে বেশি জোর করলেন না। হয়ত তারা আর হেনরীর মেলামেশা দেখেই তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে সে কিছুদিন নগাঁওতে থাকতে চাইবে। হেনরীও যাওয়া না যাওয়া সম্পর্কে তাঁকে নিশ্চিত করে কিছু বলতে পারেনি। সে কি করতে চাইছিল তাও সে নিজেই স্পষ্ট বুঝতে পারেনি। কিন্তু চিন্তা করে দেখার জন্যে সে একটু অবকাশ খুঁজছিল। মিশনের পাদ্রীরা সেইদিক থেকে বেশ সহানুভূতিশীল ছিলেন। তাঁদের ধারনা ছিল যে হেনরী আর তারা বিয়ে-থা করলে আগের চেয়ে বেশি ভালো করে মিশনের কাজ করতে পারবে।

তারার সঙ্গে হেনরী বেশ কয়েকদিন গোলাপীর কাছে গিয়েছিল। তাদের পরিপাটী

বাড়িটির পরিবেশটি তার খুব ভালো লেগেছিল। একদিন তারা দুজনে গোলাপীর কাছে বসে জুবিলি উৎসবের বর্ণনা দেবার সময় গোলাপী হঠাৎ হেনরীর হাত ধরে আবেগে অস্পষ্ট স্বরে বলে উঠলেন —

"বাবা, তারার জন্যে আমার খুব চিন্তা হচ্ছে। আমি মরে গেলে তারা কি হবে? তুমি কি তারা ভার নেবে?"

হেনরী একটু অপ্রস্তুত হল। সে আর তারা - একজনের আর একজনকে যদিও ভালো লেগেছিল, কিন্তু তারা খোলাখুলিভাবে বিয়ের প্রস্তাব করেনি। গোলাপীর বারবার একই প্রশ্নে অপ্রস্তুত হয়ে হেনরী মাথানীচু করে লজ্জার হাসি হেসে বলল যে,

"তারা তো নিজের দায়িত্ব নিজেই নিতে পারে। তার ভার আমি কেমন করে নেবো?"

গোলাপী অবাক্ হয়ে হেনরীব মুখের দিকে দেখল। কাঁপা কাঁপা গলায় সে বলল, "তার মানে তুমি তারাকে বিয়ে করবে না?"

হেনরী বুঝল যে গোলাপী তাকে ভুল বুঝছে। তাড়াতাড়ি নিজেকে শুধরে নেবার চেষ্টা করে সে বল'ল "না, না আমি সেভাবে বলিনি। তারাকে বিয়ে করতে পারলে আমি নিজেকে ধন্য মনে করব। কিন্তু তারই বা কি ইচ্ছে?" হেনরীর অবস্থা দেখে তারার হাসি পেয়ে গেল। সে পরিস্থিতি সামলে নিয়ে হেনরীর দিকে একটু দুষ্টুমির হাসি হেসে বলল,

"মায়ের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হল, তাই তো? এখন কে কার ভার নেবে কেজানে?"

গোলাপীর মুখে সন্তোষের হাসি ফুটে ওঠে। কিন্তু তারা হেনরী উপলব্ধি করল যে, তাদের সামনে হাজারটা সমস্যা এসে দাঁড়িয়েছে। বিয়ে করলেই সেই সমস্যাগুলির সমাধান হবে না! সেইদিন হেনরী আর তারা সামনের বাগানে বসে ভবিষ্যত জীবন সম্পর্কে অনেক পরিকল্পনা করল। হেনরী মুলুঙ্ যাওয়ার বাসনা ত্যাগ করেছিল। শুধুমাত্র তারাকে কাছে পাওয়ার জন্যেই নয়। তারা দুজনেই বেশ কয়েকটা কারণে মিশনের কাজ থেকে অব্যাহতি চাইছিল। দুদিন আগে শেষ হওয়া জুবিলি কনফারেন্সের সময় তারা দুজনে দূর দূর থেকে আসা পাদ্রী মেম-সাহেবদের একসঙ্গে দেখতে পেয়েছিল এবং সেই কদিন কাছাকাছি থেকে লক্ষ্য করে তারা আর হেনরী অনুভব করল যে 'নেটিভ' খ্রীস্টান আর পাদ্রীদের মধ্যে বিস্তর ব্যবধান রয়েছে। যদিও পদ্রীরা তারা হেনরীদের সঙ্গে অত্যন্ত ভদ্র, অমায়িক আর ভ্রাতৃসুলভ ব্যবহার করে তবুও তাদের মনে হচ্ছিল সেই শ্বেতাঙ্গরা নিজেদের ব্যক্তিত্বের মাত্র একটি দিকই যেন তাদের জানতে দিয়েছিল-ঠিক যেমন চাঁদ নিজের একটি দিকই পৃথিবীকে দেখায়। জুবিলি উৎসবের কয়েকটি দিন তারা যেন অস্পষ্ট আলোয় তাঁদের ব্যক্তিত্বের রহস্যময় অন্যদিকটি দেখতে পেয়েছিল। যখন তাঁরা অত্যন্ত অন্তরঙ্গভাবে নিজেদের মধ্যে ভাবের আদান-প্রদান করছিলেন, তাঁরা একসঙ্গে নিজেদের মাতৃভূমি আমেরিকার কথা বলছিলেন বা কারো কোন পারস্পরিক পরিচিত দূরের বন্ধুর কথা বলতেন — যাকে তারারা চেনে না এরকম সময়ে তারা এবং হেনরীরা বড্ড অসহায়বোধ

করত। অবশ্য তাদের উপস্থিতিতে সচরাচর সাধারণত সে সব কথা তাঁরা বলতেন না। কিন্তু না বললেও কখনো বা দূর থেকে দু - একটা কথা শুনে তারা অনুভব করত যে, যে শক্তি এই শ্বেতাঙ্গদের নিজের সুখ - শান্তি ত্যাগ করে ধর্মপ্রচারের জন্যে জীবন আহুতি দিতে অনুপ্রাণিত করেছে সেই শক্তি তাঁরা শুধু ধর্ম থেকেই পাননি, নিজের সভ্যতা ও সংস্কৃতির থেকেও পেয়েছিলেন। তাঁদের দেখে তারা আর হেনরী সিদ্ধান্ত নিল যে নিজেদের সব দিক থেকে উপযুক্ত করে না তোলা পর্যন্ত তারা মিশনের বাইরে থেকে লোকের সেবা করবে; দেশকে বুঝতে এবং জানতে চেষ্টা করবে। তারা নগাঁওর সরকারী ডিসপেনসারীতে একটি নার্সের কাজের জন্যে চেষ্টা করবে এই সিদ্ধান্ত নিল। তাই সে ব্রণ্‌সণ্‌ সাহেবের সঙ্গে আমেরিকাতে গিয়ে নার্সের প্রশিক্ষণ নিয়েছিল।

হেনরীর ইচ্ছে কলকাতা গিয়ে বি. এ. পড়বে। ধর্মকান্তকে জাহাজে পাওয়ার পরে এবং একদিন 'বিল্বকুটীরে' তাকে পেয়ে সে এ সম্পর্কে কথা পেড়েছিল। শিবসাগর হাইস্কুল থেকে কবছর আগে এন্ট্রান্স পাশ করার পরে হেনরী পড়াশুনো ছেড়ে দিয়েছিল। এখন তার নিজের আর তারার আগ্রহে সে নতুন করে ছাত্র - জীবন আরম্ভ করতে ইচ্ছুক। গুণাভিরাম বরুয়া হেনরীকে উৎসাহ দিয়ে বললেন যে খ্রীস্টান ছেলেদের জন্যে থাকা বিশেষ একটি বৃত্তি নিয়ে সে কলকাতার খ্রীস্টান হোস্টেল একটিতে থেকে পড়তে পারবে। সেই আশায়ই সে একটা নতুন জীবন আরম্ভ করার যোগাড় যন্ত্র সুরু করল।

ষোল

গুণাভিরাম বরুয়ার কলিকাতার ভাড়া বাড়িতে বিয়ের উদ্যোগ-আয়োজন তখনও আরম্ভ হয়নি। এই বিয়ের জন্যে ছয়মাস আগে পাটের কাপড় বোনার দরকার হয় না। কোমল - চাল, দৈ-দুধ আর গুড়ের হাঁড়ি যোগাড় করতে হয় না। নিমন্ত্রণের জন্যে কাঁচাসুপারি, পান, পানসুপারির বাটা বা পানের বাটার ঢাকনা এসব কিছুই লাগে না। জল তোলবার জন্যে হাঁড়ি, কলসী বিয়ের উপকরণে সুসজ্জিত ডালা, ঘট, গায়ে হলুদের জন্যে চালুনী, পাখা কিছুরই প্রয়োজন নেই। বিবাহটি সম্পূর্ণ ব্রাহ্ম নিয়মে হবে। বৈদিক অনুষ্ঠানগুলির দায়িত্ব ব্রাহ্মসমাজের লোকেরাই নেবেন। তার বাইরে অন্য কোনো আড়ম্বরের দরকার নেই। সুতরাং বিষ্ণুপ্রিয়ার করার মতো কিছুই নেই। এরকম ঝামেলা বিহীন বিয়েতে তাঁর বরং ভালোই লাগছিল। কিন্তু তাঁর মনটায় কেমন যেন একটা শূন্যতা। অথচ একটা সময়ে যখন কালীপ্রিয়া এবং দময়ন্তীর বিয়েতে তাঁকে হাজারকম ঝামেলার মুখোমুখি হতে হয়েছিল তখন কনের মা হওয়ার আনন্দে তিনি সব কষ্ট ভুলে গিয়েছিলেন। কালীপ্রিয়া, দময়ন্তী থেকেও তাঁর এই মেয়েটি রূপেগুণে সবদিক থেকেই চোখে পড়ার মত। কিন্তু তার জন্যে সমগ্র অসমে একটি ভালো ছেলে পাওয়া গেল না। বিষ্ণুপ্রিয়া মাঝে মাঝে সকলের

অলক্ষ্যে দীর্ঘশ্বাস ফেলেন। তাঁর খুবই ইচ্ছে ছিল স্বর্ণকে একটি ভালো পরিবারের অসমীয়া ছেলের সঙ্গে বিয়ে দেবার। কিন্তু যখন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের মতো বঙ্গের একজন প্রথম সারীর ব্রাহ্মনেতাই স্বর্ণকে নিজের পুত্রবধূ হিসেবে গ্রহণ করতে আপত্তি করলেন তখন বিষ্ণুপ্রিয়ার সমস্ত বিভ্রান্তি ঘুচে গেল। উচ্চশিক্ষিত এবং মহৎ আদর্শপ্রাপ্ত ব্যক্তি ও অনেকসময় নিজের ক্ষেত্রে উদার মনোভাব গ্রহণ করতে কুণ্ঠাবোধ করেন। স্বর্ণকে বিয়ে করবার জন্যে তাই যে ছেলেটি এগিয়ে এসেছে তার প্রতি কৃতজ্ঞতায় সে কারণেই তাঁর অন্তর ভরে ওঠে। নন্দকুমার রায় দেখতে যেমন সুন্দর, গুণে ও তেমনি ঝাঁকের মধ্যে ঝিলিক দিয়ে ওঠার মতো। বিলেত থেকে উচ্চশিক্ষা লাভ করে আসা ডাক্তার সেইসময়ে অসমে তো নেইই, বঙ্গেও মাত্র দু-একজন ছিলেন। বিয়ের কথা কলকাতায় যে শুনছিল সেইই বলছিল, "বাঃ, এ যেন রাজঘোটক।" গুণাভিরাম আর বিষ্ণুপ্রিয়াকে সবাই আন্তরিক অভিনন্দন জানালে বিষ্ণুপ্রিয়া মুচকি হেসে শুধু বলতেন,

"আপনারা সকলে আর্শীর্বাদ করুন — স্বর্ণর জীবনটা যেন সুখের হয়। আর আমাদের কিই বা লাগবে?"

বিয়ের মাত্র একমাস বাকি। গুণাভিরাম বরুয়া ছুটি নিয়ে কলিকাতায় এসেছেন। তাঁর ইচ্ছে বিয়ে হয়ে গেলে একেবারে ছেলেদের সহ বিষ্ণুপ্রিয়াকে নগাঁও নিয়ে যাবেন। স্বর্ণকে বিয়ে দেবার পরে বিষ্ণুপ্রিয়ার কলকাতায় থাকার কোন অর্থ নেই। তাঁর নিজের ও চাকরি জীবন প্রায় হয়ে আসছে। অবসর নেবার পরে কলিকাতার একজায়গায় বাড়ি ঘর বানিয়ে স্থায়ী বাসিন্দা হওয়ার ইচ্ছে তাঁর।

কলকাতায় এলে বরুয়া সবসময় পুরনো বইয়ের দোকান কটিতে একপাক মারবেনই। দরকারী বই দু - একটা চোখে পরলে কিনে নেন। কিন্তু বই কেনার চেয়েও তিনি পুরনো বন্ধু কাউকে দেখতে পাবেন সেই আশাতেই সেখানে বেশি যান। কাউকে না কাউকে তিনি পেয়েও যান। সেইদিন কিন্তু তিনি যাঁকে পেলেন তাঁর প্রতি গুণাভিরামের ছিল অসীম শ্রদ্ধা। বয়সে তিনি যদিও অনেক ছোট, তবুও এই অসমীয়া যুবকটিকে তিনি বঙ্গদেশের প্রথমশ্রেণীর পন্ডিতদের সঙ্গে স্থান দিয়েছিলেন। প্রায় দশ - বারো বছর আগে যখন এই যুবকটি শিবসাগরে অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার হয়ে এসেছিল, তখন গুণাভিরামের সঙ্গে তাঁর প্রথম পরিচয়। তখন তাঁরা দুজনে অসম দেশ এবং অসমীয়া ভাষা সাহিত্যের উন্নতির বিষয়ে অনেক কথা আলোচনা করেছিলেন। দুজনেরই আশা এবং উদ্দীপনা তখন সীমাহীন ছিল। তারপরে অবশ্য দুজনেই সরকারী কাজে ভিন্ন জায়গায় বদলি হয়ে যাওয়ার জন্যে পরষ্পরের দেখাসাক্ষাৎ হয় নি। সেইদিন আবার দোকানে দুজনের দেখাসাক্ষাৎ হওয়ার পরে গুণাভিরাম যুবকটিকে সমাদরে নিজের ঘরে ডেকে নিয়ে গেলেন। পত্নী এবং মেয়েকে ডেকে পরিচয় করিয়ে দিয়ে তিনি বল'লেন,

"ইনি হলেন নোয়াখালির ম্যাজিস্ট্রেট এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো শ্রীযুক্ত আনন্দরাম বরুয়া। অসম থেকে ইনিই প্রথম আই. সি. এস. হয়েছেন।"

বিষ্ণুপ্রিয়া এবং স্বর্ণ দুজনেই ভক্তিভরে বরুয়াকে নমস্কার জানালেন। স্বর্ণকে দেখিয়ে গুণাভিরাম একটু গর্ব করে বললেন —

"এই আমার মেয়ে স্বর্ণলতা। সম্প্রতি বেথুন স্কুলের ছাত্রী।"

আনন্দরাম বরুয়া একটু অপ্রস্তুতভাবে স্বর্ণর মুখখানি দেখলেন। এতক্ষণ তিনি তার দিকে ভালো করে তাকান নি। অনবরত বইয়ের মাঝে ডুবে থাকা এই ঠান্ডা প্রকৃতির মানুষটি জীবনে কোনো মেয়ে সম্পর্কে জানবার কৌতূহল বোধ করেন নি। কিন্তু আজ স্বর্ণকে দেখে হঠাৎ যেন তাঁর মধ্যে বিদ্যুৎ সঞ্চার হল — অবাক্ হয়ে তিনি স্বাভাবিকের থেকে একটু বেশিই তার মুখের দিকে চেয়ে রইলেন। এত রূপ-লাবণ্য তিনি আগে কখনো দেখেছেন বলে তাঁর মনে পড়ল না। তাঁর সেই বিস্ময়-বিমুগ্ধ চাউনি সহ্য করতে না পেরে একটু অপ্রস্তুত হয়ে স্বর্ণ মাথা নীচু করল। আনন্দরাম ও যেন হঠাৎ সচেতন হলেন। পরিস্থিতি সামলানোর জন্যে তিনি তাড়াতাড়ি জিজ্ঞেস করলেন —

"বেথুন স্কুলে আজকাল অনেক মেয়ে পড়ে, না?"

"আগের চেয়ে সংখ্যা অল্প বেড়েছে। কিন্তু বেশির ভাগ মেয়েই মাঝপথে পড়া ছেড়ে দেয়।" — স্বর্ণ লাজুকভাবে বলল।

"কেন ছেড়ে দেয়? স্কুলটা কি ভালো নয়?" আনন্দরাম অবাক্ হন।

"না না, বেশির ভাগেরই পড়া শেষ না হওয়ার আগেই বিয়ে হয়ে যায়।" স্বর্ণ কথাগুলি শেষকরে মায়ের দিকে তাকিয়ে মাথানীচু করল। আরও কিছুক্ষণ তার লজ্জায় রাঙা হয়ে যাওয়া মুখখানির দিকে আনন্দরাম একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলেন। ইতিমধ্যে চা জলখাবারের ব্যবস্থা করার জন্যে মাও মেয়ে দুজনে ভেতরে ঢুকে গেলেন।

গুণাভিরাম আনন্দরামের সঙ্গে সেদিন অনেকক্ষণ কথা বললেন। শিক্ষাক্ষেত্রে অসমের অনগ্রসরতার কথা, শাসন ব্যবস্থাতে থাকা সমস্যাগুলির কথা, আরও বিশেষকরে সংস্কৃত শিক্ষার বিষয়ে দুজনে ভাবের আদানপ্রদান করেছিলেন। আনন্দরাম নিজের বিশাল পরিকল্পনাগুলির একটু আভাস দিয়েছিলেন। 'অমরকোষ' - টির টীকা প্রস্তুত হলেই তিনি সংস্কৃত ভাষার বৃহৎ ব্যাকরণ খানির কাজে লেগে যাবেন। বারখন্ডের এই ব্যাকরণটির এখনো পর্যন্ত দশমখন্ড অবধি প্রকাশ করে বাকি গুলির কাজে হাত দেবার সময় পাননি। সরকারী চাকরির গুরুদায়িত্বে থেকে এইসব কাজ করা যে কি কষ্ট সে সম্পর্কে তিনি গুণাভিরামের কাছে দুঃখ প্রকাশ করলেন।

এই পান্ডিত্যপূর্ণ আলোচনাতে বিষ্ণুপ্রিয়া এবং স্বর্ণ ভাগ নিতে পারেনি। কিন্তু নির্বাক্ শ্রোতা হয়ে তাঁরা সেইদিন নিজেরা ধন্য হয়েছিলেন। স্বর্ণ বাবার মুখে আনন্দরাম বরুয়ার কথা আগেও শুনেছিল — গিল্‌ক্রিস্ট স্কলারশিপ্ এবং আই. সি. এস পাওয়া অগাধ পান্ডিত্যের অধিকারী এই মানুষটি যে এমন নম্র আর অমায়িক হতে পারেন, তা যেন তার বিশ্বাসই হচ্ছিল না। সেইদিন বিকেলে আনন্দরাম মাঝে মাঝে অন্যমনস্ক হয়ে পড়ছিলেন। তাঁর নিরিবিলি জগৎটি যেন অপ্রত্যাশিতবাবে একঝলক বসন্তের বাতাসে মাতাল হয়ে উঠেছিল।

সেইদিন 'গ্রেট্ইস্টার্ন হোটেল' — এর তাঁর থাকা ঘরটির জানালার কাছে বসে অনেকরাত্রি পর্যন্ত আনন্দরাম কোন এক মধুর চিন্তাতে বিভোর হয়ে রইলেন। কাছের মেঝের ওপর তাঁর অতিস্নেহের 'অমরকোষ' অনাদৃত ভাবে পড়েছিল। অন্যদিন অনেক রাত পর্যন্ত তিনি সেটির কাজে ব্যস্ত হয়ে থাকেন। কিন্তু সেইদিনটি কলকাতা মহানগরীর তিরতির করে জ্বলে থাকা আলোগুলি তাঁকে এক সোনালী স্বপ্নের ভেতর নিয়ে গেল।

দুদিন পরে আনন্দরামের বন্ধু শিবরাম বরা স্বর্ণর জন্য বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে গুণাভিরামের কাছে এলেন। গুণাভিরাম প্রস্তাবটি শুনে দীর্ঘশ্বাস ফেলে মাথা নত করে রইলেন। বিষ্ণুপ্রিয়াও চোখের জল মুছে বলেছিলেন, "দুমাস আগেও যদি এরকম একটি প্রস্তাব আসত ! একেই বলে কার পাতে কী অন্ন আছে তা ভগবানই জানেন।"

গুণাভিরাম শিবরাম বরাকে হাতজোড় করে বললেন, "বরুয়া মহাশয়কে বলবেন তাঁকে বিমুখ করে আমি মনে ভীষণ দুঃখ পাচ্ছি। আগে যদি জানতে পারতাম তাহলে আমার মতো সুখী আর কেউই হতেন না। কিন্তু আমার মেয়ের বিয়ের সবই ঠিক - ঠাক হয়ে গেছে। কি করব ? বরামশাই, আপনার কাছে আমার মিনতি - আপনি বরুয়ার জন্যে একটি ভালোমেয়ে ঠিক করে দিন। তাঁর মতো একজন গুণী পুরুষের সুখের সংসার হলে আমরা সবাই সুখী হব।"

শিবরাম বরা ম্লান হেসে মাথা ঝাঁকালেন — "তিনি যে আবার ইচ্ছুক হবেন, আমি আশা করি না। এত বছর বাদের এই প্রথম তিনি মত দিয়েছিলেন।"

স্বর্ণর বিয়ের সময় হয়ে আসছিল। বিয়ের ব্যস্ততার মাঝে গুণাভিরাম আর বিষ্ণুপ্রিয়া আনন্দরাম বরুয়ার প্রস্তাবটি ভুলে থাকতে চেষ্টা করছিলেন। স্বর্ণ অবশ্য এসব একেবারে জানতে পারেনি। মা - বাবা ইচ্ছে করেই তাকে কথাটা জানান নি। অযথা তার মনে অশান্তির সৃষ্টি করে লাভ নেই। স্বর্ণর মাঝে মাঝে আনন্দরাম বরুয়ার চাউনির কথা মনে পড়ত। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সেই সন্ধ্যেতে সেই ক্ষণকালের দৃষ্টি বিনিময়ের কথা মনে পড়লে তার হৃদয়ে মুহূর্তকালের জন্যে হলেও যেরকম কম্পন ওঠে বা রোমাঞ্চ জাগে, আনন্দরাম বরুয়ার ক্ষেত্রে তার সেরকম কিছু অনুভূতি হল না বা সে সেরকম কিছু অনুভব করল না। মানুষটির বয়স যদিও বেশি হয়নি, তবুও স্বর্ণ তাঁকে বাবার বন্ধুদের দলেই রাখল। বাবার বেশিরভাগ বন্ধু স্বর্ণর কাছে একই ধরনের — বিদগ্ধ, পন্ডিত, চাকুরীজীবী, উচ্চপদস্থ চাকুরীওয়ালা ও সমাজের প্রথম শ্রেণীর লোক। এরকম লোকের প্রতি গভীর শ্রদ্ধার বাইরে অন্য কিছু ভাবাটা স্বর্ণর পক্ষে সম্ভবই ছিল না। তার ভাবী স্বামী নন্দকুমার রায়ও বিদ্বান। তিনিও সুন্দর কথা বলতে পারেন, গান গাইতে পারেন এবং কবিতাও আবৃত্তি করতে পারেন। এমন প্রাণ- প্রাচুর্যে ভরপুর একজন লোক স্বর্ণ আগে কখনো দেখে নি। তার হৃদয়জুড়ে একমাত্র তিনিই বিরাজমান।

বিয়েটা খুব সাধারণভাবে হয়ে গেল। সম্পূর্ণ বৈদিক নিয়ম অনুসারে বিয়ে। অনেক আনুষঙ্গিক অনুষ্ঠান বাদ দেওয়ায় মাত্র দুঘন্টার মধ্যেই বিয়ের পর্ব চুকে গেল। নিমন্ত্রিতরা

বেশিরভাগই ছিলেন কলকাতার ব্রাহ্মসমাজের লোক। ফলে, সুরুচিপূর্ণ প্রাচ্য আর পাশ্চাত্যের আদর-কায়দার সংমিশ্রণ বেশ অনেক দিকেই দেখা গিয়েছিল। জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবারের প্রতিনিধি হিসেবে বিবাহে রবীন্দ্রনাথ ও এসেছিলেন সঙ্গে পত্নী মৃণালিনী দেবী। কনের সাজে স্বর্ণকে দেখে তিনি কি ভেবেছিলেন কে জানে? স্বর্ণ মুচকি হাসির সঙ্গে তাঁকে নমস্কার জানাতে তিনি ও প্রতিনমস্কার জানিয়েছিলেন। কিন্তু স্বর্ণর সেদিনের সৌন্দর্য দেখে মুহূর্তের জন্যে হলেও কবির চোখেমুখে এক বিষাদের ছায়া ফুটে উঠেছিল। বিয়ে বাড়ি থেকে তড়িঘড়ি বিদায় নিয়ে তিনি ফিরে গিয়েছিলেন। হয়তো সেইদিন তাঁর মনে কোন এক সঙ্গীত মধুর সন্ধ্যার কথা মনে পড়িয়ে দিল যার স্মৃতি তাঁর মনের নিভৃত কোনে "সিক্ত যুথীর গন্ধ বেদনার" মতো সঞ্চিত হয়ে রইল।

বিয়েতে কলকাতার অসমীয়া ছেলেদের 'মেস' গুলি থেকেও অনেক ছেলে এসেছিল। সুন্দর চেহারীর যে ছেলেটি অতিথিদের ভেতরে ডেকে নিচ্ছিলেন তিনি বিষ্ণুপ্রিয়ার সম্পর্কিত মামা। নাম লক্ষ্মীনাথ বেজবরুয়া। সেদিন হয়তো অনেকের চোখই এই দেখার মতো ছেলেটির ওপর পড়েছিল। সুন্দর একটি ছেলে দেখলে প্রত্যেকেরই নিজের আত্মীয় - স্বজন বা পরিচিত কারো মেয়ের সঙ্গে বিয়ে ঠিক করা যায় নাকি, এই চিন্তা করে সেইদিন গুণাভিরাম লক্ষ্মীনাথকে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন। প্রথম পরিচয়ে দুজনে অনেকক্ষণ কথা বললেন।

সেই জাঁকজমকপূর্ণ সন্ধ্যাটির শোভা বাড়ানোর জন্যে আরও একজন উজ্জ্বল জোতিষ্ক গিয়েছিলেন যাঁর আগমন গুণাভিরাম বরুয়াসহ প্রত্যেক অসমীয়াকেই ব্যস্ত করে তুলেছিল। আনন্দরাম বরুয়ার নাম সব অসমীয়া ছাত্রই শুনেছিল। কিন্তু বেশির ভাগের তাঁকে সেইদিনই প্রথম দেখার সৌভাগ্য হয়েছিল। একটু অপ্রস্তুতভাবে তিনি কনের হাতে একটি ছোট্ট, বাক্স গুঁজে দিলেন। যার ভেতরে ছিল অতিসুন্দর একজোড়া সোনার কানফুল। স্বর্ণকে কিছু একটা বলতে চেয়ে ও না বলে তিনি চলে গেলেন। সবাই ভেবেছিল যে তিনি মিতভাষী বলেই কিছু বললেন না। কিন্তু স্বর্ণ যেন একমুহূর্তের জন্যে তাঁর মুখে বিষাদের ভাব একটা লক্ষ্য করেছিল, আর তার অন্তরস্থ নারী মন ক্ষণিকের জন্যে সচকিত হয়ে উঠেছিল। স্বর্ণের বিয়ের পরদিনই এই শান্ত প্রকৃতির নিঃসঙ্গ মানুষটি নোয়াখালি চলে গেলেন। কে জানত যে তার ঠিক তিনবছর পরে এই মহান্ পুরুষের কলকাতায় মৃত্যু হবে।

স্বর্ণ বিয়েতে আর একটি উপহার পেয়েছিল — কাপড়ের উপর সূচের সূক্ষ্ম বা মিহি করে ফুল তোলা একটি অতি সুন্দর টেবিল ঢাকনি। তারা সেটি নিজের হাতে বানিয়ে হেনরীর হাত দিয়ে পাঠিয়েছিল। হেনরী কলকাতার একটি (College) কলেজে নামভর্তি করিয়েছে। খ্রীস্টান ছেলেদের বোর্ডিংয়ে থাকে। তারাকে সে বিয়ে করবার দুমাস পরেই গোলাপীর মৃত্যু হয়। মাকে হারানো সত্ত্বে ও তারা হেনরীকে প্রায় জোর করে কলকাতাতে পড়তে পাঠিয়ে দিয়েছিল। নিজের নিঃসঙ্গতা দূর করার জন্যে সে নিজের বাড়িতে মিশন স্কুলের ছজন মেয়েকে রাখার একটি বোর্ডিং খুলেছিল। সেই মেয়েকটিকে আগে বাপুরাম

নামের একজন খ্রীস্টানের বাড়িতে বোর্ডার হিসেবে রাখা হয়েছিল। বাপুরামের স্ত্রীর হঠাৎ মৃত্যু হওয়ার তারা কিছুদিনের জন্যে এই দায়িত্ব নিতে রাজি হল। ইতিমধ্যে মিশনের পক্ষ থেকেও মেয়েদের জন্যে একটি বোর্ডিং বানানোর যোগাড়-যন্ত্র চলছিল। সেটা হয়ে গেলে দূর-দূরান্ত থেকে অনেক মেয়ে হয়ত পড়তে আসতে পারবে।

স্বর্ণর বিয়ের পরে হেনরী একদিন গুণাভিরামের সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল। তাকে কলকাতাতে পড়ার ব্যবস্থা করে দেবার জন্যে সে অন্তরে অন্তরে বরুয়ার কাছে ছিল কৃতজ্ঞ। কলকাতায় নতুন পরিবেশে নতুন বন্ধু বান্ধব পেয়ে সে অত্যন্ত সুখী। গুণাভিরাম বরুয়ার উপদেশ মতোই সে অসমীয়া ছেলেদের 'মেসে' গিয়ে নবাগত কয়েকজনের সঙ্গে দেখা করেছিল। সব কটি ছেলেই খুব উদ্যমী। অসমীয়া ভাষা-সাহিত্যের উন্নতির জন্যে তাঁরা নতুন নতুন পরিকল্পনা করছেন। হেনরী তারাকে লেখা চিঠিগুলিতে কয়েকজন ছেলের নাম প্রায়ই উল্লেখ করত — লক্ষ্মীনাথ বেজবরুয়া, সত্যনাথ বরা, রজনী বরদলৈ, হেমচন্দ্র গোস্বামী।

তৃতীয় অধ্যায়

এক

পাঁচটি বছর পেরিয়ে গেল, দেখতে গেলে অবশ্য পাঁচ বছর খুব বেশি সময় নয়। কত মানুষের জীবনে কত পাঁচবছর না বলে কয়ে পার হয়ে যায়। কাজে ব্যস্ত থাকা মানুষ সময়ের হিসেব করার অবকাশ পায় না। যার জীবনে স্থবিরতা এসে পড়েছে সেও ফিরে অতীতকে দেখতে চায়।

ধর্মকান্তর আজকাল সময়ের কথা ভাববার অবকাশ নেই। অসমের একদিক থেকে আরেকদিকে বিদ্রোহের আগুন জ্বলছে। সরকার নিত্যনতুন কর বসিয়ে প্রজাদের অশেষ দুঃখ দিচ্ছে। পুরনো নিয়মকানুনের ওপরে এখন কমিশনার ওয়ার্ড সাহেব এরকমভাবে খাজনার হার বাড়িয়ে দিয়েছেন যে কোনো কোনো জায়গায় তা দ্বিগুণ হয়েছে। জনগণ বিক্ষুব্ধ হয়ে পড়েছে। জায়গায় জায়গায় নামঘর, মসজিদ ইত্যাদিতে জনসভা বসেছে। সকলের মুখে মুখে ফুলগুড়ির যুদ্ধের কথা। কুড়ি বছর আগের সেই যুদ্ধে ফুলগুড়ির জনগণ ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে বীরত্বের সঙ্গে যে যুদ্ধ করেছিল তার কথা মনে পড়লেই যুবকের রক্ত গরম হয়ে ওঠে। বুড়ো মানুষদের উৎসাহ ও কিছু কম নয়। তাঁদের কাছে ফুলগুড়ির যুদ্ধ এই তো সেদিনের কথা। এখনও প্রয়োজন হলে হাতে শক্ত লাঠি নিয়ে বেরিয়ে যেতে তাঁরা প্রস্তুত।

ধর্মকান্তর ডিব্রুগড় থেকে বের করা কাগজটির নাম 'দিগ্বিজয়'। সেই কাগজটিতে সে জনগণের দুঃখ-দুর্দশার বহুকথা লিখত। কিন্তু তার সবসময় মনে হত যাদের অভাব অভিযোগের কথা সে লিখছে তাদের অধিকাংশই নিরক্ষর। আর যারা লেখা - পড়া জানে, তারা সরকারের কুদৃষ্টিতে পড়বে এই ভয়ে 'দিগ্বিজয়' পড়ে না। কলকাতায় পড়ার সময় থেকে ধর্মকান্ত লক্ষ্য করে এসেছে ইংরেজী শিক্ষায় শিক্ষিত বেশির ভাগ যুবকই ইংরেজদের পরম ভক্ত হয়ে উঠছে। যারা কংগ্রেস দলে ঢুকেছেন তাঁরা বেশিরভাগই ইংরেজ সরকারের থেকে সুবিধে আদায় করার মতলবে ঢুকেছেন, ইংরেজকে তাড়াবার জন্যে নয়। সুতরাং এইসব সুবিধেবাদী লোকদের 'দ্বিগ্বিজয়' পড়তে দেওয়াটা ধর্মকান্তর একেবারে যেন নিরর্থক মনে হয়। কিন্তু তার বন্ধু কাকতী খুবই আশাবাদী। তাঁর মতে মাটিটা চাষের উপযুক্ত করতে কিছু সময় লাগলেও সময়ে ভালো ফসল হবেই। কাকতী দেখতে শান্ত - প্রকৃতির লোক। ধর্মকান্তের মতো অধৈর্য্য স্বভাবের নয়। কিন্তু তার মধ্যে

থাকা গভীর দেশপ্রেম এবং কর্তব্যনিষ্ঠার জন্যে তিনি নিজের যথাসর্বস্ব ত্যাগ করতে প্রস্তুত বলে ধর্মকান্ত জানত। সেইজন্যে 'দিগ্বিজয়' এর ভার কাকতীর ওপরে দিয়ে বেশিরভাগ সময় একদিক থেকে আরেকদিকে ঘুরে বেড়াচ্ছিল, জনসাধারণকে সংগঠিত করার জন্যে।

ধর্মকান্তের চেষ্টা বেশিরভাগ জায়গায় সফল হয়েছিল। জনসাধারণ নিজেরাই জায়গায় জায়গায় সভা করে কথাগুলি বিস্তারিতভাবে আলোচনা করতে আরম্ভ করেছিল। পাঁচসিকে খাজনা দেওয়াতেই জনগণের কোমর ভেঙে পড়েছিল। এখন নতুন হারে খাজনা দেওয়াটা দুঃখী কৃষকদের কাছে একেবারেই অসম্ভব হয়ে পড়ল। কামরূপ, দরং আর নগাঁওর কৃষকের মধ্যেই ক্রোধের প্রকাশ ছিল বেশি। আহোমরাজার দিন থেকেই এইসব জায়গার লোকজন খানিকটে জঙ্গি ধরণের। ''রজাখেদা নগঞ'' (রাজা খেদানো নগাঁও) এই নামেই তখন থেকে তারা পরিচিত। ধর্মকান্ত এইসব জায়গায় ডাকা বেশ কয়েকটি জন - সভাতে লক্ষ্য করেছে, সভার মুখিয়ারা কথা শেষ করবার আগেই জনগণ যুদ্ধে যাবে বলে প্রস্তুত হয়। লোকদের এরকম জঙ্গীভাব দেখে ধর্মকান্তের কখনো কখনো ভয় লাগে। যদি এই লোকগুলিকে জাগিয়ে দেওয়ার পরে এরা নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়? যদি সাতান্ন সালের বিদ্রোহের মতো এই দুঃখী কৃষকেরা ইংরেজদের কামানের লক্ষ্য হয়ে পড়ে?

ধর্মকান্ত উন্মাদ বিপ্লবী নয়। জনগণের দুঃখ-দুর্দশার সুযোগ নিয়ে সে তাদের নিশ্চিত মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিতে পারে না। সেই জন্যেই সে চীফ্ কমিশনার ওয়ার্ডসাহেবের খাজনা বৃদ্ধির জন্যে জারি করা নতুন নির্দেশটিব বিরুদ্ধে একটি আর্জি বা আবেদন লিখল। তার উদ্দেশ্য ছিল যে অসমের সমস্ত জেলার জনগণের সই সংগ্রহ করে তা ইম্পিরিয়াল লেজিসলেচারের মেম্বার শ্রীযুক্ত রাসবিহারী ঘোষের কাছে পাঠাবে। সেইজন্যে সে উজনী অসমের নানাজায়গা ঘুরে ঘুরে নগাঁও পৌঁছোল। ওখান থেকে কামরূপ হয়ে সে দরং যাবে। অনেকদিন পরে নগাঁও গিয়ে সে প্রথমেই গুণাভিরাম বরুয়ার খবর নেবার জন্যে বিল্বকুটীরে গেল। প্রায় দুবছর হয়ে গেল গুণাভিরাম 'দিগ্বিজয়' — এর জন্যে বাৎসরিক চাঁদা পাঠাবার সময় তাতে লিখেছিলেন, আরও কিছুদিন বাদে তিনি সরকারী চাকরী থেকে অবসর নেবেন। তারপরে সপরিবারে কলকাতায় থাকার কথা তিনি চিন্তা করছেন। সেই চিঠিব পরে গুণাভিরামের খবর সে আর পায়নি। অবশ্য সে নিজেও এমন ব্যস্ত যে খবর নিতেও পারেনি।

'বিল্বকুটীর' — এর সামনে এসে ধর্মকান্ত থেমে গেল। বাংলোটিতে জনমানবের চিহ্ন নেই। সামনের বাগানটি অনাদৃত হয়ে পড়ে আছে। বেলগাছের তলায় দুটো গোরু চরছে। ধর্মকান্ত এদিক ওদিক তাকিয়ে দু-পা এগিয়ে যেতেই বাড়ির পেছনদিক থেকে চৌকিদারের মতন একজন লোক বেরিয়ে এসে বলল, বরুয়া হাকিম সাহেব পেনশান নেবার কয়েকদিন পরেই নগাঁও ছেড়ে কলকাতা চলে গেলেন। ধর্মকান্ত খবরটি শুনে একটু আশ্চর্য হল। গুণাভিরাম বরুয়া তাকে বলেছিলেন যে অবসর নেবার পরে তিনি

কলকাতাতে বাড়ি তৈরী করবেন এবং তারপরে এখান থেকে সপরিবারে উঠে যাবেন। কিন্তু এত তাড়াহুড়ো করে কেন চলে গেলেন তার কারন সে বুঝতে পারল না।

'বিল্বকুটীর' - এর থেকে বেরিয়ে এসে সে কিছুক্ষণ উদাসভাবে কাঠের গেটটি ধরে দাঁড়িয়ে রইল। 'বিল্বকুটীর' তার মনে পুরনো স্মৃতি গুলি জাগিয়ে তুলছিল। তার জীবনের পথে এই বাড়িটি ছিল এক নিরাপদ আশ্রয়স্থল। বিষ্ণুপ্রিয়ার মাতৃস্নেহ, স্বর্ণের নিঃসংকোচ বন্ধুত্ব এবং গুণাভিরামের উৎসাহ এবং অনুপ্রেরণায় ভরা উপদেশবাণী সে কখনো ভুলতে পারবে না। তাঁদের কথা ভাবতে ভাবতেই তার হঠাৎ তারা আর হেন্‌রীকে মনে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে সে খ্রীস্টান পল্লীর দিকে হাঁটতে শুরু করল। তারাদের বাড়িটি আগের মতোই আছে। কিন্তু ভেতরে ঢোকার পরে ধর্মকান্ত কিছুটা পরিবর্তন লক্ষ্য করল। নতুন চেয়ার টেবিল এবং কোনে রাখা একটি বইয়ের আলমারী বৈঠক খানাটির শোভা বাড়িয়েছে। ধর্মকান্ত আলমারীটির প্রথম তাকটি লক্ষ্য করে দেখল, তাতে শেক্সপিয়ারের দুটি নাটক, মিলটনের 'প্যারাডাইস্‌লস্ট', বানিয়নের 'পিলগ্রিমস প্রোগ্রেস্', 'অরুনোদই' - এর বাঁধানো ভলিউম দুটির সঙ্গে আছে শিবসাগর মিশন প্রেস থেকে বেরনো ছোট ছোট বেশ কয়েকখানি অসমীয়া ধর্মপুস্তক। কিন্তু মাঝের তাকের দুটি বইয়ের ওপর চোখ যাওয়াতে ধর্মকান্ত অবাক হয়ে গেল। তাতে ছিল 'দুর্গেশনন্দিনী', 'কপালকুন্ডলা', 'কমলাকান্ত', 'নীল - দর্পন,' 'রিলিজিয়াস্ থট্ এ্যান্ড লাইফ্ ইন ইন্ডিয়া,' মিলের 'অন লিবার্টি', আর ডারউইনের 'অরিজিন অফ্ স্পিসিজ্'। ধর্মকান্ত হেণ্‌রীকে এতদিন একজন ধর্মভীরু, রাজভক্ত এবং শান্তশিষ্ট মানুষ বলেই জানত। কিন্তু তাঁর পড়ার রুচি দেখে তার ধারনা পাল্টে গেল। এই অদ্ভুত পরিবর্তন শুধু কলকাতার প্রভাবের জন্যেই হয়েছে, না যুগ - পরিবর্তনের নতুন হাওয়া লেগে হয়েছে তা ধর্মকান্ত বুঝতে পারল না।

তারা বাড়িতে ছিল না। হাসপাতালে নার্সের চাকরীতে ঢুকবার পর থেকে সে খুবই ব্যস্ত। হেণ্‌রী তাদের দুবছরের ছেলেটিকে খাবার খাওয়াচ্ছিল। ধর্মকান্তকে সমাদরে বসতে দিয়ে সে ছেলেটির পরিচর্যা করতে গেল। ছেলেটিকে রাখার জন্যে একজন লোক ছিল। কিন্তু হেন্‌রী বাড়িতে থাকলে সে নিজেই তার যত্ন করে। হেণ্‌রী বি. এ. পাশ করে নগাঁও হাইস্কুলে চাকরীতে ঢুকেছে। মিশনের সাহেব মেমরা প্রথমে তার এই সিদ্ধান্তে খুশি হয়নি। তাঁরা চেয়েছিলেন যে সে ধর্মপ্রচারের কাজে যুক্ত হয়ে পড়ুক্। পরে অবশ্য তাঁরা আর তারা এবং তার জীবন নিয়ে টানাহেঁচড়া করেননি।

ধর্মকান্ত টেবিলের ওপরে রাখা 'জোনাকি'র পাতা উল্টে হেন্‌রীকে জিজ্ঞেস করল, "ছেলের নাম কি রেখেছ?"

"নরেন"। হেন্‌রী উত্তর দিল। ধর্মকান্তকে আশ্চর্য হয়ে তার মুখের দিকে চাইতে দেখে সে মুচকি হেসে আবার বলল, "নরেন মাইকেল টমাস্"।

"নরেন নামটা কেন দিলে?" — ধর্মকান্ত বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞেস করল।

"কলকাতায় থাকার সময় একবার রামকৃষ্ণের শিষ্য নরেনকে দেখেছিলাম। সেই

সুন্দর, পবিত্র চেহারাটি আমার চোখের সামনে এখনো ভাসছে। কখনো ভাগ্যে থাকলে তার কথা শোনবার ইচ্ছে আছে।''

''তুমি খ্রীস্টান হয়ে রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের শিষ্যের কথা বলছ?'' ধর্মকান্তের যেন বিস্ময়ের সীমা নেই। হেন্‌রী শান্তভাবে হেসে বললেন।

দুই

পুরনো বৈঠকখানা লেনের দ্বিতীয় গলির তিন নম্বর বাড়িটি ধর্মকান্ত খুঁজে বের করল। প্রথমে সে তারার দেওয়া ঠিকানা অনুসারে গুণাভিরাম বরুয়াকে খুঁজতে স্কট লেনের একটি বাড়িতে গিয়েছিল। কিন্তু পাড়ার লোকেরা খবর দিল যে প্রায় একমাস আগে পত্নীর মৃত্যুর পরে বরুয়া মশাই পুরনো বৈঠক খানা লেনের বাড়িতে উঠে গেছেন। একটার পর একটা দূর্ঘটনার খবর পেয়ে ধর্মকান্ত মর্মাহত হল। বরুয়া মশায়ের কাছে যেতে তার ভয় হল। কি জানি তিনি হয়তো মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেছেন। কিন্তু ধর্মকান্তকে দেখেই তিনি যে রকম আগ্রহের সঙ্গে সাদর সম্ভাষণ জানালেন তাতে সে বুঝতে পারল যে এই মানুষটি আগুনে পোড়া খাঁটি সোনার মতো।

দুর্ভাগ্য এখনো তাঁকে টলাতে পারেনি। পাকা দাড়িতে মুখঢাকা গুণাভিরামের শান্ত সৌম্য চেহারা দেখে ধর্মকান্তের তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা বেড়ে যায়। গুণাভিরাম ধর্মকান্তকে তাঁর পড়ার ঘরে ডেকে এনে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে তাঁর আদান প্রদান করা চিঠি-পত্র দেখালেন। প্রয়াত পত্নী বিষ্ণুপ্রিয়ার স্মৃতিতে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সর্বোচ্চ নম্বর পেয়ে বি.এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ন হওয়া অসমীয়া ছাত্র বা ছাত্রীকে তিনি একটি পুরস্কার দেবেন বলে জানিয়েছেন।

''লেখা-পড়ার প্রতি তাঁর কিরকম উৎসাহ ছিল তা তো জানোই! যদিও নিজে পড়ার সুবিধে পাননি তবুও অন্যে পড়াশুনো করলে তিনি খুবই আনন্দ পেতেন। নিজেও তিনি 'নীতি-কথা' নামে একটি বই রচনা করেছেন। তোমার মনে আছে না?'' গুণাভিরামের কথাগুলি বলবার সময় কণ্ঠস্বর কেঁপে উঠেছিল।

ধর্মকান্তের সেসব কথা ভালোভাবেই মনে ছিল। একদিনের একটি দৃশ্য তার চোখের সামনে তখনো ভাসছে। মানিকতলা স্ট্রিটের সেই প্রকান্ড ভাড়াবাড়ির বসবার ঘরে পা দিয়েই একদিন সন্ধ্যেতে সে দেখেছিল যে লণ্ঠনের আলোয় স্বর্ণ আর বিষ্ণুপ্রিয়া একসঙ্গে বসে স্বর্ণর লেখা 'আহি তিরোতা'-র বানান শুদ্ধ করছেন।

কিছুক্ষণ বাদে চা জলখাবার নিয়ে স্বর্ণ বেরিয়ে এল। তার সাজপোষাকে ধর্মকান্ত বিশেষ পরিবর্তন দেখতে পেল না। সাধারণ বিবাহিতা মহিলার মতোই সে একটি হালকা রঙের শাড়ি এবং দু-একটি অলঙ্কারও পরেছিল। ধর্মকান্ত তাকে বাঙালী বিধবাদের মতো

সাদা থান পরিহিতা দেখতে পাবে বলে মনে মনে একটু আতঙ্কিত ছিল। হঠাৎই তাকে অন্যরূপে দেখে তার মনটা ভালো হয়ে গেল। ব্রাহ্মসমাজের কাছে কৃতজ্ঞতায় তার শির নত হয়ে গেল। স্বর্ণ ধর্মকান্তকে দেখে হাসবার চেষ্টা করল। একের পর এক পাওয়া শোকের আঘাত তার মুখের ওপর একটা শোকের গভীর ছায়া ফেলেছে। কিন্তু সেই ছায়ার মাঝখানেও তার ব্যক্তিত্বের উজ্জ্বলতা প্রকাশ পাচ্ছিল। ধর্মকান্তের কাছ থেকে লক্ষ্মীর খবর নেবার পরে সে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বলল,

"লক্ষ্মীর মতো নিজের পায়ে দাঁড়ানো মেয়ে কজন আছে? তার মতো মনের জোর যদি আমার থাকত!"

"স্বর্ণ, ওরকম ভাবে কেন বলছ? লক্ষ্মীর চেয়ে ও তোমার শিক্ষা-দীক্ষা অনেক বেশি। তার থেকেও বড়ো তোমার ভাগ্য যে তুমি এরকম পিতা-মাতার সন্তান যাঁরা নিজের বিশ্বাসের জন্যে সমাজের কাউকে ভয় করেন নি। সুতরাং তুমি হেরে যাবে বলে আমার বিশ্বাস হয়না।"

"আশীর্বাদ করো, দাদা। আমি যেন মা-বাবার মতো হতে পারি ।" স্বর্ণর স্বর আবেগে আপ্লুত হয়ে গেল।

ধর্মকান্ত প্রসঙ্গ পালটে বলে উঠল, "তুমি তো আবার পড়াশুনো শুরু করতে পারো, স্বর্ণ? 'আসাম-বন্ধু' বন্ধ হবার পর তুমি লেখা একেবারে ছেড়ে দিলে। 'জোনাকী'-র জন্যে তো গল্প, কবিতা লিখতে পারো। লক্ষ্মীনাথ বেজ বরুয়া তোমাদের আপনজনই। তাঁর হাতে দিলেই প্রকাশ করবেন।"

"তিনিও আমাকে এ বিষয়ে বলেছেন। কিন্তু আজকাল আমারই কিছু লিখতে ইচ্ছে করেনা। এখন ভাই তিনটি আর মেয়েদুটিকে লেখা-পড়া শিখিয়ে উপযুক্ত করাটাই আমার একমাত্র কাজ। মা আমাকে মৃত্যুশয্যায় এইভার দিয়ে গেছেন। নিজের কথা ভাবতে আমার মন চায় না।"

ধর্মকান্ত কি উত্তর দেবে ভেবে পেল না। সে স্বর্ণকে স্বার্থপর হওয়ার উপদেশ দিতে পারে না। কিন্তু সমাজ সংস্কারমূলক কাজকর্মের দিকে এগিয়ে যাওয়া লোকেদের কোন কোন ক্ষেত্রে স্বার্থপর হতে হয়। সে নিজেও কি স্বার্থপর হয়নি? লক্ষ্মীর ওপর ঘর সংস্কারের সব দায়িত্ব ছেড়ে দিয়ে সে যাযাবরের জীবন যাপন করছে। মাঝে মাঝে তার যে অনুশোচনা না হয়, তা নয়। কিন্তু সে কি করবে? লক্ষ্মী নিজেই তাকে দেশের কাজ করবার জন্যে প্রেরণা দিয়েছে। স্বর্ণর দিকে তাকিয়ে ধর্মকান্ত ভাবে, হয়তো একদিন স্বর্ণর ভায়েরা বা সন্তানদুটি বিখ্যাত হয়ে উঠবে। তখন কি তার নিঃস্বার্থ ত্যাগের কথা কেউ মনে রাখবে? মুহূর্তের মধ্যে নারীজাতির প্রতি সমাজের দেখানো অবহেলার কারনে ধর্মকান্তের নিজেকে যেন অপরাধী মনে হয়।

তিন

মায়ের অভাব স্বর্ণ প্রতি পদে পদে অনুভব করছিল। কিন্তু ভাইদের সামনে সে নিজের মনের দুঃখ কখনো প্রকাশ করেনি। তাদের জন্যে মায়ের জায়গা এখন তাকেই পূরণ করতে হবে। স্বর্ণর একমাত্র চেষ্টা ছিল কোনদিক থেকেই যাতে তাদের বঞ্চিত হতে না হয়। মা না থাকাতেই স্বর্ণ উপলব্ধি করল যে বাড়ির দায়িত্ব কতখানি। কাজের লোক যতই থাকুক্ না কেন, সবদিকে চোখ দিয়ে নিয়মিতভাবে কাজকর্ম চালিয়ে নেওয়াটা একটা গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব। স্বামীর বাড়িতে স্বর্ণকে এত দায়িত্ব নিতে হয়নি। স্বামী, বড়ভাসুর, বড়জা এরা সবাই তার দায়িত্ব অনেকখানি লঘু করে দিয়েছিলেন। কিন্তু বাবা সংসারের সব দায়িত্ব আস্তে আস্তে তার ওপরে ছেড়ে দিয়েছেন। দেখলে মনে হত যে গুণাভিরামের ঘরে কোনো কিছুরই অভাব নেই। অন্যের তুলনায় নিজের ছেলেমেয়েদের তিনি যথেষ্ট সৌখিনতার মধ্যেই মানুষ করছিলেন। কলকাতার বাজারের সবথেকে দামী জুতো, সার্ট - প্যান্ট তাদের পরার জন্যে দিতেন। খাওয়া দাওয়াতেও তাঁর রুচি বেশ রাজকীয় ছিল। বাড়িতে অসমীয়া বা বাঙালি খাবার বেশ জুত সই করে রান্না করা হত যদিও বাইরের দামী হোটেল থেকে দামী সাহেবী খানা এনেও তিনি ছেলেদের খাওয়াতেন। তারপরেও অতিথি অভ্যাগতর জন্যে থাকা-খাওয়ার সুবন্দোবস্ত তো ছিলই। কত জায়গা থেকে নানান ধরনের বড়ো বড়ো মানুষ গুণাভিরামের কাছে আসতেন। কলকাতার ব্রাহ্মসমাজ গোষ্ঠির উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কদের বাইরে ও গৌরীপুরের রাজা, বগরিবাড়ির জমিদার এবং জখলাবন্ধা সত্রের অধিকারী রঘুদেব গোস্বামী কলকাতায় বরুয়ার বাড়িতে প্রায়ই অতিথি হতেন। তারপরেও ছিল নিজের বংশের আত্মীয়-স্বজন, পরিচিত কুটুম্ব ইত্যাদি কেউ না কেউ গিয়ে প্রায়ই থাকত। সেই সমস্ত লোকজনদের ত্রুটি না ধরে সকলের সেবার দায়িত্ব ও স্বর্ণকেই নিতে হয়। স্বর্ণ যতদূর সম্ভব নিজের দায়িত্ব হাসিমুখে পালন করে যেত। কিন্তু সেইসব কাজের মধ্যে তার মনে সে অনুমাত্র আনন্দ খুঁজে পেত না। তাই সে অপেক্ষা করে সেই বিকেলগুলির যখন লক্ষ্মীনাথ বেজবরুয়া, হেম গোঁসাই, পদ্মনাথ গোঁহাই বরুয়া, রাধিকাপ্রসাদ বরুয়া অর্থাৎ কলকাতায় আগত নতুন ছাত্রেরা শলা-পরামর্শ করতে আসত। তাঁদের সঙ্গে বসে স্বর্ণ সাহিত্যের কথা এবং দেশ-বিদেশের আরো নানাধরণের কথা আলোচনা করত। সেই দিনগুলি তার কাছে ছিল খুবই দুর্লভ। জোনাকীকে নিয়ে তখন কত যে নতুন নতুন পরিকল্পনা হত তার সীমা নেই। 'জোনাকী' তে রাজনীতির কথা থাকবে কি থাকবে না সেই বিষয়ে অনেক তর্ক-বিতর্ক ও হয়েছিল। চন্দ্রকুমার আগরওয়াল ই যদিও লিখেছিলেন যে রাজনীতি 'জোনাকী'র এক্তিয়ারের বাইরে তবুও একদল ছাত্র সে কথা মানতে পারে নি। ধর্মকান্তের কলিকাতায় অবস্থানের দিনগুলিতে এই বিষয়টি নিয়ে পরিস্থিতি বেশ উত্তপ্ত হয়ে উঠেছিল। একদিন স্বর্ণদের বাড়িতে একটি ছোটখাট তর্ক-যুদ্ধ হয়ে গেল। ধর্মকান্তের মতে যুগের এই সন্ধিক্ষণে কোনো ভারতীয় পত্রিকাই রাজনীতির

কথা বাদ দিতে পারে না। প্রতিটি লেখকের এটি একটি মহান ঐতিহাসিক দায়িত্ব। নিরপেক্ষ হয়ে কেউই থাকতে পারে না। কিন্তু উপস্থিত বেশ কয়েকজন এইকথার প্রতিবাদ করে বলল যে সাহিত্যের স্থান রাজনীতির বাইরে। তারপরে শুরু হল 'রাজনীতি' আর 'প্রজানীতি'র মধ্যেই পার্থক্যের কথা। অনেকসময় ধরে চলল এই তর্ক-বিতর্ক, বাদানুবাদ। গুণাভিরামের বসার ঘরের মধ্যে যেন নতুন পুরনো ভাবাদর্শের ঝড় বয়ে গেল আর সেই ঝড়ে স্বর্ণর মনটাও যেন নতুন প্রাণ পেল।

সেই ঘরটির মধ্যে রাজনৈতিক আলোচনা ও অনেক হত। এলাহাবাদের আগামী কংগ্রেস অধিবেশনে কলকাতার অসমীয়া ছাত্রদের মধ্যে কাকে কাকে প্রতিনিধি করে পাঠানো হবে সেই সিদ্ধান্ত ও ওই দিনই বৈঠকখানা লেনের ঐ ঘরটিতে নেওয়া হয়েছিল। সেইদিনের সভাতে ধর্মকান্ত ও উপস্থিত ছিল। সকলেরই তাকে পাঠাবার ইচ্ছে ছিল। কিন্তু ধর্মকান্ত রাজি হল না। কারন তার নাকি অসমে অনেক কাজ আছে। ফিরে গিয়ে তাকে গ্রামের মানুষদের সংঘবদ্ধ করতে হবে। গ্রামের লোকেরাই ভারতের ভবিষ্যৎ নির্ণয় করবে। শেষকালে সেই সভাতে তিনজন লোকের নাম মনোনীত করা হল — রাধানাথ চাংকাকতি, লক্ষ্মীনাথ বেজবরুয়া এবং ভোলানাথ বরুয়া।

এইসব রাজনৈতিক আলোচনা এবং বাগবিতন্ডার মধ্যে স্বর্ণ বেশিরভাগ সময়ই মৌনশ্রোতা হয়ে থাকত। কিন্তু কথাগুলি সে যথেষ্ট মনোযোগের সঙ্গে শুনত। আর একটা ব্যাপার সে লক্ষ্য করল যে যুবকেরা বেশিরভাগই ছিল ইংরেজদের ভক্ত। স্বর্ণ আনন্দমোহন বসুর বাড়িতে বড়ো বড়ো নেতাদের দেখা পেয়েছিল। তাঁদের মধ্যে প্রধান ছিলেন সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী, উমেশচন্দ্র ব্যানার্জী, দুর্গামোহন দাস, দ্বারকানাথ গাঙ্গুলী। এঁরাই কংগ্রেসের হাল ধরে রেখেছিলেন। স্বর্ণ যা শুনত তা থেকে তার ধারনা হল যে এইসব নেতার প্রধান বক্তব্য হল মহারাণীর শাসনের চেয়ে উত্তম শাসনব্যবস্থা ভারতবর্ষের মানুষ কোনদিনই পায়নি। কিন্তু শিক্ষিত ভারতীয়রা ইংরেজ শাসকদের থেকে কখনই যথাযোগ্য সন্মান পাননি। সুতরাং সাংবিধানিক উপায়ে কংগ্রেসকে ভারতীয়দের প্রাপ্য অধিকার আদায় করে নিতে হবে। 'সাংবিধানিক' শব্দটির প্রকৃত অর্থ স্বর্ণ ভালোভাবে বোঝেনি। বারবার শুনে শুনে শব্দটা তার মুখস্থ হয়ে যায়। ধর্মকান্তের বলা কথাগুলি কিন্তু স্বর্ণর একেবারে যেন নতুন ধরনের মনে হল। তার মতে ইংরেজ সরকার হল ভারতের প্রধান শত্রু। এই সরকারকে বিদায় দিয়ে দেশীয় সরকার গঠন করতে পারলে দেশের উন্নতি হবে। অসমীয়া ছাত্রদের মধ্যে দু-একজন ধর্মকান্তের কথা সমর্থন করল। কিন্তু তাঁরা কংগ্রেসের কাজে লেগে গিয়েছিলেন। এটা কি করে সম্ভব হল স্বর্ণ বুঝতে পারেনি।

রাজনৈতিক লোকদের মধ্যে স্বর্ণর সবথেকে ভালো লাগত ডাক্তার কাদম্বিনী গাঙ্গুলীকে। কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজ থেকে পাশ করা তিনিই প্রথম ভারতীয় মহিলা। সবক্ষেত্রে জ্বলজ্বল করা উপযুক্তা এই বিদূষী মহিলাটিকে স্বর্ণ ছোটবেলা থেকেই দেখছে। দ্বারকানাথ

গাঙ্গুলীর সঙ্গে তাঁর বিয়ে হবার পরে গুণাভিরাম বহুদিন পর্যন্ত তাঁদের সঙ্গে যাওয়াআসা বজায় রাখেন নি। পরে অবশ্য তাঁর মনের পরিবর্তন হয়। গুণাভিরাম স্বর্ণকে সবসময় কাদম্বিনীর আদর্শ দেখিয়ে বলতেন — এই পৃথিবীতে মেয়েরা কোনদিক থেকেই ছেলেদের চেয়ে নীচু নয়।

একদিন কাদম্বিনী স্বামী দ্বারকানাথের সঙ্গে স্বর্ণদের বাড়িতে এসেছিলেন। আমেরিকার শিকাগো শহরের বিখ্যাত প্রদর্শনীতে ভারতের প্রতিনিধি রূপে তিনি যাবেন। যাবার আগে তিনি গুণাভিরামকে প্রণাম করতে এসেছিলেন। গুণাভিরাম কিছু একটা চিন্তা করে হঠাৎ ভেতরে ঢুকে একজোড়া নতুন কারুকার্য করা পাটের বিহামেখলা এনে কাদম্বিনীর হাতে দিয়ে বললেন,

"এইজোড়া কাপড় তুমি শিকাগোতে পরবে। দেখাবে যে অসমীয়া মহিলারা কিরকম কাপড় পরেন।"

স্বর্ণ কাপড়জোড়া দেখে চিনতে পারল। সেই জোড়া কাপড় মায়ের জন্যে বাবা নগাঁও থেকে শখ করে এনেছিলেন। মায়ের পরাই হল না। কাদম্বিনী হেসে - হেসে স্বর্ণকে বললেন, "আমাকে এই কাপড় কিভাবে পরতে হয় শিখিয়ে দাও তো। ঠিকমতো না পরলে কাপড়জোড়ার মর্যাদা ক্ষুন্ন হবে।"

স্বর্ণ ভেতরে নিয়ে গিয়ে তাঁকে কাপড়টি পরিয়ে দিল। কাদম্বিনীর ব্যক্তিত্বকে কাপড়জোড়া যেন সঠিকভাবে ফুটিয়ে তুলল। স্বর্ণ ভাবল, সত্যি সত্যি কাদম্বিনী যদি অসমীয়া মহিলা হতেন তাহলে অসমে তাঁকে নিয়ে কেমন গর্ব করতে পারা যেত! কখনো কি অসমীয়া মহিলাদের মধ্যে থেকে ডাক্তার বেরোবে?

চার

পুরনো বৈঠকখানা লেনের বাড়িতে স্বর্ণরা একবছরও শান্তিতে থাকতে পারল না। মায়ের মৃত্যুর কয়েকমাস পরে করুণারও একটা কালব্যাধি আরম্ভ হল। বেচারা সে বছর এন্ট্রান্স পরীক্ষা দিচ্ছিল। সকলেরই আশা ছিল যে সে সুখ্যাতির সঙ্গে উত্তীর্ণ হবে। ছোটবেলা থেকেই করুণা ঠান্ডা প্রকৃতির। সব ছেলে মেয়েদের মধ্যে তার পড়াশুনোর প্রতি বেশি উৎসাহ। নগাঁওতে থাকার সময় বাবার উৎসাহে তাদের স্কুলে সে 'লরাবন্ধু' (ছেলে বন্ধু) নামে একটি ছেলেদের পত্রিকা বার করেছিল, স্বর্ণ তার বান্ধবীদের কাছে সবসময় করুণাকে নিয়ে গর্ব করত। সে ভাবত তার এই তীক্ষ্ণ মেধাবী ভাইটি একদিন আই. সি. এস. হবেই।

এন্ট্রান্স পরীক্ষা শেষ হবার ঠিক পরেই করুণার একদিন তীব্র কাঁপুনী দিয়ে জ্বর উঠল। ওষুধ- পত্র খাওয়ার পরে জ্বর যদিও বা একটু কমল তবু একেবারে ভাল হলনা। কলিকাতায় দেশী বিদেশী ভালো-ভালো ডাক্তার-কবিরাজ যত ছিল সকলের সঙ্গে আলোচনা করেও

যখন সুফল পাওয়া গেল না তখন গুণাভিরাম ঠিক করলেন করুণাকে নিয়ে পুরুলিয়া যাবেন। ডাক্তাররা বলেছিলেন যে শুকনো জায়গায় গেলে অসুখটা ভালো হতে পারে। দুটি কাজের মানুষকে নিয়ে গুণাভিরাম আর করুণা পুরুলিয়া গেলেন। যাবার সময় স্বর্ণকে কাছে ডেকে নিয়ে গুণাভিরাম বললেন,

"সোনামা, কমলা আর জ্ঞানকে তোর হাতে দিয়ে গেলাম। তুইই এখন তাদের মা - বাপ সব।"

স্বর্ণ হাসিমুখে বাবা এবং ভাইকে বিদায় দিল। ভাবল, পুরুলিয়া থেকে সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে ভাই ঘুরে আসবে। জীবন-মৃত্যু সম্পর্কে স্বর্ণর অভিজ্ঞতা তখন ও হয়তো যথেষ্ট হয় নি। সে ছিল তাই আশাবাদী। কিন্তু পুরুলিয়াতে ও করুণার অবস্থার কোন উন্নতি হল না। নিরুপায় হয়ে গুণাভিরাম ছেলেকে নিয়ে বিহারের মধুপুরে গেলেন। কেউ একজন উপদেশ দিল যে মধুপুর স্বাস্থ্যকর জায়গা। স্বর্ণ স্থির করল বাড়ির সবকটা ছেলে-মেয়েদের নিয়ে মধুপুরে যাবে। করুণাকে এতদিন একলা শুশ্রূষা করাটা বাবার পক্ষে কত কষ্টকর হচ্ছিল তা সে বুঝতে পেরেছিল। তার ওপর অচেনা (অজানা) জায়গা। বিপদে আপদে সহায়তা করার জন্যে সেরকম বন্ধু-বান্ধব ও সেখানে নেই। স্বর্ণ সেইসময়ে তাঁদের কলকাতায় থাকা আত্মীয় নবীনরাম ফুকনকে তাদের সঙ্গে মধুপুর যেতে বলল। বিপদে আপদে নবীনরাম আর জীবনরামকে গুণাভিরাম অনেক সাহায্য করেছেন। স্বর্ণ জানত যে বাবার পরে স্বর্গীয় আনন্দরাম ঢেকিয়াল ফুকনের বংশের এইসব লোকেরাই তাদের আপনজন।

নবীনরামের সঙ্গে তারা সকলে মধুপুরে গেল। রেলের প্রথম শ্রেণীর কামরাতে উঠে নতুন জায়গায় যাত্রা করার উৎসাহে সবাই ভুলে গেল যে কি উদ্দেশ্যে এই ভ্রমণ। মধুপুরে পৌঁছে সকলের মনখারাপ হয়ে গেল। করুণা শয্যাগত। কোনো ওষুধেই কাজ দিচ্ছে না। দিন-রাত্রি গুণাভিরাম শুশ্রূষা করছেন। রোগীকে মুরগীর সুপ্ খাওয়ানো ভালো। কিন্তু বাঁধুনী বামুন এইসব জিনিষ ছোঁবে না। সুতরাং স্বর্ণ নিজে একটি কেরোসিনের স্টোভে সুপ্ তৈরি করে। করুণা জ্বরতপ্ত গায়ে মুখের ম্লানহাসি দিয়ে দিদির রান্নার প্রশংসা করে। স্বর্ণর চোখদুটি জলে ভরে যায়। সে বারেবারে ভগবানের কাছে প্রার্থণা করে যে করুণা যেন ভালো হয়ে যায়! কলকাতা থেকে খবর আসে যে করুণা প্রথমবিভাগে এন্ট্রান্স পাশ করেছে। খবরটা পেয়ে সে স্বর্ণর দিকে চেয়ে বিষাদভরা কণ্ঠে বলে, "দিদি, আমার বোধহয় প্রেসিডেন্সী কলেজে পড়া হবে না।" স্বর্ণ বারবার তার চুলে হাত বুলিয়ে বলে, "করুণা তুই ভালো হয়ে যাবি রে! আমরা ফিরে গিয়ে তোকে কলেজে ভর্তি করে দেবো।"

কিন্তু করুণার আর কলকাতাতে ফেরা হল না। মধুপুরেই সকলকে কাঁদিয়ে সে বিদায় নিয়ে আনন্দধাম যাত্রা করল। গুণাভিরাম যখন বুঝতে পারলেন যে সব শেষ হয়ে যাবে, তখন পুত্রের শিয়রে বসে গোটারাত্রি গীতাপাঠ করলেন। স্বর্ণ নির্বাক নিশ্চলভাবে কাছে বসে একান্ত-মনে ভগবানকে ডাকতে লাগল। সে তখনও বুঝতে পারেনি যে করুণার অন্তিমকাল এসে পড়েছে। কখন যে তার জীবন-দীপ নিভে গেল সে বুঝতে ও

পারল না। পরের দিন সকালে ব্রাহ্মরা "ঐযে দেখা যায় আনন্দধাম" গাইতে গাইতে করুণার দেহ বয়ে নিয়ে গেল। বিষ্ণুপ্রিয়াকে নিয়ে যাবার সময়ও এই গানটিই গাওয়া হয়েছিল। শান্ত গম্ভীর কণ্ঠে গাওয়া গানটি স্বর্ণর অন্তরকে হাহাকারে ভরিয়ে দিল।

পাঁচ

কলকাতায় ফিরে এসে আবারও ভাড়ার ঘর পাল্টানোর পর্ব শুরু হল। করুণার স্মৃতি-বিজড়িত পুরনো বৈঠকখানা লেনের বাড়িটাতে গুণাভিরাম একরাত্রিও থাকতে চাইলেন না। কলেজ স্কোয়ারে একটি ঘরভাড়া নেওয়া হল। তারপরে তাড়াহুড়ো করে আবারও ঘর সাজানো। নতুন পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেবার সমস্যা। আগের কয়েকবার ভাড়া বাড়ি নেওয়ার সময় গুণাভিরাম নিজেই হাজির থেকে আগে জিনিস পত্র গোছগাছ করাতেন। বাড়িঘর পরিপাটী করে সাজানোর তাঁর শখ ছিল কিন্তু এবার যেন কোনকিছুতেই স্পৃহা নেই। স্বর্ণকে ব্যস্ততার সঙ্গে কাজ করতে দেখে তিনি দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, "তোর বড্ড কষ্ট হচ্ছে, নারে মা? আমি তোদের কোন সুখই দিতে পারলাম না। ভেবেছিলাম যে পেন্সন পেয়ে এখানে বাড়ি ঘর তৈরি করে নেবো জমিও কিনেছিলাম। কিন্তু অদৃষ্ট কিছুই হতে দিল না।"

বাবাকে এত অসহায় হয়ে পড়তে স্বর্ণ কখনো দেখেনি। তিনি যেন ভেতরে ভেতরে মরে যাওয়া একটি গাছের মতো দাঁড়িয়ে আছেন। তাঁকে দেখে স্বর্ণর মনটা হাহাকার করে ওঠে। তার এখন একমাত্র আশ্রয় 'বাবা'। তিনি যদি এভাবে ভেঙে পড়েন তাহলে তার কি হবে? ছোট ছেলেকে বোঝাবার মত সে বলল,

"ও রকম ভাবে কেন বলছ, বাবা? এখনো ঘরবাড়ি বানানোর অনেক সময় আছে। তুমি নতুন বাড়ি তৈরী করলে আমরা সকলে সেখানে কেমন আনন্দে থাকব।"— স্বর্ণ জোর দিয়ে কথাগুলি বলে ওঠে।

"না মা সোনা, আমার জন্যে এখন আর একটিই ঘর আছে। সেই আনন্দধামে। তাতে মাও আছেন, করুণাও আছে। এই পৃথিবীতে আমার সব আশাই শেষ হয়ে গেছে। অনেক শখ করে সংসার পেতেছিলাম, মা। প্রথমে অকালে ব্রজসুন্দরী আমাকে ছেড়ে চলে গেল। তারপরে তোর মায়ের সঙ্গে কতসুখের একটা সংসার পেতেছিলাম। তাও ভেঙে চুরে শেষ হয়ে গেল। ভেবেছিলাম সমাজের অভিশাপের প্রতিভ্রুক্ষেপ না করে আমি একা একা দেশাচারের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে পারব। কিন্তু বিধাতা তাতেও বাদ সাধলেন।"

শেষের কথাগুলি বলবার সময় মানুষটি হাউহাউ করে কেঁদে ফেলেছিলেন। স্বর্ণ স্থির হয়ে বসে পড়েছিল। বাবাকে কি বলে সে সান্ত্বনা দেবে? ঘরটির জানালার কাছে দাঁড়িয়ে সে বাইরের ব্যস্ত পৃথিবীর দিকে তাকিয়ে ভাবল, এখন সে সম্পূর্ণ একলা। আস্তে আস্তে

ছোট হয়ে যাওয়া পরিবারটিকে তাকেই ধরে রাখতে হবে। ঈশ্বর তাকে এত মনোবল দেবেন কি?

করুণার মৃত্যুর পরে গুণাভিরাম বরুয়া আর কোনদিনই আগের মতো মানসিকভাবে সক্ষম হয়ে উঠতে পারলেন না। নিজের বন্ধু-বান্ধব এলে কিছুক্ষণের জন্যে স্বাভাবিক হয়ে ওঠেন। তারপরে আবার নিজের চিন্তাতে ডুবে যান। তাঁর খবর নিতে মাঝে মাঝে আসতেন আনন্দমোহন বসু, দুর্গামোহন দাস, শিবনাথ শাস্ত্রী ও গুরুচরণ মহলানবিশ। অনেক মজার বা রসিকতার কথা বলে তিনি আনন্দ দিতেন। কিন্তু গুণাভিরামকে কিছুই যেন আর আগের মতো আকৃষ্ট করতে পারত না। সাহিত্যচর্চার প্রতি তাঁর মনকে ফিরিয়ে আনবার জন্যে হেম গোঁসাই আর লক্ষ্মীনাথ বেজবরুয়া অনেক চেষ্টা করেছিলেন। তাঁদের তাগিদায় কখনো হয়ত গুণাভিরাম 'অলিখিত বুরঞ্জী'র পরবর্তী কিস্তিটা লিখতে বসতেন। কিন্তু লেখা আর হয়ে উঠত না। দুলাইন লেখার পরে চিন্তার খেই হারিয়ে যায়। 'বিজুলী'র নতুন সংখ্যাটি দেবার জন্যে পদুনাথ গোঁহাই বরুয়া এলেন। গুণাভিরমের 'আসামযাত্রা' সেখানে ধারাবাহিক ভাবে বেরোচ্ছে। একবছর আগে গোটা পান্ডুলিপি তিনি গোঁহাই বরুয়াকে দিয়েছিলেন। নাহলে সেটিও হয়ত অর্ধ - সমাপ্ত হয়ে থেকে যেত।

কলেজ স্কোয়ারের বাড়িটি স্বর্ণর ভালো লাগত। দুপা দূরেই সমস্ত স্কুল - কলেজ। কমলা ও জ্ঞানের খুব সুবিধে হল। ভাইদের সঙ্গে স্বর্ণ কখনো কখনো কাছের দু - একটি বইয়ের দোকানে যাতায়াত করত। বঙ্কিমচন্দ্রের প্রত্যেকটি উপন্যাসই সে কিনে এনে পড়েছিল। গুণাভিরাম অনেক আগেই মাইকেল মধুসূদন দত্তের '' মেঘনাদ বধ' কাব্যখানি কিনেছিলেন। কিন্তু ''বীরাঙ্গনাকাব্যে''র কথা বাবার মুখে প্রায়ই শুনলেও তখন পর্যন্ত ও স্বর্ণ সেটি পড়েনি। একদিন এক বইয়ের দোকানে কাব্যখানি দেখতে পেয়ে সে আনন্দিত চিত্তে সেটি কিনে এনে বাবাকে দিল। সেইদিন বিকেলে অনেকদিন পরে গুণাভিরাম আগের মতো প্রফুল্ল চিত্তে কবিতা পড়লেন। উদাসকণ্ঠে মাইকেলের কবিতা পড়ে তিনি মেয়েকে নারীমুক্তির তাৎপর্য বুঝিয়ে দিলেন। সেদিন স্বর্ণ অভিভূত হয়ে গেল। তার মনে এক বিপুল আত্মবিশ্বাসের সঞ্চার হল।

পরেরদিন ভোরবেলা সব ওলট পালট হয়ে গেল। গুণাভিরামের তীব্র কম্প দিয়ে জ্বর উঠল। স্বর্ণের চেনা অতি পরিচিত সেই জ্বর। গুণাভিরাম যেন বুঝতে পেরেছিলেন যে তাঁর দিনও শেষ হয়ে আসছে। এক দিন যখন একটু জ্বর কমল তখন তিনি স্বর্ণকে ডেকে বললেন, ''মা, এইবার আমি ও যাবার জন্যে প্রস্তুত। এখন বাকি সব দায়িত্ব তোর ওপর। জ্ঞান আর কমলাকে মানুষ করবি। নিজের পায়ে দাঁড়াতে শেখাবি।'' স্বর্ণর রোগা হাতখানি নিজের গরম হাত দুটির মধ্যে নিয়ে তিনি বলে গেলেন,''তুই মেয়ে হলেও পারবি সোনা মা। তোকে আমি শিক্ষা - দীক্ষা দিয়েছি। তোর শরীরে আছে আমার আর তোর মায়ের রক্ত। তুই পারবি।''

দিনগুলি ঝড়ের মতো পার হয়ে যাচ্ছিল। চেনা মুখগুলির পুনরাগমন হল। ডাঃ

নীলরতন সরকার, ডাঃ বিপিনবিহারী সরকার, ডাঃ ক্রম্বি, ডাঃ কাদম্বিনী গাঙ্গুলী — এতগুলো বড় বড় ডাক্তার সেই অচেনা রোগের কাছে হার মেনে গেলেন। আটনম্বর কলেজ স্কোয়ারের বাড়িটাতে যত আসাম আর বঙ্গের সবকটি উজ্জ্বল জ্যোতিস্কের একসঙ্গে আবির্ভাব ঘটেছিল। সকাল থেকে সন্ধ্যে পর্যন্ত সবসময়ে বাড়িতে ভিড় লেগেই থাকে। স্বর্ণই মাঝে মাঝে লোকজনদের সঙ্গে কথা বলে, না হলে বাবাকে ওষুধ ও পথ্য দেয় আর কাজের ফাঁকে নিজের ঘরে এককোণে বসে চোখের জল ফেলে। কিন্তু তার কাঁদবারই বা সময় কোথায়? খুকী আর ছোটর অবস্থা দেখে সে যেন নিজের দুঃখের কথাও ভুলে যায় -বেচারী মেয়েদুটি যেন মৃত্যুর কোলে জন্ম নিয়েছিল। রোগ, ডাক্তার, মৃত্যু এরা সব তাঁদের জীবনের নিত্যসঙ্গী হয়ে উঠল। জ্ঞান আর কমলা বড় হয়েছে। তারা অনেক কমবয়সে অনেকবেশি দায়িত্ব নিতে পারে। ডাক্তার ডাকা, ওষুধ কেনা, রোগীর জন্যে বাজার থেকে ফল - মূল, মুর্গী আনা ইত্যাদি একশটা কাজে তারা হয়ে উঠল স্বর্ণর ডানহাত।

ভবিষ্যতের কথা না ভেবে স্বর্ণ যান্ত্রিকভাবে নিজের কাজগুলি করে যাবার চেষ্টা করে। বাবা না থাকলে তার, তার মেয়েদুটির এবং ভাই দুটির কি হবে এসব ভাবনা সে জোর করে মন থেকে দূরে সরিয়ে দেয়। এতগুলি বড় বড় ডাক্তার বাবাকে দেখছেন, কি জানি হয়তো অসম্ভবকে সম্ভব করে তিনি ভালো হয়ে উঠবেন? শেষ পর্যন্ত স্বর্ণ বিশ্বাস হারায় নি। কিন্তু যখন সেই অনিবার্য নিষ্ঠুর ক্ষণটি এসে পড়ল এবং আরও একবার ঘরটিতে ''ঐ যে দেখা যায় আনন্দধাম'' শোনা গেল, স্বর্ণ কানে আঙুল দিয়ে সেই চরম সত্য থেকে পালাবার পথ খুঁজল। মৃতের শেষযাত্রার আয়োজনের সব কথাই তার কানে আসছিল — প্রত্যেকটি কথাই তার পরিচিত। ভাড়ার গাড়িতে শ্মশানে নিয়ে যাওয়া হবে। সঙ্গে শশ্মানযাত্রী হবে জ্ঞান, কমলা এবং দুজন ব্রাহ্মবন্ধু কিন্তু হঠাৎ স্বর্ণ শুনতে পেল এক সম্পূর্ণ ভিন্ন সুর। কলকাতার অসমীয়া ছাত্রেরা সংকীর্তণ গাইছে। 'বিল্বকুটীর'— এর গোঁসাই ঘরটি স্বর্ণর চোখের সামনে ভেসে উঠল — সঙ্গে অন্যান্য ভালোবাসার স্মৃতি। সে সশব্দে কেঁদে উঠল। এরকম সময়ে সে লক্ষ্মীনাথ বেজবরুয়ার কণ্ঠ শুনতে পেল, ''স্বর্ণ, আমরা অসমীয়া ছেলেরা 'বাবাকে' — কাঁধে করে নিয়ে যাবো। তিনি আমাদের সকলের পিতৃতুল্য ছিলেন।'' স্বর্ণ কিছুই বলল না। কিন্তু বাবার বলা কয়েকটি পুরনো কথা তার মনে পড়ে গেল, ''আমি মরে গেলে আমাকে কাঁধে নেবার জন্যে কোনো অসমীয়া মানুষ খুঁজে পাওয়া যাবে না।''

ছয়

স্বর্ণর বড়ভাসুর রজনীনাথ রায় কলকাতার একজন উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারী। তিনি গুণাভিরাম মারা যাওয়ার পরদিনই স্বর্ণ আর ছেলে - মেয়ে সবাইকে নিজের ঘরে নিয়ে

গেলেন। বাবার মৃত্যুতে শোকে এমনিতেই কমলা আর জ্ঞান ব্যাকুল হয়ে পড়েছিল। তারপর হঠাৎ নিজেদের ঘর - বাড়ি ছেড়ে অন্যের ঘরে অতিথি হওয়ার জন্যে ছেলেদুটি একেবারে ভেঙে পড়ল। তাদের অবস্থা দেখে স্বর্ণ নিজের অসহায় অবস্থার মাঝখানেও একটা সিদ্ধান্ত নিল যে তার যত কষ্টই হোক না কেন, ভাইদের কথা ভেবে তাকে আলাদাভাবে সংসার পেতে থাকতেই হবে। বড়ভাসুরকে কথাটা বুঝিয়ে বলে সে কলেজ স্কোয়ারের বাড়িটিতে ফিরে যাবার ইচ্ছে প্রকাশ করল। কিন্তু গুণাভিরামের ব্রাহ্ম বন্ধুরা ইতিমধ্যে স্বর্ণকে কোনকিছু জিজ্ঞেস না করেই বাড়ির সমস্ত জিনিষপত্র গুছিয়ে তের নম্বর কর্ণওয়ালিস্ স্ট্রীটের ব্রাহ্ম মেয়েদের বোর্ডিং এর দুটি ঘরে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। তাঁদের ধারনা হয়েছিল যে অভিভাবকহীন একজন অল্প বয়সের মহিলার ভাড়াবাড়িতে থাকাটা উচিত নয় স্বর্ণ ভেতরে ভেতরে রাগ হয়ে গেল। সবাই কেন ধরে নিয়েছে যে সে দুর্বল, অসহায়? যখন বিষ্ণুপ্রিয়া স্বয়ং একলা কলকাতায় ছিলেন, তখন তো কেউই তাঁকে কিছু বলেনি বা বলতে সাহস পায় নি? সে বিধবা বলেই তার মনোবল কম একথা সবাই ভাবছে নাকি? স্বর্ণর মনে মনে জেদ চেপে যায়। বাবা তাকে বিশ্বাস করে তার হাতে ভাইদের দায়িত্ব সঁপে দিয়ে গেছেন। এখন সে যদি অন্যের ঘরে থেকে, পরের ওপর নির্ভর করে তাদের বড় করে (তবে) বাবাকে ভীষন অপমান করা হবে।

স্বর্ণ ব্রাহ্মগার্লসের বোর্ডিং-এ চলে গেল। কিন্তু বোর্ডিং এর কর্মকর্তারা তাকে ভাইদের সঙ্গে রাখার অনুমতি দিলেন না। শেষে উপায় না পেয়ে সামনের ব্রাহ্ম ছেলেদের এক বোর্ডিং এ কমলা আর জ্ঞানকে রাখা হল। বোর্ডিং এর খাওয়া তারা কেউই খেতে পারত না। এতদিন ঘরের রাজসিক খাওয়ায় অভ্যস্ত হয়ে পরে বোর্ডিংয়ের ঝালঝাল ঝোল আর মোটা চালের ভাত গেলাটা তাদের পক্ষে ছিল অসম্ভব। খুকী আর ছোট প্রথমে খাওয়াদাওয়া ছেড়ে দিয়েছিল। কিন্তু তাদের অবস্থা দেখে পরে দুর্গামোহন দাস এবং অন্যান্য ব্রাহ্মবন্ধু স্বর্ণর নিজে রেঁধে বেড়ে খাওয়ার ব্যবস্থা করে দিলেন। এই হবার পরে খুকীদের যদিও অল্প স্বাচ্ছ্যন্দ দেওয়া গেল, কিন্তু ভাইদের দুঃখ দেখে স্বর্ণর মন বিষাদে ভরে গেল। ভালো একটি ভাড়ার ঘরের ব্যবস্থা করে দেবার জন্যে সে বড় ভাসুর আর আনন্দমোহন বসু কে অনুরোধ করল।

এই বিপদের সময় নিজের দুঃখকে ভোলবার জন্যে স্বর্ণ পেয়েছিল তিন বান্ধবীকে — হেমপ্রভা, চারুপ্রভা এবং লাবণ্যপ্রভা। এই তিন দিদি বোন তাকে প্রথম কলিকাতায় পা দেবার পর থেকেই নিজেদের সহোদরা বোনের মত স্নেহ করতেন। গুণাভিরাম মারা যাওয়ার দিনটিতে সারারাত্রি তাঁরা স্বর্ণ এবং ভাইদুটির সঙ্গে কাটিয়েছিলেন। স্বর্ণ ব্রাহ্মগার্লসে আসার কয়েকদিন পরে তিনজনে অত্যন্ত চিন্তিত ভাবে একদিন তাঁর কাছে এলেন। একটু ইতস্ততঃ করে লাবণ্যপ্রভা স্বর্ণকে বললেন,

"আচ্ছা স্বর্ণ, বলতো, তোমার বাবার দিকের আত্মীয়দের সঙ্গে তোমাদের কি সদ্ভাব ছিল না?"

স্বর্ণ অবাক হয়ে উত্তর দিল, ''কেন? বাবা তো দেখতাম সবসময়ই নিজের আত্মীয় স্বজনকে বড় বেশি স্নেহ করতেন। এখানে কতজনকে নিজের কাছে রেখে চিকিৎসা করলেন, ঘোরালেন। মাঝে মাঝে বিপদে আপদে বাবাই অসমের আপন লোকজনদের টাকাপয়সাও পাঠাতেন।''

লাবণ্যপ্রভা আর তাঁর বোন দুজনেই স্বর্ণর কথা শুনে অসন্তুষ্টিতে মাথা নাড়লেন। স্বর্ণর হাত ধরে যতদূর সম্ভব নরম সুরে হেমপ্রভা বললেন,

''মানুষ যে এমন নিষ্ঠুর আর অকৃতজ্ঞ হতে পারে তা এখন বুঝতে পারছি। গতকাল দাদা এসে বললেন যে অসম থেকে তোমাদের দুজন আত্মীয় এসে বলছেন যে গুণাভিরাম বরুয়ার আসল উত্তরাধিকারী নাকি তাঁরাই। তাঁরা নাকি সম্পত্তির জন্যে আদালতে কেসও করবেন।''

''কিন্তু জ্ঞান আর কমলা থাকা সত্ত্বেও বাবার সম্পত্তি অন্যে কেন দাবী করবে?''

''বুঝেছ স্বর্ণ, এই সংসারে আশ্চর্য আশ্চর্য ঘটনাই ঘটে থাকে। তোমাদের আত্মীয় স্বজনেরা বলতে চাইছে যে তোমার মা বাবার বিবাহটা নাকি বৈধ ছিল না, কারণ ব্রাহ্ম বিয়ে হল অবৈধ। সুতরাং তোমারা তোমার বাবার আসল উত্তারাধিকারী হতে পাব না।''

স্বর্ণ উত্তেজনায় ঠকঠক করে কাঁপতে কাঁপতে বলল, ''এত নীচ এই লোকেরা ? আমরা যখন বিপদে পড়েছিলাম তখন একবার ডাকার মতোও কেউ ছিল না। আর এখন সম্পত্তি চাইতে এসেছে। আমাদের দুর্বল ভেবে সবাই ঠকাতে চাইছে। আমি এদের দেখিয়ে দেবো যে আমিও যুদ্ধ করতে পারি। মা - বাবা আমাকে এমনি এমনি বেথুনে পড়ান নি?''— স্বর্ণর কণ্ঠস্বর আবেগে আপ্লুত হয়ে গেল। কিন্তু জোর করে ঠোঁট দুটি কামড়ে সে নিজের চোখের জল সামলালো। হেমপ্রভারা তাকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে শান্ত করে বলল,

''তুমি চিন্তা করো না স্বর্ণ। একজন নামকরা উকিল যদি তোমার পক্ষ নেন, তাহলে তোমার জয় হবেই। কিন্তু তোমাকে একটা কাজ করতে হবে। সেইজন্যেই আমরা এসেছি। বাবার কাগজ - পত্রের মাঝে যদি তাঁর বিয়ের রেজিস্ট্রেশনের কাগজের কপিটি পাও তাহলেই সব সমস্যার ইতি। দাদার মতে সর্বপ্রথম অসমে তিনি তাঁর বিয়েটি রেজিস্ট্রী করিয়েছিলেন।''

হেমপ্রভারা যাওয়ার পরে সেদিন স্বর্ণ অনেকক্ষণ একা একা বসে কাঁদল। যে দুজন মানুষ পৃথিবীর সব অশান্তি থেকে মুক্তি পেলেন তাঁদের বিয়ের বৈধতা প্রমান করতে যাওয়াটা কি তাঁদের পবিত্র স্মৃতিতে কলঙ্ক লেপন করার সামিল হবে না? কী দরকার এইসব প্রমান পত্রের? কিন্তু পরমুহূর্তেই সে বুঝতে পারল যে আইন, দেশাচার, লোকাচার, এই শেকল গুলো তাকে জড়িয়ে ধরে রেখেছে। তাই ইচ্ছে করলেই সে পালাতে পারবে না। নিজের জন্যে না হলেও ভাইদের কথা ভেবেই নোংরা কাদায় তাকে নামতে হবে। না হলে তাদের কে দেখবে?

সেদিন অনেক রাত্রি পর্যন্ত স্বর্ণ বাবার কাগজ রাখার বাক্সগুলি খুলে তার মাঝে দরকারী কাগজখানি খুঁজতে শুরু করল। সব কাগজপত্র এলোমেলো হয়ে আছে। স্বর্ণ যতদূর সম্ভব যেসব জায়গায় থাকতে পারে, যত্ন করে খুঁজল। কিন্তু এত কম জায়গায় সবকিছু ভালো করে রাখাটা অসম্ভব। স্বর্ণ কাগজখানি পাওয়ার আশা ছেড়েই দিল। কিন্তু শেষে যত্নে বেঁধে রাখা একটি ফাইলের মধ্যেই সেই মূল্যবান কাগজখানি স্বর্ণ খুঁজে পেল। পরদিন কাগজখানি আনন্দমোহন বসুকে দেবার ফলে কেসটি স্বর্ণদের পক্ষেই নিষ্পত্তি হল। দুর্গামোহন দাসের পরামর্শ অনুযায়ী আইনমতে স্বর্ণকে ভাইদের অভিভাবিকা আর গুণাভিরামের সমস্ত সম্পত্তির ট্রাস্টি করে দেওযা হল। অন্যজন ট্রাস্টি ছিলেন দুর্গামোহন দাসের জামাই 'স্যার' জগদীশচন্দ্র বসু।

সাত

নগাঁও সরকারী হাসপাতালটির পরিসর বৃদ্ধি করার কথা যখন উঠল তখন উচ্চ প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত নার্সের প্রয়োজনও অনুভব হল। হাসপাতালের ইংরেজ ডাক্তার তারার কাজকর্মে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হয়ে তাকে কলকাতায় ছয়মাস প্রশিক্ষণের জন্যে মনোনীত করলেন। প্রথমে তারার ছেলেমেয়েদুটিকে হেণরীর কাছে একা রেখে খুব একটা যেতে ইচ্ছে করল না। শেষে হেণরীর আগ্রহে সে রাজি হল।

ব্রণ্সন সাহেবের সঙ্গে আমেরিকা যাওয়ার সময় তারা কলকাতায় আগেও একবার গিয়েছিল। তাই কলকাতা তার কাছে সম্পূর্ন অচেনা নয়। তবুও নার্সের প্রশিক্ষণের ব্যস্ততায় প্রথম কিছুদিন সে স্বর্ণর কথা ভাববারই সময় পেল না। ধর্মকান্তকে দেওয়া পুরনো বৈঠকখানা লেনের ঠিকানায় সে স্বর্ণকে নগাঁওর থেকেই একটি চিঠি দিয়েছিল। কিন্তু সেই চিঠির কোনো উত্তর আসে নি। একদিন কলকাতার মেডিক্যাল কলেজে পড়া নগাঁওর খ্রীস্টান একটি মেয়ের কাছে সে জানতে পারল যে ডাঃ বিপিন বিহারী সরকার গুণাভিরাম বরুয়ার পরিবারটিকে ভালোভাবে চেনেন। তারা যেন হাতে স্বর্গ পেল। ডাঃ সরকারকে মেডিক্যাল কলেজে খুঁজে পেয়ে সে সমস্ত খবরই জানতে পারল। গুণাভিরাম বরুয়ার মৃত্যুর পরে স্বর্ণ প্রথমে মেয়েদুটিকে নিয়ে কর্ণওয়ালিস স্ট্রীটের ব্রাহ্মবোর্ডিং এ আর তার পর বির্জিতলার একটি বাড়িতে ছিল। ওখানে কমলা জ্বর হয়ে মারা যায়। তারপরে আবারও বাড়ি পাল্টে স্বর্ণ ভবানীপুরের জেলিয়া পাড়া রোডে আছে।

পরদিনই তারা ভবানীপুরের ভাড়াবাড়িটি খুঁজে বের করল। স্বর্ণ ঘরে ছিল না। কাজের মেয়েটি তাকে বসতে দিল। মেয়েটি নগাঁওর ওর সঙ্গে তারা দু - একটি কথা বলল। সে বলল, স্বর্ণর সঙ্গে থাকবার জন্যে নগাঁও থেকে কালীদিদি আর তাঁর ছেলে প্রিয়নাথ এসেছে। তারা বৈঠকখানার চারিদিকে চোখ বুলিয়ে দেখল, ঘরটি ছোট হলে ও

বেশ পরিপাটি করে সাজানো। একটি কোণে বইয়ের আলমারী। তাতে রাখা বেশিরভাগ বইই গুণাভিরামের। 'আসাম - বন্ধু'র বাঁধানো দুটি ভলিউম ও আছে। দেওয়ালে ফুলের মালা দিয়ে সাজিয়ে রাখা পরপর চারিটি বাঁধানো ফটো একটি বিষ্ণুপ্রিয়া আর গুণাভিরামের যুগল ছবি। অন্যদুটি সুকুমার মুখের দুটি বালকের — করুণাভিরাম আর কমলাভিরাম। তারার চিনতে খুব অসুবিধে হল না। চতুর্থ ছবিটি সাহেবী পোষাকে একজন যুবকের। প্রায় আঠারো বছর আগে 'বিল্বকুটীরে' দেখা স্বর্ণর স্বামী ডাঃ নন্দকুমার রায়ের চেহারা সে মনে আনতে চেষ্টা করল। সেটি নিশ্চয়ই তাঁরই ছবি হবে। তারার মনটি বিষাদে ভরে গেল, চারিদিকের এই বেদনাদায়ক স্মৃতির মধ্যে স্বর্ণর নাজানি কত একলা লাগে!

বাইরে একটি ঘোড়ার গাড়ি এসে থামল। গাড়ি থেকে স্বর্ণ আর একজন যুবক নেমে এল। তারা যুবকটিকে চিনতে পারল। স্বর্ণর কালীদিদির ছেলে প্রিয়নাথ। সে প্রায়ই 'বিল্বকুটীরে' - এ গিয়ে থাকত। স্বর্ণকে দেখে তারা অবাক্ হয়ে গেল। এত দুঃখকষ্টের মধ্যেও সে আগের মতোই সুন্দর আছে। অবশ্য তার গায়ের রংটা একটুখানি অনুজ্জ্বল হয়েছে। কপালে যদিও সিঁদুরের টিপটি নেই, তবুও রোদে লাল হওয়া মুখখানি টিপের অভাবে ম্লান হয়নি। মাথার ঘোমটা টেনে স্বর্ণ ভেতরে এল। সামনে তারাকে দেখতে পেরে সে তো অবাক্! তারপরে আনন্দে তাকে জাপটে ধরে হাউহাউ করে কেঁদে ফেলল। 'বিল্বকুটীরে'র সেই আঠারো বছর আগের সন্ধ্যেটির কথা মনে করে স্বর্ণ বলল, "আমার স্বপ্ন সব ভেঙে খানখান হয়ে গেল, তারা! আমি যে এখনও বেঁচে আছি এটাই আশ্চর্য কথা!" স্বর্ণ একটা একটা করে সব বিষাদের ঘটনা ব্যক্ত করছিল। স্বামী, পিতা, মাতা, করুণা, কমলা — যেন একদল মৃত আত্মার মৌন মিছিল তার সামনে দিয়ে চলে গেল। কমলার মৃত্যুর কথা বলবার সময়ে তার চোখের জল শুকিয়ে গেল।

"তাকে বাঁচানোর আমি অনেক চেষ্টা করেছিলাম, তারা। বেচারা সবকিছুতে আমার ওপর সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করত। শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত আমার হাতখানি আঁকড়ে ধরেছিল। প্রথম জ্বর আরম্ভ হওয়ার সময় আমার পরিচিত ডাক্তাররা বলেছিলেন যে দার্জিলিং এ গেলে হয়ত ভালো হয়ে যাবে। আমি জ্ঞান আর কমলাকে দার্জিলিং এ পাঠিয়েছিলাম। কিন্তু সেখানে যাওয়ার পর আরও বেশি হল। ফিরে এসে আমার সঙ্গে একমাস রইল। ডাক্তাররা অবশ্য বলেছিলেন যে তাদের সকলেরই কালাজ্বর হয়েছিল। অসমের লোকদের নাকি সেইরকম জ্বর হয়। কিন্তু আমাদের অসম ছেড়ে আসাতো কতদিন হয়ে গেল!"

"এইসব রোগের ধরণ - ধারণ বোঝাকষ্ট, স্বর্ণ। অনেক আগেই রোগ শরীরে ঢোকে লক্ষণগুলি প্রকাশ পায় বহুদিন পরে। আমি অনেককেই নগাঁওতে এই অসুখে ভুগতে দেখেছি। সেখানে এই রোগ মহামারী হয়ে দেখা দিয়েছিল।" কথার প্রসঙ্গ পাল্টানোর জন্যে তারা আবার বলল, "জ্ঞান কোথায় গেল স্বর্ণ?"

— "তাকে সকলের উপদেশে বিলেতে পাঠালাম। কমলা মারা যাওয়ার পর তার শরীর মন কিছুই ভালো যাচ্ছিল না। বেচারা একেবারে ভেঙে পড়েছিল। তাকে এই

কালব্যাধি থেকে রক্ষা করবার জন্যে আমি পাগলের মত হয়ে উঠেছিলাম। প্রথমে একজন ডাক্তারবন্ধুর সঙ্গে তাকে সাগরের বাতাসের জন্যে জাহাজে বোম্বাই পাঠালাম। ফিরে আসার পরে সবাই বলল যে বিলেতে গেলে হয়তো এই অসুখ থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে। প্রায় দুমাস হল ওকে পাঠানোর। সেখানে টাকা পাঠানোর ব্যবস্থা করতে আজ ব্যাঙ্কে গিয়েছিলাম। আমার এককালের স্কুলের বান্ধবী মিসেস্ গুপ্তের কাছ থেকে চিঠি পেয়েছি যে হাইগেটে মিসেস স্পীয়ারের সঙ্গে থেকে জ্ঞানের পড়াশুনোর ব্যবস্থা করা হয়েছে। শ্রীযুক্ত দুর্গামোহন দাস এবং ডঃ জগদীশ চন্দ্র বসু সব ব্যবস্থা করে দিয়েছেন।

"তুমি তারমানে এখন একা আছো?" তারা জিজ্ঞেস করল।

"কালীদিদি এবং ভাগনে প্রিয়নাথ এসে আছে। কিন্তু তারা সবসময় এখানে কেমন করে থাকবে? তারা চলে গেলে যে কি করব ভেবে পাচ্ছি না।"
ব্রাহ্মমেয়েদের স্কুলে চাকরী করার জন্যে আমাকে ডাকাডাকি করছে। কিন্তু খুকী আর ছোটকে ছেড়ে যেতে ইচ্ছে করে না। খুকীর তো সবসময় অসুখ লেগেই আছে। তার জন্যে আমার বড্ড চিন্তা।" স্বর্ণ মেয়ে দুটিকে ডেকে আনল। দুজনেই দেখতে সুন্দর। বড়োটির বয়স হবে প্রায় সাত বছর। কাছের একটি স্কুলে স্বর্ণ ভর্তি করে দিয়েছে।

সেদিন সারাটাক্ষণ দুই বন্ধুতে অনেক কথাবার্তা হল। স্বর্ণ নগাঁওর সব পরিচিতের খবর নিল। তারা একদিক থেকে যত পারে বলে গেল। পঞ্চানন শর্মা এখন অন্য দুজনের সাহায্যে একটি মেয়েদের প্রাইমারী স্কুল খুলেছেন। " লোকটি নরম মনের," — তারা বলল, "ধর্মদাদা জেলে যাওয়ার পরে তিনি লক্ষ্মীরও খবরাখবর করে থাকেন।"

ধর্মকান্তের প্রসঙ্গ ওঠার সঙ্গে সঙ্গে স্বর্ণ সবিশেষ জানবার জন্যে উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠল।

"ধর্মদাদার কি হল বল তো? আমাদের এখানে যখন এসেছিলেন তখন তিনি অসমের গরীব - চাষীদের হয়ে কোন একটি আর্জি নিয়ে এসেছিলেন। বাবার সঙ্গে সে বিষয়ে আলোচনা করতেও দেখেছিলাম।"

সেই সময় তিনি আমাদের বাড়িতে ও গিয়েছিলেন। তখনই চাষীদের একত্রিত করে কোন একটি 'সংগঠন' গড়ে তোলার কথা তিনি আমাদের বলেছিলেন। তখন আমি কথাগুলো বুঝতে পারিনি। পরে এখন বুঝতে পারছি তিনি যে কথাগুলি বলেছিলেন। সেসব কাজেও করে দেখালেন।"

"ধর্মদাদা আমাকে ও সেইসব কথা বলেছিলেন। বিদেশে নাকি গরীব কৃষক আর কারখানাতে কাজ করা শ্রমিকেরা সংগঠন করে রাজাকে সরিয়ে দিয়ে 'জনগনের শাসন' চালু করেছে। তিনি আমাকে ফরাসী বিপ্লব সম্পর্কে একটি বই পড়তে দিয়েছিলেন। সেইসব জায়গায় সত্যিকরেই আশ্চর্য আশ্চর্য ঘটনা সব ঘটে চলেছে।"

"আমাদের অসমে ও আশ্চর্য ঘটনাই ঘটেছে," — তারা উৎসাহে বলে উঠল। " রঙিয়া, পথরুঘাট এবং কামরূপের অন্য কোন জায়গায় গরীব দুঃখী মানুষ মিলিতভাবে ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে যেভাবে যুদ্ধ করল তার বর্ণনা শুনলে তুমি স্তব্ধ হয়ে যাবে

স্বর্ণ।'' তারপরে তারা সেই ঘটনাগুলির দু - একটি বিবরণ ধর্মকান্তের মুখে যেভাবে শুনে ছিল ঠিক সেইভাবে স্বর্ণর সামনে তুলে ধরতে চেষ্টা করল।

কলকাতা থেকে ফিরে প্রথমে ধর্মকান্ত ডিব্রুগড়ে গেল। কিন্তু সেখানে বেশিদিন থাকতে পারল না। কামরূপ, দরং আর নগাঁওর লোক ইংরেজ সরকারের খাজনা বাড়ানোতে রাগে জ্বলে উঠে - জায়গায় জায়গায় সভা করে সিদ্বান্ত নিয়েছিল যে তারা নতুন হারে খাজনা দেবেন না। এই সভাগুলিতে হাজার হাজার লোক জমা হয়েছিল আর দু - একটি জায়গায় লোক এমন বিদ্রোহী হয়ে উঠল যে তাঁরা লাঠি - সোঁটা নিয়ে যুদ্ধ করবার জন্যে বেরিয়ে পড়েছিল। এসব খবর পেয়ে ধর্মকান্ত তক্ষুণি পশ্চিম অসমে ছুটে গেল। তার সঙ্গে আর ও দু - তিনজন সহকর্মী ও ছিল। এঁরা সবাই ছিলেন রায়ত সভার সভ্য। কামরূপ পৌঁছে তাঁরা দেখলেন যে পরিস্থিতি ভীষণ রূপ ধারণ করেছে। খাজনা না দেওয়ার ব্যাপারে লোক দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। খাজনা আদায়কারী - মন্ডল এবং অন্যান্য কর্মচারীদের মেরেধরে নাস্তানাবুদ করে দিল। দু - একটি জায়গায় মারপিট ও হল। ধর্মকান্ত গুয়াহাটীতে খবর পেয়েছিল যে মৌজাদারদের রির্পোট শুনে সরকার ও চুপচাপ বসে নেই। জনসাধারণকে ভালোকরে শিক্ষা দেবার জন্যে সিপাহীদের প্রস্তুত করছে। ধর্মকান্ত আর তার সঙ্গীরা একগ্রাম থেকে আর এক গ্রামে গিয়ে লোকজনদের বোঝাল যে তারা যাই করুক না কেন, যেন একসঙ্গে করে। একতাই আসল শক্তি। ধর্মকান্ত সভাগুলোতে ঈশপের একটি গল্প বলেছিল — কেমন করে বুড়ো বাবা একগোছা লাঠির সাহায্যে নিজের ছেলেদের মিলেমিশে কাজ করবার শিক্ষা দিয়ে ছিল। লোকেরা গল্পটির তাৎপর্য তৎক্ষনাৎ বুঝতে পেরেছিল এবং উপদেশটিও গ্রহণ করেছিল। কারো বাড়িতে কর আদায়কারী সরকারী কর্মচারী এসেছে শুনলেই সারা গ্রামের মানুষ গিয়ে বাধা দিত আর কর আদায়কারীকে গ্রামের বাইরে রেখে আসত। কেউ চুপিচুপি খাজনা দিয়েছে জানতে পারলে তাকে সভার মাধ্যমে একঘরে করা হত। কোন মৌজাদার কারও ওপর অত্যাচার করছে এ খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে লোকেরা দলবদ্ধ ভাবে সেই মৌজাদারের বাড়ির সামনে বসত এবং যতক্ষণ পর্যন্ত না মৌজাদার সবার সামনে হাঁটু গেড়ে ক্ষমা চাইত ততক্ষণ পর্যন্ত বসে থাকত। মিছিলে যাওয়া লোকদের ধর্মকান্ত সবসময় আদেশ করত যে অস্ত্রের বলের থেকে ও একতাবলই বেশি। সুতরাং হাতে লাঠি - বর্শা নেওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই। নিরস্ত্র লোকের ওপর সরকার কোনো অত্যাচার চালাতে পারবে না — এ নীতি ইংরেজের আইন ও মেনে চলে। ধর্মকান্তের কথায় গাঁয়ের প্রবীণদের ও অগাধ বিশ্বাস। কিন্তু সকলকে অবাক্ করে দিয়ে একদিন সরকারী পুলিস সদলবলে এসে গ্রামের ভেতরে ঢুকে মাতব্বরদের সকলকে গ্রেপ্তার করে রঙিয়া থানায় চালান করে দিল। বন্দীদের মধ্যে ধর্মকান্তও ছিল। রঙিয়া থানায় আসার পরে দেখা গেল যে অতলোককে রাখার মত জায়গা থানায় নেই। অতএব পুলিশের অফিসার আদেশ দিলেন যে বন্দীদের দিয়ে থানার সামনের উঠোনটিতে বাঁশের বেড়া বেঁধে তার ভেতরে খোলা আকাশের নীচে লোকগুলোকে

রাখতে হবে। ধর্মকান্ত এরকম অদ্ভুত আদেশের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করল। কিন্তু সব বুড়োরা সমস্যা আরও ভয়ঙ্কর হতে পারে চিন্তা করে কাজে লেগে পড়ল। একদিনের মধ্যেই বাঁশের একটি ঘেরা তৈরি হল। তার ভেতরে ঢোকবার মুখে একঝাঁক পুলিশকে পাহারায় বসানো হল। পৌষমাসের ঠান্ডায় কেঁপে কেঁপে সমস্ত মানুষ কোনোরকমে রাতটা কাটালো। খাওয়ার জন্যে শুধু ভাত এবং নুনের বাইরে তাঁদের আর কিছুই দেওয়া হল না।

পরদিন ছিল আঠারশো চুরানব্বই সালের দশই জানুয়ারী। তারিখটি তারার ভালো করে মনে আছে, কারণ সেদিন ছিল তার মেয়ের জন্মদিন। ধর্মকান্তরা সান্ত্রীদের কাছে খবর পেয়েছিল যে আগের দিন সন্ধ্যেয় কামরূপের ডেপুটি কমিশনার ম্যাক্‌বে সাহেব এসে রঙিয়া পৌঁছেছেন। সঙ্গে বেশ কয়েকগাড়ি পুলিস। সাহেব এসে থানায় প্রবেশ করামাত্র একটু দূরে বহুলোকের সমস্বরে দেওয়া স্লোগান শুনতে পাওয়া গেল। পুলিশের সুপারিন্টেডেন্টের নির্দেশে সঙ্গে সঙ্গে গোটা থানাটি বন্দুকধারী সিপাইদের দিয়ে ঘিরে ফেলা হল। ধর্মকান্ত ও অন্যান্যবন্দীরা বেড়ার ফাঁকে উঁকি মেরে দেখলো যে হাজার হাজার লোকে সামনের মাঠটি লোকারণ্য হয়ে গেছে। নেতাদের নির্দেশে লোকেরা আস্তে - আস্তে বসে পড়ল। কিন্তু তাঁরা ধ্বনি দিচ্ছিলেন — খাজনা কমানোর জন্যে আর বন্দীদের মুক্তির দাবীতে। লোকগুলির হাতে কোনো অস্ত্র - শস্ত্রই ছিল না। কারও কারও হাতে বাঁশের একটি বা দুটি লাঠি মাত্র। ধর্মকান্ত তাঁদের দেখে আশ্বস্ত হল — এরকম শান্তিপূর্ণ সমাবেশের ওপর পুলিশ কখনই আক্রমণ করে না। সে আশা করল যে ডেপুটি কমিশনার সাহেব এদের আশ্বাস দেবার জন্যে বেরিয়ে আসবেন এবং তাদের দাবী মেনে নেবেন। কিন্তু তা হল না। ম্যাক্‌বে সাহেব নিজে বারান্দায় বেরিয়ে এসে জনগনকে তাড়িয়ে দেবার জন্যে পুলিসকে গুলি চালানোর নির্দেশ দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে গুলির শব্দ এবং জনগনের আর্তনাদে আকাশ - বাতাস কেঁপে উঠল। কত লোকের যে মৃত্যু হল তার আর লেখা - জোখা নেই। কৃষকের রক্তে মাঠ লাল হয়ে গেল।

কথাগুলো বলতে বলতে তারা উত্তেজিত হয়ে পড়েছিল। তার কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম ফুটে উঠল। স্বর্ণ উদগ্রীব হয়ে জিজ্ঞেস করল,

"তারপরে কি হল? ধর্মদাদাকে তারা কি করল? আমাদের কতজন লোক মারা গেল?"

"কত যে লোক মরল তার সঠিক হিসেব কেউই দিতে পারবে না। পুলিশ নাকি মৃত দেহগুলি একসঙ্গে মাঠের ধারের খাল একটিতে জড়ো করে আগুন দিয়ে পুড়িয়ে ফেলেছিল। স্বর্ণ, আমাদের লোকেরা ছিল বড্ড সহজ সরল। বেশির ভাগ মানুষই বন্দুকের গুলি কি জিনিষ জানতো না। তাই প্রথমে গুলির উত্তরে তারা মাটির ঢেলা ছুঁড়ে মারছিল। পরে অবশ্য সঙ্গের লোকজনদের গুলি খেয়ে লুটিয়ে পড়তে দেখে লোকজন ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল। ধর্মদাদাকে ওখান থেকে গুয়াহাটীর জেলে পাঠানো হল।

এদিকে গুয়াহাটীতে আমাদের অসমীয়া শিক্ষিত সমাজ খবর পেল যে শুধু রঙিয়াতেই নয়, দরং এর পথরুঘাট এবং অন্যান্য বেশ কয়েকটি জায়গায় পুলিশের আক্রমণে অনেক লোক মারা গেছে। চারিদিকে হৈ - চৈ পড়ে গেল। শিক্ষিতরা সরকারের কাছে আর্জি পেশ করলেন যাতে নিরীহ লোকজনদের দোষ ক্ষমা করে তাদের শাস্তি কমিয়ে দেওয়া হয়। শেষে অবশ্য সদয় হয়ে সরকার অনেক লোককে ছেড়ে দিল। কিন্তু নেতাদের ছাড়ল না। এদিকে জোড়হাট, শিবসাগর, তেজপুর ইত্যাদি জায়গায় শিক্ষিতরা 'রায়ত - সভা' করে সরকারের কাছে আবেদন - নিবেদন করতে শুরু করলেন। দু - একটি দাবী সরকার মেনে নিল।

"ধর্মদাদাকে জেলের থেকে মুক্ত করার জন্যে গুয়াহাটীর বেশ কয়েকজন ব্যক্তি সরকারের কাছে গিয়েছিল। কিন্তু কোনো ফল হল না। তাঁর বিরুদ্ধে অনেক অভিযোগ। দিগ্বিজয়'- এ লেখা কথাগুলি নাকি রাজদ্রোহ প্রমান করে। আসলে ধর্মকান্তের পিতার পরিচয় পুলিশ বের করেছিল। সে জন্যেই মিথ্যে চক্রান্ত করে তাঁকে একবছরের জেল দিল।

— "বেচারী লক্ষ্মীর নিশ্চয়ই বড়ো দুর্দশা, না কি বল?" স্বর্ণ এতক্ষণ বাদে প্রশ্ন করল।

"লক্ষ্মীর খবর আমরা অনেকদিন পরে পেয়েছি। ধর্মদাদার কথা একটু - আধটু যদিও শুনেছিলাম তবু কথাগুলি ভালো করে জানতাম না। তাঁকে যখন নগাঁও জেলে বদলী করা হল, তখন জেলের একজন গার্ডের হাতে পাঠানো চিঠির মাধ্যমে আমরা জানতে পারলাম তিনি ওখানে আছেন। আমরা অনুমতি নিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম। সেই আমার প্রথম জেল দর্শন। একটু ভয়ও লাগছিল। ধর্মকান্তকে ওরা ভালোভাবেই রেখেছিল। খাওয়া দাওয়ার কষ্ট দেয়নি। পড়ার জন্যে বই - পত্র ও দিয়েছিল। কিন্তু তিনি যেন মনে মনে বড়ো অশান্তি তে আছেন এরকম মনে হচ্ছিল। লক্ষ্মী আর ছেলেমেয়ে দুটোর খবর এনে দেওয়ার জন্যে আমাদের অনুরোধ করলেন। কিন্তু রঙিয়ার ঘটনার জন্যেই তিনি যেন বেশি মানসিক অশান্তিতে আছেন মনে হল। বারবার বলছিলেন, 'এতগুলো লোক চোখের সামনে মরে গেল, আমি কেমনকরে ভুলে যাবো? প্রতিবাদ করতেই হবে। নিরস্ত্র লোকজনদের ওপর এরকম পাশবিক অত্যাচার আমি কেমনকরে সহ্য করব?' আমার খুব ভয় লাগছিল, স্বর্ণ। সেদিন ধর্মদাদার চোখে প্রচন্ড রাগের যে আগুন দেখলাম তা এমনি এমনি নিভে যাবে না।"

"লক্ষ্মীর কাছে তোমরা গেলে তো?" "গেলাম। লক্ষ্মীর বাবাকে সব কথা জানাবার পর তিনিও আমাদের সঙ্গে ডিব্রুগড়ে যাওয়ার জন্যে প্রস্তুত হলেন। জাহাজে আমরা শিলঘাট হয়ে ডিব্রুগড় পৌঁছোলাম। শহরটি দেখলে চোখ জুড়োয়। ইংরেজ অনেক আছে। আমরা সন্ধ্যে নাগাদ লক্ষ্মীদের ঘরে উপস্থিত হলাম। দরোজার মুখ থেকেই শুনতে পেলাম লক্ষ্মী একটি ব্রাহ্ম উপাসনা — গীত গাইছে — সেই যে তোমাদের বাড়িতে গাওয়া 'নাথ তারিয়ো' সংগীতটি"। — "সেটা তো বরগীত। বাবার খুব পছন্দ ছিল।

মাও বিছানায় অসুস্থ থাকা অবস্থায় আমায় গাইতে বলতেন।'' দূরের দিকে তাকিয়ে স্বর্ণ বলল।

''লক্ষ্মীর বাবা দরোজার মুখে অনেকক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়েছিলেন। গান শেষ হলে পর তিনি গলাখাঁকারি দিয়ে আমাদের আসার কথাটা জানালেন। লক্ষ্মী বেরিয়ে এসে আমাদের দেখে প্রথমে অবাক হয়ে গেল। তারপরে বাবার পায়ে হাত দিয়ে প্রনাম করল। এতবছর পরে বাবা আর মেয়ের মিলন দেখে আমি চোখের জল রাখতে পারলাম না। লক্ষ্মীকে আস্তে আস্তে সব খবর দিলাম। ধর্মকান্তের গ্রেপ্তারের কথা সে আগেই জানত। পুলিশ এসে ধর্মকান্তের কাগজ - পত্র খানাতল্লাসী করে 'দিগ্বিজয়' - এর কপিগুলি নিয়ে গিয়েছিল। তার কথা শুনে মনে হল যে সে সব ধীরে সুস্থে সাম্‌লে নিয়েছে। স্কুলের ব্রাহ্ম হেড মাস্টার মশাই ও তাঁকে অনেক সাহায্য করেছেন। মাইনেও পাঁচটাকা বাড়িয়ে দিয়েছেন। লক্ষ্মীর সঙ্গে এখন তার শাশুড়ী থাকেন। প্রথমে তাঁরা এই বিয়ের ব্যাপারে মনে দুঃখ পেয়েছিলেন। কিন্তু এখন লক্ষ্মীকে নিজের মেয়ের মতো স্নেহ করেন। অবশ্য তার সঙ্গে খাওয়া - দাওয়া করেন না।

''লক্ষ্মীকে তার বাবা নগাঁও নিয়ে যেতে চাইলেন। কিন্তু সে রাজি হল না। বলল যে তার জীবনে এখন চরম পরীক্ষার সময়। এই পরীক্ষাতে তাকে একলাই পাশ করতে হবে। বাবা তাকে আশীর্বাদ করে চলে এলেন। এখন নাকি সে এন্ট্রান্স পরীক্ষাও দেবে। কত কষ্ট করে সে পড়াশুনো করছে। নিশ্চয়ই পাশ করবে।'' তারা দৃঢ়ভাবে বলল।

''ধর্মদাদা পরে ছাড়া পেল কি না?''

''পেল। আমাদের বাড়িতে একরাত্রি থেকে তিনি ডিব্রুগড় চলে গেলেন। আমি কিন্তু তাঁকে বারবার বলে পাঠিয়েছি যে যাই করুণ না কেন যেন ভেবেচিন্তে করেন। বেচারী লক্ষ্মী একলা একলা সংসারে আর কত যুদ্ধ করবে?''

''দেখ, কিছু লোকের ভাগ্যে লেখাই থাকে যে তাকে একাকী যুদ্ধ করতে হবে।'' স্বর্ণ দীর্ঘশ্বাস ফেলে ব'লল।

তারা অল্পসময় স্বর্ণর মুখের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ খপ্‌ করে জিজ্ঞেস করে ফেলল ''স্বর্ণ, তুমি আবার কেন বিয়ে করছ না?''

স্বর্ণ কিছুক্ষণ মাথা নীচু করে রইল। তারা লক্ষ্য করল, তার গালদুটি যেন একটু লজ্জারুণ হয়ে পড়েছে। তারাকে কিছু একটা বলতে গিয়ে ও নিজের মনটাকে তৎক্ষণাৎ শাসন করার মতো করে সে বলল,

''সেইসব চিন্তা মন থেকে বাদ দিয়েছি, তারা। আমার মতো একজন হতভাগীর অন্য একজনের সংসার ধ্বংস করার কথা এখন ভাবতেই পারি না।''

''দুর্ভাগ্য কার জীবনে নেই, স্বর্ণ? তারজন্যে তুমি কেন নিজেকে দায়ী করছ? এইসব চিন্তা ছেড়ে দাও। তোমার মত সর্বগুণান্বিতা মেয়েকে বিবাহ করার জন্যে কোন একজন ভালো লোক এসে হাজির হবেনই। তোমার বাবার বন্ধুরা কি এব্যাপারে তোমাকে কিছুই

বলেন নি ? ব্রাহ্মরা তো বিধবা - বিবাহ সমর্থন করে।''

'' দু - একজন বলেছেন। কিন্তু ভাইদের কথা ভেবে আমি মত দিইনি। আমি চলে গেলে তাদের কি গতি হবে?'' তারা লক্ষ্য করল যে স্বর্ণ যেন ভুলে গেছে যে সবাই একজন একজন করে তাকে ছেড়ে গেছে। সে স্বর্ণর পিঠে সাদরে একটি টোকা মেরে বলল, ''জ্ঞান তো বিলেতে গেছে। এখন তোমার কিসের বাধা?''

স্বর্ণ কোনো উত্তর দিল না। কিন্তু হঠাৎ যেন তার মনের আকাশটা খানিকটে ফর্সা হয়ে গেল। হয়তো অনেকদিন পরে কেউ তাকে ভবিষ্যৎ সম্পর্কে এমন চমৎকার একটা আশা দিল। এই সময় বাইরে চট্‌পটিওয়ালা 'চট্‌পট্ চট্‌পট্' বলে হেঁকে যাচ্ছিল। স্বর্ণ হাত - ছানি দিয়ে ডাকল। ছোট্ট একটি মেয়ের মত সে হেসে - হেসে তারাকে বলল,

''কলকাতার চট্‌পটি খেয়েছ? একবার খেলে সারাজীবন আর ভুলতে পারবে না।

ছোট আর খুকী অবাক্ হয়ে মায়ের মুখখানি দ্যাখে। তাঁকে এত খুশি তারা কখনো দেখেনি। অসমের নতুন মাসীমাকে তাদের খুব ভালো লেগে গেল।

আট

ছমাসের প্রশিক্ষণ শেষ করে নগাঁও ফিরে গিয়ে তারা হতাশ হল। সরকারী হাসপাতালের উন্নতির জন্যে সরকার যে পরিকল্পনা হাতে নিয়েছিলেন পরে আর্থিক অভাবের অজুহাতে সেই পরিকল্পনা পরিত্যাক্ত হল। তারাকে যে জন্যে উচ্চশিক্ষার্থে পাঠানো হয়েছিল সেই উদ্দেশ্য ব্যর্থ হল। শেষে নগাঁও হাসপাতালের ডাক্তার তাকে উপদেশ দিলেন যে গুয়াহাটীর সিভিল হাসপাতালে তার অবিলম্বে বদলি নিয়ে যাওয়া উচিত। সেখানে সে তার জ্ঞানকে কাজে লাগানোর বেশি সুবিধে পাবে। ইতিমধ্যে নগাঁও মিশন তাকে আরও একটি নতুন কাজের সন্ধান দিল। শিলং এ - ওয়েলস্ মিশন একটি নতুন হাসপাতাল খুলতে চলেছে। তাতে একজন ভালো নার্সের প্রয়োজন। তারা কি করবে না করবে এইসব ভাবতে থাকার সময় হেনরী সমস্যাটির সমাধান করে দিল। গুয়াহাটী হাইস্কুলে সেকেন্ড মাস্টারের একটি পদ খালি হয়েছে। হেণরী সরকারের কাছে আবেদন করে সেখানে বদলী নিল। অনেকদিন আগে থেকেই হেণরীর গুয়াহাটী যাওয়ার ইচ্ছে। তার ধারণা ছিল গুয়াহাটী যেতে পারলে অসমের বাহিরের জগৎ নাগালের মধ্যে এসে যাবে। নতুন চালু হওয়া মেলস্টীমার গুলিতে গুয়াহাটী থেকে গোয়ানন্দ দুদিনেই পৌঁছোতে পারা যায়। সেখান থেকে কলকাতা রেলে মাত্র একরাত্রির রাস্তা। ইংরেজরাও জায়গাটির গুরুত্ব উপলব্ধি করে অফিস কাছারী সব সেখানে গড়ে তুলেছে। গুয়াহাটী থেকে শিলং এ যাওয়ার ও নতুন রাস্তা হয়েছে। তারপরে ও হেণরীর জন্যে সব থেকে বড়ো কথা হল যে গুয়াহাটীতে একটি কলেজ প্রতিষ্ঠার কথা চলছে। তা যদি হয় কলকাতার মতো গুয়াহাটী ও আধুনিক চিন্তা চর্চার

প্রাণকেন্দ্র হয়ে উঠবে। জোনাকীর মতো অনেক পত্রিকা বেরোবে, আর শিক্ষিত মানুষের সংখ্যা ও অনেক বেড়ে যাবে। সেরকম একটি ভবিষ্যতের আশায়ই হেণরী তারাকে গুয়াহাটী আসবার জন্যে রাজি করালো।

নগাঁও ছেড়ে আসতে তারার খুবই খারাপ লাগছিল। কত ছোটখাট স্মৃতিতে ভরা এই অঞ্চলটি। তার জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিনগুলিই সে এই ছোট শহরটিতে কাটাল। ব্যাপ্টিস্ট মিশনারীদের কাছ থেকে সে আশাতীত স্নেহ আর যত্ন পেয়েছিল যা কখনো ভোলা যাবে না। ব্রণ্‌সন সাহেবের স্মৃতিতে তার মন আজও সবুজ হয়ে আছে। তাঁর মৃত্যু সংবাদ পেয়ে সে অনেক কেঁদেছিল। মানবসেবা ও আত্মত্যাগের যে মহান্ আদর্শ সে ব্রণ্‌সন সাহেবের কাছ থেকে পেয়েছিল তাকে সে নিজের জীবনের ক্ষেত্রে কখনো সার্থক করে তুলতে পারবে কি? ব্রণ্‌সন সাহেব যে বিদেশী ছিল সে কথা সে বিশ্বাসই করতে পারে না। তাঁর আচার আচরণের সঙ্গে শাসক ইংরেজদের আচার - আচরণের কোনো মিলই সে দেখতে পায়নি। কিন্তু হেণরী অন্যভাবে সবকিছু ভাবতে আরম্ভ করেছে। তার মতে পাদরী সাহেবরা কখনই ইংরেজ শাসকদের বিরোধিতা করবেন না। পথরুঘাট, রঙিয়া ইত্যাদির নৃশংস হত্যাকান্ডের পরেও পাদ্রীরা সরকারের বিরুদ্ধে একটি কথাও বলেননি। মানব সেবাতে ব্রতী এইসব লোকের সরকারের অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ না করাটা কী রকম কথা? হেণরী একদিন তারাকে অরুনোদই এর পুরনো একটি সংখ্যা থেকে ''নগাঁও দ্রোহী লোকের চরিত্র বর্ণন'' নামক একটি প্রবন্ধ পড়ে শোনাল। প্রবন্ধটি খুব সম্ভব একজন পাদরীরই লেখা। তাতে অসমীয়া লোকদের ওপর কেমন ঘৃণা প্রকাশ পেয়েছে আর ইংরেজ শাসকদের প্রতি আছে অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা।

কিন্তু তবুও তারা মায়ের কিছু কথা ভুলতে পারে না — ''পাদরী সাহেব মেমদের কৃপায় আজ আমরা এরকম থাকতে পারছি, তারা। নাহলে আমাদের কি দশা হত কে জানে? তাঁদের প্রতি কোনদিন অকৃতজ্ঞ হবি না। হেণরীও অকৃতজ্ঞ নয়! কিন্তু নিজের অতীতকে শেকলের মতো নিজেকে বেঁধে রাখতে সে চায় না। সে স্বাধীনভাবে চিন্তা করতে চায়।

গুয়াহাটী এসে তারা আর হেণরীর দিনগুলি ব্যস্ততার মাঝে কেটে যাচ্ছিল। ব্রহ্মপুত্রের পাড়ের সিভিল হাসপাতালটির পরিবেশ খুবই নিরিবিলি। নদীর হাওয়া ঘরের মধ্যে ঢেউয়ের মতো খেলে বেড়ায়। হাসপাতালের কাছাকাছি পানবাজারের একটি সরকারী বাড়িতে তারা থাকে। সেখান থেকে দু - পা হাঁটা পথ হেণ্‌রীর স্কুল। তারার সাধারণত কাজ সকাল দশটা থেকে বিকেল চারটে। কিন্তু কখনো কখনো রাতের ডিউটিও থাকে। দিনের ডিউটি কখনো কখনো বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত চলে। হাসপাতালে নার্সের সংখ্যা এত কম যে বিশেষ দরকারী কাজ থাকলে সার্জেন তারাকে আরও একটুখানি থেকে যেতে অনুরোধ করেন। তারার ছেলেমেয়েদের কাছে যাবার জন্যে কেমন করে। কিন্তু সে হাসিমুখে বাড়তি কাজটুকুও করে দেয়। তারার ছেলে নরেন প্রাইমারী স্কুলে যায়। তিনবছরের

নমিতা ঘরে থাকে। তাকে রাখবার জন্যে গুয়াহাটী মিশনের একজন বৃদ্ধাকে পেয়েছে তারা।

সিভিল হাসপাতালের কাছেই মিশন সেখানে বেশ কয়েকটি সুন্দর পুরনো বাংলো আছে। সঙ্গের পাকা গীর্জা বাড়িটি চোখে পড়ার মতো। নতুন করে তৈরি হওয়া সাহেবের বাংলো, ক্লাবঘর সবই সুন্দর পাকা বাড়ি। ব্রহ্মপুত্রের পাড় দিয়ে যাওয়া স্ট্র্যান্ডরোডের একদিকে সারি দেওয়া বড় বড় সরকারী অফিসারের বাংলো। তারা আর হেণরী বিকেলে কখনো কখনো দীঘলী পুকুরের পাড়ে বেড়াতে যায়। পুকুরটির উত্তরদিকে সাহেবদের ক্লাব। ক্লাবের সামনের যাওয়া আসার রাস্তাটি দিয়ে বিকেলের পর থেকে দেশীয় মানুষের আনাগোনা বন্ধ করে দেওয়া হয়। দুদিকে দারোয়ান রাস্তাটি পাহারা দেয়। দেশীয় লোকেরা আপত্তি করে না। তাঁরা ধরেই নেন যে রাজাদের রাস্তায় যাওয়ার অধিকার রাজপরিবারের লোকেদেরই আছে। দীঘলী পুকুরের পাড় থেকে ভারতীয়রা গলা উঁচু করে দেখে — কি জানি হয়ত সাহেব মেমের ক্লাবে যাওয়ার দুর্লভ দৃশ্যটি কিছুক্ষণের জন্যে হলেও দেখতে পাবে এই আশায়।

সেইদিন তারিখটি ছিল ১৮৯৭ (আঠারশো সাতানব্বই)সালের জুনমাসের বারো তারিখ। সকাল থেকেই আবহাওয়া মেঘলা। তারা হাসপাতালে যাবার সময় দক্ষিণদিকের পাহাড়গুলি দেখল। কালোমেঘে ঢাকা। তারমানে খুব বৃষ্টি হবে। তারা তাড়াহুড়ো করে সবাইকে ভাত খাইয়ে নিজে খেয়ে দেয়ে যাবার জন্যে প্রস্তুত হল। বৃষ্টি নামার আগে হাসপাতালে পৌঁছোলে তবেই নিস্তার। অন্যদিনের মতো সেদিনও ছোট্ট নমিতা মায়ের কোলে ওঠার জন্যে বায়না ধরল। নার্সের পোষাক নোংরা হওয়ার ভয়ে সেদিনও তাকে বুঝিয়ে - সুজিয়ে দুগালে চুমু খেয়ে তারা বিদায় নিল। হেণ্রীর দিকে ফিরে একটু হেসে সে "তাড়াতাড়ি ফিরব" বলে দ্রুত হাসপাতালের দিকে হাঁটতে শুরু করল।

হাসপাতালের দরোজার মুখে পৌঁছোতেই বড় বড় বৃষ্টির ফোঁটা পড়তে আরম্ভ করল। তারা কোনরকমে দৌড়ে গিয়ে বারান্দায় পা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ঝম্‌ঝম্ করে বৃষ্টি নেমে এল। কিন্তু এবার ওয়ার্ডের ভেতরে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে আর আবহাওয়ার কথা ভাবনার সময় পেল না। সার্জেনের সঙ্গে সঙ্গে ঘুরে রোগীদের অসুখের 'চার্ট'— গুলি পরীক্ষা করার পরে বাইরে থেকে আসা রোগীদের পরিচর্যা আরম্ভ হল। নতুন রোগীদের মধ্যে সবথেকে খারাপ অবস্থা হল আগের দিন আসা ন -দশ বছরের ছেলেটির। ছেলেটির পেট থেকে গোটা তলপেট পর্যন্ত গরমজল পড়ে খুব খারাপভাবে পুড়েছে। বাঁচার আশা খুব কম। তবুও ডাক্তাররা যতখানি সম্ভব যত্ন করছেন। এরকম রোগীর ক্ষেত্রে নার্সের দায়িত্ব খুব বেশি। ছেলেটি যন্ত্রনায় আর্তনাদ করছে। তারা যতখানি সম্ভব সাবধানে ড্রেসিং করে দিচ্ছে। বাইরের বারান্দায় ছেলেটির মার হৃদয়বিদারক কান্না শুনে একবার তারা বেরিয়ে গিয়ে তাঁকে কড়াসুরে ধৈর্য ধরতে বলল। মহিলাটির জন্যে তার খুব দুঃখ হচ্ছিল। কিন্তু চীৎকার - চেঁচামেচিতে তো কোনো ফল দেবে না? দিনের বেশিরভাগ সময় তারা ছেলেটির কাছে কাছে কাটাল। বিকেলে ছেলেটিকে ওষুধ দিয়ে শুইয়ে রাখা

হয়েছে। সেইজন্যে ওয়ার্ডটির পরিস্থিতি এখন একটু শান্ত। ছেলেটির মাও ফিরে গেছে।

তারার ডিউটি শেষ হবার আগে রাতের ডিউটির নার্স এসে পড়ল। তারা ছাতা খুলে বাইরে বেরোবার সঙ্গে সঙ্গে কে যেন তাকে প্রচন্ড একটা ধাক্কা মারল। তারা হাঁটু ভেঙে মাটীতে পড়ে গেল। প্রথমে সে ভাবল যে তার মাথা ঘুরছে। মাটি ঢেউয়ের মতো ওঠা নামা করছে। সে একমুঠি ঘাস খামচে ধরল। ভূমিকম্প। চারিদিকের লোকজনেরা আতঙ্কে চীৎকার চেঁচামেচি করছে। হাসপাতালের ডাক্তার, রোগী, কর্মচারী প্রায় সকলেই এরমধ্যে বাইরে এসে পৌঁছেছে। কেউ বা হাতজোড় করে রামনাম করছে! কেউ বা আকাশের দিকে চেয়ে যীশুর নাম জপছে। সামনের পাকা বাড়ি দুটি তাসের ঘরের মতো হুস করে ভেঙ্গে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে মানুষের আর্তনাদ। হাসপাতালের কম্পাউন্ডের ভেতরে দুটি গাছ সশব্দে ভেঙে পড়ল। চারিদিকে কামান দাগার মত গুড়ুম - গুড়ুম শব্দ। ঝাঁকুনি একটুকমার পরে তারা উঠে দাঁড়াল। হঠাৎ হাসপাতালের ভেতর থেকে শিশুকণ্ঠের আর্তনাদ শোনা গেল। অন্য রোগীরা বেরিয়ে এসেছিল। হাসপাতালের একাংশ ধ্বসে পড়েছে। কিন্তু দরজার মুখটি তখন ও খোলা আছে। তারা সেই পথে ভেতরে দৌড়ে গেল। সকলেই অবাক্ হয়ে তাকিয়ে রইল। ধ্বংসস্তুপের ওপর দিয়ে বুকে হেঁটে তারা ওয়ার্ডে ঢুকল। ছেলেটা বিছানাতে শুয়ে চীৎকার করছিল। মুহূর্তে তারা তাকে বিছানার চাদর দিয়ে মুড়ে নিয়ে দরজার দিকে এগিয়ে গেল। তখন আর একটি বড়সড় ঝাঁকুনী এল। বাইরের সবাই দেখল প্রচন্ড শব্দে ওয়ার্ডের চালটি ধ্বসে পড়ল। তারা বেরোতে পারল না।

সারারাত্রি ধরে অবিরত বৃষ্টি মাঝে মাঝে মৃদু কম্পন। সেইরাতে গুয়াহাটীর কেউ আর বাড়ির ভেতর ঢুকল না। ব্রহ্মপুত্রের জলে উজানবাজারের অনেকটা জায়গা ডুবে গেল। হাসপাতালের কমপাউন্ডের ভেতরেও জল ঢুকল। জায়গায় জায়গায় কুয়োগুলি বালিতে বালিতে ঢাকা পড়ল। রাস্তার মাঝে মাঝে বিরাট বিরাট গর্ত হল। সাহেবদের পাকা বাংলোগুলি প্রায় সবই ভেঙে গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে গেছে। এই মহাপ্রলয়ে একমাত্র খড় আর বাঁশের ঘরগুলি রক্ষা পেল।

তারার মৃত্যুর খবর দিতে হেণরীর কাছে হাসপাতালের সার্জেন নিজে গেলেন। আমাদের ত্রানকর্তা যীশুর মহান্ আদর্শ নিয়ে তারা অন্যের জন্যে নিজের প্রাণ আহুতি দিল। এরকম মৃত্যু মহান।"

তারার অন্যান্য সহকর্মীও তার মানবসেবার প্রতি নিষ্ঠার কথা আবেগে আপ্লুত হয়ে বলে যাচ্ছিলেন। কিন্তু সেই মুহূর্তে হেণরীর কাছে সব সান্ত্বনার বানীই নিরর্থক হয়ে পড়ল। ভূমিকম্পে তাদের ছোটখাট বাড়িটির বিশেষ ক্ষয়ক্ষতি হয় নি। কিন্তু হেণরীর কাছে ঘরের খোলসটাই যেন থেকে গেল। তারার বিহনে ঘরের প্রাণই চলে গেছে!

তারার মৃতদেহ উদ্ধার করা থেকে সমাধি পর্যন্ত সব কাজের দায়িত্বভার সরকার নিলেন। মিশন থেকেও ভূমিকম্পে ক্ষতিগ্রস্ত প্রতিটি পরিবারকে সাহায্যের জন্যে দান

এগিয়ে এল। সেই কটা দিন হেণ্‌রীর ছেলে মেয়ের দায়িত্ব মিশনই নিয়েছিল। হেণ্‌রীর সহকর্মী শিক্ষকরা এবং ছাত্রেরা দলে দলে খবর নিতে এসেছিল। প্রার্থনা সভাও বেশ কয়েকটি অনুষ্ঠিত হল। সকলেই তারার স্মৃতির প্রতি অগাধ শ্রদ্ধা অর্পন করল। কিন্তু হেণ্‌রীর জীবনের সীমাহীন গভীর শূণ্যতা এসব কিছুই ভরাতে পারল না। স্কুল থেকে ছুটি নিয়ে সে বেশ কিছুদিন বাড়িতেই রইল। অবশ্য ভূমিকম্পের পরে স্কুলকাছারী সবকিছুই কিছুদিনের জন্যে বন্ধ হয়ে গেল। বেশিরভাগ ঘরবাড়িই নতুনভাবে বানাতে হল। কিন্তু এইবার সরকারী বাড়িগুলি খড়-বাঁশে বানানো হল।

হেণ্‌রী স্বর্ণর কাছ থেকে একখানি দীর্ঘ চিঠি পেল। সে লিখেছে, তারা এখন সত্যিকারের আকাশের ধ্রুব তারা হয়ে গেল। তাকে যারা চিনতে পেরেছিল তাদের সকলকেই সে এবার দূর থেকে পথ দেখাবে। স্বর্ণ হেণ্‌রীকে কলকাতায় যাওয়ার অনুরোধ করেছিল। — হেণ্‌রী চিঠিটি পড়ে একটু ভেবেছিল। ভেবেছিল — আগে হলে কলকাতায় যাওয়ার কথা কল্পনা করেই তার মনটা ভালো লাগত হয়তো। কিন্তু এখন তার কাছে কলকাতার আর কোনো মোহ নেই। স্বর্ণর চিঠিখানি সে টেবিলে রাখা বাইবেলের তলায় রেখে দিল। সে আজকাল প্রায়ই বাইবেল পড়ে। তার বেদনাক্লিষ্ট অন্তর যীশুর প্রেমের বানী নতুন করে অনুভব করতে চেষ্টা করে। আগে মিশনে থাকার সময়ে সে কতবার কত দুঃখী, কাতর মানুষকে যীশুর বানী পড়ে সান্ত্বনা দিয়েছিল। এখন নিজের জন্যেও সে সান্ত্বনার মন্ত্র একটি বেছে নিল — "Blessed are they that mourn, for they shall be comforted."

ভূমিকম্পের প্রায় দুমাস পরে একদিন হেণ্‌রীর কাছে ধর্মকান্ত এসেছিল। ধর্মকান্ত এখন প্রেসের কাজে মনপ্রান অর্পন করেছে। তার প্রেস থেকে বেশ কয়েকটি অসমীয়া পুঁথি ছাপা হয়ে বেরিয়েছে। একটি সাপ্তহিক সংবাদপত্র সে বের করতে চলেছে। সেইসব কাজের জন্য তাকে প্রায়ই গুয়াহাটী আসা-যাওয়া করতে হয়। সেদিন হেণ্‌রীর কাছে বসে ধর্মকান্ত অনেক পুরনো কথা আলোচনা করল। — নগাঁওর দিনগুলির কথা, কলকাতার কথা ইত্যাদি। শেষে সে নিজে আসার উদ্দেশ্য ব্যক্ত করল।"লক্ষ্মী আমাকে বলে পাঠিয়েছে তোমাদের ডিব্রুগড়ে নিয়ে যেতে হবে। নতুন জায়গায় গেলে তোমার মনও ভালো থাকবে, আমাদের ও ভালো লাগবে। তুমি ইচ্ছে হলে আমার সঙ্গে প্রেসে কাজ করতে পারবে। নাহলে সেখানকার সরকারী স্কুলে বদলী ও নিতে পারো।"

হেণ্‌রী ম্লান হেসে উত্তর দিল, "তোমাদের কাছে একবার যাবো বলে আমিও ভেবেছিলাম। কিন্তু ইতিমধ্যে ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আমি একটা সিদ্ধান্ত নিয়ে নিয়েছি। শিলং এ নতুন করে খোলা ওয়েলস্ মিশনের স্কুলে কাজ করব বলে কথা দিয়ে দিয়েছি। পথ-ঘাট মুক্ত হলেই আমরা সেখানে যাত্রা করব।"

"তারমানে তুমি আবারও মিশনে ফিরে যাওয়া ঠিক করেছ?" ধর্মকান্ত অবাক্ হয়ে জিজ্ঞেস করল।

"আমার জন্যে এছাড়া অন্য উপায়ও ছিল না। আমি ভীষণ একলা, বরুয়া। ছোট

থেকে মিশনই ছিল আমার ঘর-সংসার। মাঝখানে তারাকে পেয়ে আমার জীবনে এক নতুন গতি এসেছিল। আমার সংসার ও বেড়েছে, কিন্তু এখন আর সেরকম কোন প্রেরণা নেই। আমি এখন শুধু একটি আশ্রয় খুঁজে বেড়াচ্ছি — অন্ততঃ কিছুদিনের জন্যে। বরুয়া, মিশন আমাকে সেই মানসিক সিকিউরিটি দিতে পারবে। অন্য কেউ পারবে না।''

হেণ্‌রী কথাগুলো আস্তে আস্তে বলছিল, কারণ, ধর্মকান্ত তাকে ভুল বুঝতে পারে এ ভয় তার ছিল। ধর্মকান্ত বিস্ময়ে তার দিকে চেয়েছিল। হেণ্‌রীর মনোলোক সে কোনদিনই ভালোকরে বুঝতে পারল না। আস্তে আস্তে মাথা নেড়ে সে ব'লল —

''আমি তোমাকে বুঝলাম না, হেণরী। মিশনের বাইরে থেকেও তুমি বন্ধু বান্ধব আর শুভাকাঙ্খীদের নিয়ে একটি বড়ো পরিবার গড়ে তুলতে পারতে।''

''তোমার মানসিক দৃষ্টিভঙ্গী একেবারে অন্যধরণের, বরুয়া! আমার কথা তুমি বুঝলে না'' হেণ্‌রী ধর্মকান্তকে বোঝানোর চেষ্টা ছেড়ে দিয়ে বলল, ধর্মকান্ত হেসে হেসে পরাজয় স্বীকার করার মতো হাত দুটো তুলে ধরে বলে উঠল,

''সত্যিই, তোমার কাছে এইবার হারলাম। কিন্তু আমি আশা ছাড়িনি। একদিন না একদিন তুমি আবার আমাদের মাঝে ফিরে আসবে। আমি না ডাকলে ও সময় তোমাকে ডাকবে!''

যাবার সময় অত্যন্ত আন্তরিকভাবে হেণ্‌রীর কাঁধে হাত রেখে ধর্মকান্ত বলল, ''তোমার পরিবারে কি এখন আর আমাদের জায়গা হবে?''

হেণ্‌রী আঘাত পাওয়ার মতো বলে উঠল ''ওরকমভাবে আমাকে দুঃখ দিও না, বরুয়া। তোমরা — তুমি, লক্ষ্মী আর স্বর্ণ — আমার কত আপনার। তোমাদের স্মৃতিই আমাকে নতুন জীবন আরম্ভ করাতে সাহায্যে করবে। আর শিলংই বা কতদূর? পথ - ঘাট ভালো হলে আমাদের মাঝে মধ্যে দেখাসাক্ষাৎ হবেই। তোমরা এসে আমার অতিথি হবে। স্বর্ণকেও আমি চিঠি দিয়েছি। ভাই বিলেত থেকে ফিরে এলে দুজনে শিলং - এ আসতে পারবে।''

নয়

আসামের ভূমিকম্পে কলকাতা, মহানগরীতে ও মৃদুকম্পন হয়েছিল। তাতে দুএকটা পুরনো ঘর বাড়ি নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু অসমের মতো ব্যাপক ক্ষয় - ক্ষতি হয়নি। স্বর্ণ খবরের কাগজে ভূমিকম্পের বর্ণনা পড়ে অসমে থাকা আত্মীয়স্বজন ও বন্ধু বান্ধবের জন্যে দুশ্চিন্তায় কাতর হয়ে পড়েছিল। রাস্তাঘাট এবং ডাক তার সবকিছু যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন ও ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার জন্যে বহুদিন সে কারও খবর পায় নি। তারপরে আস্তে আস্তে সব খবর এসে পৌঁছেছিল। স্বর্ণদের পরিচিত নগাঁওয়ে সবাই ভালো এবং কুশলে

ছিল, যদি ও দু- একজনের ঘর দোর নষ্ট হয়েছিল। কিন্তু তারার মৃত্যুর খবর পেয়ে স্বর্ণ শোকে ও দুঃখে কাতর হয়ে পড়ল। আপনজনের মৃত্যুতে জীবনে সে অনেকবার কেঁদেছে। কিন্তু তারার বিয়োগ যেন তার অস্তিত্বের একটি দিক অন্ধকার করে ফেলল। এতদিন, সে যা হতে চাইত, তারা যেন তারই জীবন্ত প্রতিমূর্তি ছিল। তারা তার জীবনে নতুন করে বেঁচে থাকার প্রেরণা এনে দিয়েছিল। শেষবার তারার সঙ্গে দেখা হওয়ার সময় তারা তাকে আবার বিয়ে করার কথা বলেছিল আর তার সেই উপদেশনুযায়ী স্বর্ণ তার মনের সংগোপনে এতদিন লুকিয়ে রাখা কিছু ভাবকে হঠাৎই প্রশ্রয় দিতে আরম্ভ করেছিল।

সংবাদপত্রের খবর অনুসারে ভূমিকম্পের প্রকৃত প্রলয়ংকারী রূপ খাসিয়া পাহাড়েই দেখা গিয়েছিল। পাহাড়ের ঢালুঅংশের কয়েকটি গ্রাম ওপরের থেকে খসে পড়া পাথরের চাপে মাটীতে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। কত মানুষের যে জীবন্ত সমাধি হল তার কোন হিসেব - নিকেশ নেই। শিলং এর সব সুন্দর সুন্দর সরকারী বাংলো ভেঙে চুরমার হয়ে গেল। বেশ কয়েকজন সাহেবেরও মৃত্যু হল। এদের ভেতরে ছিল রাঙিয়াতে গুলি চালাবার আদেশদাতা ম্যাক্‌বে সাহেবও।

স্বর্ণ "দি ইংলিস ম্যান্" কাগজখানি পড়তে পড়তে মুখের সামনে রেখে সামনে বসে থাকা বাঙালী ভদ্রলোকের দিকে তাকিয়ে বলল, "মানুষকে তার পাপের ফল একদিন না একদিন ভোগ করতেই হবে। ম্যাক্‌বে সাহেব শিলং - এ গিয়েও নিজের পাপের শাস্তি থেকে রক্ষা পেলেন না।"

স্বর্ণর সঙ্গে যে ভদ্রলোকটি কথা বলেছিলেন তাঁর নাম ক্ষীরোদচন্দ্র রায় চৌধুরী। হুগলী কলেজের অধ্যক্ষ। সবাই তাঁকে বিদ্বান্ এবং সচ্চরিত্র বলে জানে। বয়স চল্লিশের কাছাকাছি হ'বে। যদিও দেখতে অনেক কম বয়সী বলে মনে হয়। দুটি ছেলে - মেয়ের পিতা। বেশ কয়েক বছর আগে পত্নীর মৃত্যু হয়েছে। প্রথমদিন স্বর্ণর সঙ্গে জগদীশ বসুর বাড়িতে পরিচয় হবার পরে দুজনের মধ্যে বন্ধুত্ব গড়ে উঠেছিল এবং আস্তে আস্তে সেই সম্পর্ক দৃঢ় হলো। দুজনে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার সিদ্ধান্ত ও নিয়েছিলেন। প্রথমে স্বর্ণর মনে একটু দ্বিধা ছিল। বহুদিন একলা থাকার পরে হঠাৎ নিজের জীবনের এরকম একটা পরিবর্তন আনতে তার ভয় করছিল। কিন্তু সমস্ত বন্ধুবান্ধব এবং শুভাকাঙ্খীর আগ্রহ আর ক্ষীরোদবাবুর অসীম ধৈর্য ও ভালোবাসা শেষকালে তার মন ঠিক করতে সাহায্য করেছিল। ক্ষীরোদবাবুর উৎসাহে সে আবার পড়াশুনো করতে আরম্ভ করল। কিন্তু তাঁর ইচ্ছানুযায়ী এনট্রান্স পরীক্ষা দেবার জন্যে প্রস্তুতি নেবার ইচ্ছে স্বর্ণর ছিল না। পরীক্ষা পাশ করেই বা সে কি করবে?

স্বর্ণর মন্তব্য শুনে ক্ষীরোদবাবু হেসে হেসে বললেন, "তুমি পোয়েটিক জাস্টিস্ বিশ্বাস করো, না স্বর্ণ? আমি কিন্তু করি না। এই পৃথিবীতে কত ভালো ভালো মানুষ বিনা দোষে কষ্ট পাচ্ছে। কত খারাপ লোক আনন্দে দিন কাটাচ্ছে। এই ভূমিকম্পে কত নির্দোষ লোকের মৃত্যু হল।"

হঠাৎই স্বর্ণর মুখখানি বিবর্ন হয়ে যায়। কয়েকদিন আগে পাওয়া হেনরীর চিঠির কথা মনে পড়ে যাওয়ায় তার চোখ ছলছল করে ওঠে। ক্ষীরোদবাবুর নিজের কথার জন্যে খারাপ লাগে। তারার মৃত্যুর খবর স্বর্ণকে কতখানি বিহুল করেছিল তা তিনি জানেন। স্বর্ণ কিছুক্ষণ চুপচাপ থেকে অন্যমনস্কভাবে সংবাদপত্রটি ভাঁজ করে রেখে শেষকালে দার্শনিক ভাবে বলে, "জীবন - মৃত্যু আমাদের হাতে নেই ক্ষীরোদবাবু। আমরা প্রত্যেকে যে যার নিজের নিজের কাজগুলি করে যেতে পারি। ভালো কাজ করলে মৃত্যুতে ও স্বার্থকতা খুঁজে পেতে পারি। খারাপ কাজ করলে মৃত্যুও ভয়ঙ্কর হয়ে পড়ে।" একটু থেমে স্বর্ণ আবার বলে গেল, "আমি জীবনে মৃত্যুকে এত কাছ থেকে দেখলাম যে আমার কাছে, জীবন আর মরণের মাঝে কোন পার্থক্যই নেই।"

এই বয়সে তুমি এইসব কথা বললে সহ্য হয় না, স্বর্ণ। তোমার সামনে গোটা জীবনটাই পড়ে আছে। এখন বেঁচে থাকার কথা ভাবো। মৃত্যুর কথা না হয় আমরা বুড়ো হলে বলব।" শেষের কথাগুলো তিনি হালকা সুরে বললেন। কিন্তু সুরটি অন্তরঙ্গ।

স্বর্ণ তাঁর কথার প্রতিবাদ করল না। দেওয়ালের গায়ে ঝুলে থাকা ক্যালেন্ডারের দিকে তাকিয়ে সে কথা ঘোরাল। "সামনের বছর জ্ঞান ফিরে আসবে। তাকে তার সব বিষয় - সম্পত্তি বুঝিয়ে দিয়ে আমি স্বাধীন হতে পারব।"

"তারমানে তুমি বানপ্রস্থের কথা ভাবছ?" ক্ষীরোদবাবু (রায়) আবার কৌতুক করে হেসে বললেন, "তোমার সঙ্গে বনবাসে যাওয়ার জন্যে আমাকে তাহলে একবছরের মধ্যে প্রস্তুত হতে হবে। নাহলে আমরা প্রস্তুত হওয়ার আগেই বিংশশতাব্দী এসে হাজির হবে।"

" বিংশশতাব্দী! " স্বর্ণ ছোট্ট মেয়ের মত চিৎকার করে উঠল, "ভাবতে কত ভালো লাগে। বাবা আগে সবসময় বলতেন যে বিংশশতাব্দীতে পৃথিবী একেবারে বদলে যাবে। মানুষ মেসিনের সাহায্যে সব কাজ করবে। কলিকাতা থেকে নগাঁও যেতে হয়ত বা দুদিন বা তিনদিন লাগবে। আর আমাদের সমাজের সব কুসংস্কার দূর হয়ে যাবে। আচ্ছা, আমরা সেইসব দিনগুলি দেখতে পাবো তো?"

স্বর্ণ উঠে গিয়ে বারান্দার রেলিং ধরে অনেক দূর পর্যন্ত তাকিয়ে দেখতে চাইল আসন্ন সন্ধ্যায় ধীরে ধীরে কলিকাতা মহানগরীর আলোগুলি এক এক করে জ্বলে উঠল। ☐☐

Lasertypeset at Raja Infotec Enterprise, Kolkata
and printed at IMH Press, New Delhi